বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠ বাঙালি

মেহরাব রহমান

Bangobondhu Shatta B
Pathak Shamabesh
Since
1987
2952702
Tk. 250.00

বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠ বাঙালি

মেহরাব রহমান



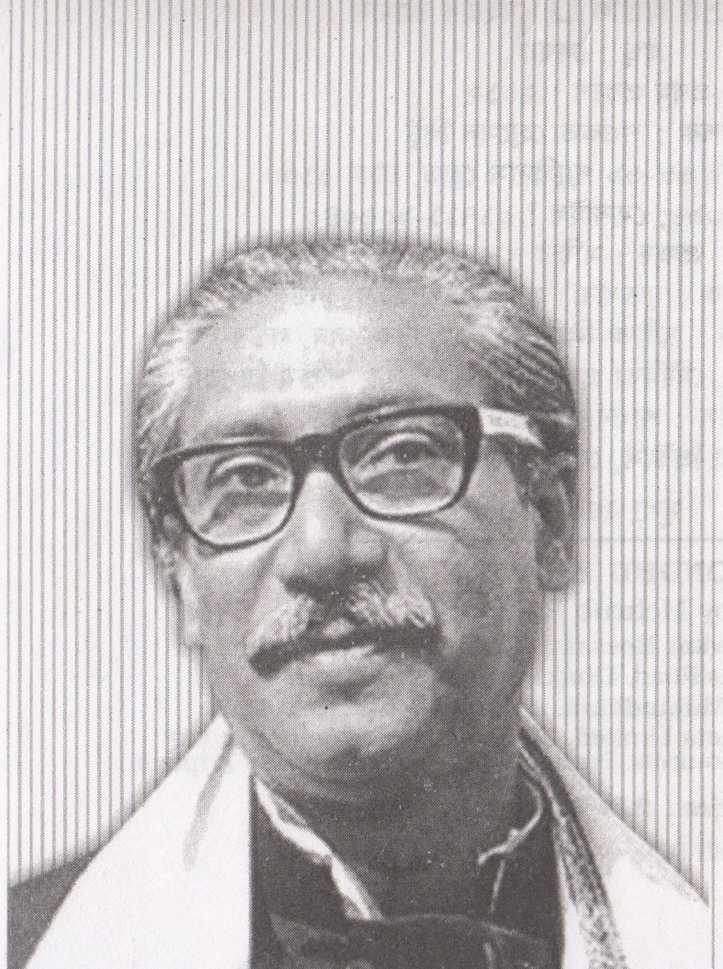
বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠ বাঙালি



বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠ বাঙালি

বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠ বাঙালি

সম্পাদনা : মেহরাব রহমান



Northern University * Bangladesh *
NUB Library

88-02-9669555
পাঠক সমাবেশ কেন্দ্র
Dhaka Bangladesh
Establish 2014
pathakdabi-online.com

পারিজাত প্রকাশনী

NUB LIBRARY
ACCESSION NO. 98783
ACCESSION DATE
PROGRAM, CAMPUS

বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠ বাঙালি ❑ মেহরাব রহমান
স্বত্ব : লেখক
প্রথম প্রকাশ : ২০১২
প্রকাশক : শওকত হোসেন লিটু
পারিজাত প্রকাশনী ৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১৬৫০৯৬; মোবাইল : ০১৭১১-৯০৬০৪০
প্রচ্ছদ : সজিব খান
আমেরিকা পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন
আগরতলা পরিবেশক : মৌমিতা প্রকাশনী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা
বর্ণবিন্যাস : শাওন কম্পিউটারস্, ঢাকা
মুদ্রণ : হেরা প্রিন্টার্স, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা
মূল্য ২৫০ টাকা

BANGOBONDHU SHATTA BANGALI
by Mehrub Rahman
Published by Showkat Hossain Litu, Parijat Prakashani
68-69 Pyridas Road, Dhaka-1100 Bangladesh
USA Distributor : Muktadhara, Jacson Hights, New York
UK Distributor : Sangeeta Limited. 22 Brick Lane, London E1 6RF
Agartala Distributor : Moumita Prakashani, Agartala, West Tripura
Price : 250 Taka Only.
ISBN 978 -984-507-129-1

উৎসর্গ

আজও গভীর রাতে চাঁদ ডুবে গেলে পর
তেতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে
কাঁদে বাংলাদেশের বিমর্ষ প্রাণ
কাঁদে দুই-তৃতীয়াংশ নির্যাতিত, নিপীড়িত মেহনতি মানুষের জন্য এই বই
উৎসর্গ করি সেই ঘাম ঝরানো মানুষের করতলে
এবং
স্বাধীনতার ইতিহাসের জ্বলজ্বলে এই অমিয় দলিল উৎসর্গ করলাম
তাঁদের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বীর মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের অর্জিত স্বাধীনতার
প্রধানতম কারিগর বঙ্গবন্ধুকে লালসবুজের অনন্য পতাকা গড়ার জন্য
পৃথিবীর গোলকে সুদর্শন এক মানচিত্র আঁকবার জন্য তেলরঙ, জলরঙ
ও নানাবিধ উপকরণ দিয়ে
নিজের জীবন বাজী রেখে
সাহায্য করেছেন
এই পবিত্র দলিল কেবল
যুদ্ধাপরাধী-দেশদ্রোহীদের জন্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

সূচিপত্র

বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠ বাঙালি ✣ **মেহরাব রহমান** ৯
৩০ বছর ধরে অশ্রু ঝরছে ✣ **শেখ রেহানা** ১৪
বাংলাদেশ ও শ্রেষ্ঠতম বাঙালি ✣ **আবুল মাল আবদুল মুহিত** ১৭
আওয়ামী লীগের জন্ম ও স্মৃতির পাতায় বঙ্গবন্ধু ✣ **তোফায়েল আহমেদ** ২৪
বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ✣ **তোয়াব খান** ২৯
স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু যেমন ✣ **সুলতানা কামাল** ৩৩
সোনার অক্ষরে লেখা নাম : জয় বঙ্গবন্ধু ✣ **বেলাল চৌধুরী** ৩৬
হৃদয়টা ছিল তাঁর আকাশের মতো ✣ **ওয়াহিদুল হক** ৪০
বাংলার মাটি ধন্য তব আগমনে ✣ **আতাউর রহমান** ৪৫
সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ ভাষণ ✣ **আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক** ৫২
ভস্ম যদি সর্বাঙ্গে আমার ✣ **সৈয়দ শামসুল হক** ৫৮
শেখ মুজিবই বাংলাদেশের ঠিকানা ✣ **আবেদ খান** ৬২
বঙ্গবন্ধু, শিল্পাচার্য ও কিছু অনুভব ✣ **শিল্পী হাশেম খান** ৬৪
আমার শেখ মুজিব ✣ **বেলাল বেগ** ৭১
সেইদিন, একজন পাঁড়েজি ✣ **দাউদ হায়দার** ৭৪
রাষ্ট্র গঠন ও জাতির জনক শেখ মুজিব ✣
অধ্যাপক ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ৮০
মহান জাতির মহান পিতা : অবিস্মরণীয় বঙ্গবন্ধু ✣ **সরদার আমজাদ হোসেন** ৮৭
লীডার ✣ **কামাল লোহানী** ৯২
অদ্বিতীয় ✣ **বিরুপাক্ষ পাল** ১০২
সাধারণ জীবন ও অসাধারণ পিতা ✣ **ইয়াফেস ওসমান** ১০৫
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি যেভাবে দেখেছি
✣ **মে. জে. (অবঃ) সি. আর. দত্ত বীর উত্তম** ১০৯
একটি ঐতিহাসিক বৈঠক ✣ **বজলুর রহমান** ১১৩
যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ✣ **ড. মো. মাহবুবর রহমান** ১২২
সে-রাতে ৩২ নম্বরে সর্বশেষ হত্যাটি ছিল শিশু রাসেলের ✣
আলহাজ আ. ফ. ম. মুহিতুল ইসলাম মুহিত ১২৯
যিনি না এলে বাংলাদেশ হতো না! ✣ **আনু মাহ্‌মুদ** ১৪১
স্বাধীনতা ঘোষণার বিতর্ক ও ইতিহাসের রায় ✣ **মুসা সাদিক** ১৪৫
বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্য কারণ ✣ **আব্দুর রাজ্জাক** ১৫৮
মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে বঙ্গবন্ধুর অবদান ✣
ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ১৬৩
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা ✣ **ড. মোহাম্মদ হাননান** ১৭২

বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠ বাঙালি

মেহরাব রহমান

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু লিখতে গেলেই ভীষণ রকম স্নায়ুর চাপে ভুগি। আমার অল্প বয়সেও ভুগেছি, এখন যখন যবনিকার পথে হাঁটছি, যখন দিগন্তের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছি, তখনও মুজিবের মত অত বড় মাপের ক্যানভ্যাসে একটা আঁচড় কাটতেও সঙ্কুচিত হয়ে যাই।

১৯৭৫ এ বন্য ষাঁড়ের দল পরাশক্তির সুপরিকল্পিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। আমি ঘৃণায় দুঃখে স্তম্ভিত হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি, বিমর্ষ হয়েছি এবং সর্বপরি বাকরুদ্ধ হয়েছি। যখন দেখেছি একজন নেতাও প্রতিবাদের ঝড় তোলে নি, একটি মানুষও মুজিবের জন্য রাজপথে নামে নি, তখন এতটাই মর্মাহত হয়েছিলাম যে, অন্তত তিনদিন ঠিকমত অন্নগ্রহণ করতে পারি নি।

ভেবে কূল পাইনি যে একটি জাতি কি করে এতটা অকৃতজ্ঞ হতে পারে? স্বাধীনতা প্রাপ্তির চার বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধুর বিশাল অবদানের কথা ভুলে যেতে পারে? যে মানুষটি তাঁর যাপিত জীবনের পরতে পরতে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর কাজ দিয়েই বারেবারে প্রমাণ করেছেন তিনিই, কেবল তিনিই শ্রেষ্ঠ বাঙালি আর কেউ হতে পারে না। তাঁকে কি করে আমরা এভাবে খুন করলাম? একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রেষ্ঠ বাঙালি। মুজিব পৃথিবীর গোলকে সুবর্ণ রঙে এঁকে দিয়েছেন 'বাংলাদেশ' নামের এক চিরন্তন অসাধারণ মানচিত্র। এইকি ছিল তাঁর বড় অপরাধ? তাই আত্মবিশ্বাস এবং যৌক্তিকভাবেই বলছি— হাজার বছরেও তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্বকে কোনও বাঙালি অতিক্রম করতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সৃষ্টিকর্তার পরে সকল বাংলাদেশি বাঙালি 'মুজিব, মুজিব, মুজিব' বলে সকাল সন্ধ্যা যপ করলে হয়তো মুজিব হত্যার পাপ থেকে আমাদের পরিত্রাণ মিলবে।

যেকথা বলতে চাচ্ছিলাম তাহল ১৯৭৫ এ আমি খুব দূর্বল হাতে কবিতা লিখছিলাম। খুব চেষ্টা করেছি মুজিবনামের অতবড় ক্যানভাসকে নিয়ে ছোট্ট একটি কবিতা লেখা যায় কিনা? কিন্তু যতবারই লিখতে চেয়েছি পারি নি। আমার পংক্তিমালা কান্নার স্রোতধারায় হারিয়ে গেছে। এরপর অনেকটা সময় পাড়ি

দিলাম। ১৯৮৩ সনে কোনও এক ভোরবেলা আমার কলমে ঝর্ণা ধারায় কবিতা প্রপাত নামল। আমিও আমার কলমে উচ্চারিত হল—

'আজ শীতের তীব্রতা ভেঙে অনেক ভোরে ঘুম ছুটেছে, যা আমার অভ্যেস বিরুদ্ধ। কদিন থেকে অকারণে ক্রুদ্ধ হয়ে আছি, নিজের সাথে কথা বলছি, রিক্সাওয়ালার সাথে ভাড়া নিয়ে ঝগড়া করছি। চিনু, তুমি অভিমান করো না, তোমার স্বপ্নময় চিঠিও বিষাদক্লান্ত চোখে ঝাপসা মনে হয়। নীলাভ স্বর্গ থেকে ভেসে আসছে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর। পিতার কষ্ট আমাকে উদাসীন করেছে। কি করে খুন করলাম বন্ধু—পিতা মুজিবকে, তাঁর অবচেতনের রবীন্দ্রনাথকে? আমরা আমাদের পিতাকে হত্যা করেছি। আমাদের খিদা এখন প্রচণ্ড, আমরা এই সব দিন রাত্রিকে ভোগ করতে চাই শ্রমিককে অভূক্ত রেখে। আমরা কি আর বাঙালি আছি? আমরা কি বাংলায় কথা বলি, হৃদয় উজাড় করে তুমি যেমন বলতে? আমরা তোমাকে হত্যা করেছি। আমরা মুজিবকে হত্যা করেছি। আমাদের পিতাকে হত্যা করেছি। আমরা বাংলাদেশি'। এটা পুরো কবিতাটির অংশবিশেষ।

কোনও রাজা অখণ্ড ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে খণ্ডিত ভারতবর্ষ পর্যন্ত সাধারণ প্রজাদের কথা ভাবেন নি। আর মুজিব যদি রাজা হয়ে থাকেন এই রাজা সেই রাজা নয়। এই রাজা মহাপ্রাণ মহাআত্মার মানুষ। যিনি প্রকৃত অর্থেই সাধারণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশে একধরণের সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে গঠন করেছিলেন বাকশাল অর্থাৎ বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ।

আঁতে ঘা লাগল শিল্পপতি ঘরানার রাজনৈতিক মহলের। তাঁদের চক্রান্তেই স্বপরিবারে নিহত হলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর একান্ত নিজস্ব নক্সায় গড়া ৬ দফা দাবি ১৯৬৬ সনের পশ্চিম পাকিস্তানের লাহর সম্মেলনে পেশ করেছেন। আমরা অনেকেই জানি ৬ দফা দিয়েই মুজিব স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন। আমার নিজেরও সেই বিশ্বাস ছিল। আসলে তা ঠিক নয়— এই ভুল ভাঙলো যখন এই লেখাটি লেখার ঠিক আগে আগে কথা বলছিলাম একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি মাহ্‌ফুজুল বারী অর্থাৎ আমার স্বজন বারী ভাই'র সাথে। উল্লেখ্য যে বারী ভাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কারাবাস করেছিলেন। তিনি একজন মুজিব অন্তপ্রাণ ব্যক্তি। যেই কারণে ১৯৭৫ সনে স্বপরিবারে মুজিব হত্যার পর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিয়ে তিনি কানাডায় পরবাসি হয়ে চলে আসেন। বর্তমানে তিনি কানাডায় বসবাস করছেন। যে কথা বলছিলাম, যে অজানা তথ্য সুতিক্ষ্নভাবে বেরিয়ে আসল বারী ভাই'র কণ্ঠ থেকে। তাই উল্লেখ করছি।

১৯৫৬ সন। শেখ মুজিবুর রহমান সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হয়ে গেলেন পিকিং। ঘটনাক্রমে একই হোটেলের পাশাপাশি কামরায় থাকার সুবাদে দেখা হয়ে গেল

পশ্চিম বঙ্গের প্রখ্যাত উপন্যাসিক মনোজ বসুর সাথে। মুজিব এবং মনোজবসুর মধ্যে নিবিড় আলোচনা হলো। এক পর্যায়ে মুজিব মনোজবসুকে বলেছিলেন, আমি বাংলাদেশকে স্বাধীন করব। দেখবেন আমি একদিন বাংলাদেশের মাউ হব। নিয়তির কী অপূর্ব খেলা। ইতিমধ্যে সমূদ্রের জল অনেকটা গড়িয়েছে। ১৯৭২ সন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মত ইন্দিরাগান্ধীর নিমন্ত্রণে কলকাতা গেলেন।

মুজিব হাঁটছেন। সাথে সাথে প্রটোকল অফিসার হাঁটছেন। এক এক করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে। ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধুর চোখ গেল বিশিষ্ট সহিত্যিক মনোজবসুর দিকে। প্রটোকল ভেঙে কাছে গেলেন। বললেন, মনোজদা কেমন আছেন? কি আমার কথা ঠিক হয়েছে না? দেশ স্বাধীন হয়েছে না? আমি ধন্য, আমার জীবন ধন্য। এতক্ষণ যাকিছু বললাম এই কথাগুলো স্বয়ং মনোজ বসু বলেছিলেন বারী ভাইকে। বারী ভাই ১৯৭৫ সনে মুজিব হত্যার পর ডিসেম্বরের ৭ তারিখ যখন কলকাতা যান মনোজ বসুর আমন্ত্রণে দক্ষিণ কলকাতায় অবস্থিত তাঁর বাসায় যান। প্রখ্যাত সাহিত্যিক মনোজবসু মুজিবের সাথে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ দিতে দিতে কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন—আপনারা এই বিশাল মাপের মানুষটিকে মেরে ফেললেন? হ্যাঁ। তাঁর বিশালত্ব ছিল মহাসাগরের মত উন্মুক্ত—বিশাল। বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ ঘটায় বারে বারে।

৬ দফা প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি। ৬ দফার প্রতিটি দফাই এক একটি পাহাড় প্রমাণ প্রতিবাদ। এই পাহাড় প্রমাণ প্রতিবাদ পাকিস্তানের স্বৈরাচারি সরকার গ্রহণ করে কি করে? আর ৬ দফার একটি দফা যখন পাহাড়কে ছাপিয়ে পর্বতের আকার ধারণ করে তখন প্রশ্নই আসে না।

তিন নাম্বার দফাটি পরিষ্কার ভাবেই বেশ জোরালো দেশ বিভাগের দাবি। স্বাধীনতার প্রার্থমিক ঘোষণা বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না। এখানেও শেখ মুজিবুর রহমান বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সেই মুহূর্তে দেশ বিভাগের কথা বললে তাঁকে সরাসরি দেশদ্রোহিতার দায়ে দায়ী হতে হতো। সেই ভুল তিনি করেন নি। তিনি ৩ দফায় পাকিস্তানের দুই শাখার জন্য দুটি ভিন্ন নক্সার টাকা ছাপাবার দাবি করেছেন। অথবা এটি যদি বাস্তবায়ন না করা যায় তবে গোটা দেশের একই মূদ্রা হতে পারে তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে যেন দেশের এক প্রান্ত থেকে ওপর প্রান্তে অর্থ পাচার না হয়। শুধু কি তাই, আলাদা টাকশাল বা ব্যাপক রিজার্ভ ব্যবস্থা অবশ্যই স্থাপন করতে হবে, সঙ্গে থাকবে আলাদা অর্থ পরিকল্পনা। একই দেশে দুই রকম অর্থ ব্যবস্থা কোনওভাবেই বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয় বা পাকিস্তান স্বৈরাচারি জান্তা এই অদ্ভুত প্রস্তাব মানবে না। একথা মুজিব ভালভাবেই জানতেন। দেশ বিভাগটাই ছিল শেখ মুজিবের উদ্দেশ্য। স্বৈরাচারি পাকিস্তান সরকার মুজিবের

৬ দফা দাবি নানা ছলেবলে প্রত্যাখ্যান করেছে তো বটেই, উপরন্ত বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করে কারারুদ্ধ করেছিল। তবে এটা সত্যি যে আগরতলায় দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েক দফা বৈঠক হয়েছিল। এর পরের ঘটনা সবারই জানা।

১৯৭১ এ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাই চূড়ান্ত ঘোষণা। এরপর আর কোনও ঘোষণার প্রয়োজন হয় না। যখন তিনি বলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ইতিহাসের মোড় তখনই ঘুরে গেল। এক শ্রেষ্ঠ জাতি গড়ে ওঠবার দ্বার তিনি উন্মোচন করলেন। কিন্তু সেই সম্ভাবনার সকল পথ রুদ্ধ হলো। তাঁকে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ণের সুযোগ দেয়া হলো না।

আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচিত ভাষণের অংশ বিশেষ উল্লেখ করছি। যা প্রকৃত অর্থেই তাঁর দেশপ্রেমের বর্হিপ্রকাশ। বাংলাদেশ ইতিহাসের উজ্বল দলিল হয়ে আছে। এই সব অবিস্মরণীয় ভাষণ কার সাধ্য ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলে?

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের নির্বাচিত অংশ ঃ 'কেবল সর্বস্ব ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী, ইনসাফের ইসলামে। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বরাবর যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন, আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদেরই বিরুদ্ধে।

ব্যক্তিগত কৈফিয়ত হিসেবে জনগণের খেদমতে একটিই মাত্র আমার বক্তব্য: নিজের জীবনের বিনিময়ে যদি এদেশের ভাবি নাগরিকদের জীবনকে কণ্টকমুক্ত করে যেতে পারি। আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই। তবু আমার প্রতিপক্ষরা আমাকে এ অপবাদ দিয়ে চলেছেন। বিগত ২৩ বৎসর ধরে ক্ষমতার আসন আমি কবে কখন আঁকড়ে ধরেছি তার বিবরণ তারা দেন না। বিগত গোলটেবিল বৈঠকের সময় আমাকে প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। আমি তা দু'পায়ে ঠেলে দিয়েছি। এতে আমার প্রতিপক্ষের বন্ধুদের অনেকেই রুষ্টও হয়েছেন।

আমার সরকার আভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। অবাস্তব তাত্ত্বিকতা নয়, আমার সরকার ও পাটি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দেশের বাস্তব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পুরাতন সামাজিক কাঠামোকে ভেংগে নতুন সমাজ গড়তে হবে। শোষণ ও অবিচারমুক্ত সমাজ আমরা গড়ে তুলব।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর বিচক্ষণ ভাষণে অমূল্য সম্পদ রেখে গেছেন। তিনিই বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্র প্রধান যিনি সাধারণের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। আর এই জন্যেই হয়তো তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

যাক 'বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠ বাঙালি' এই শিরনামের বইটি সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়ে আমি নিজেকে ভীষণ ভাগ্যবান মনে করছি।

পারিজাত প্রকাশনীর শওকত হোসেন লিটু যখন বললেন যে, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি সংকলিত বই'র সম্পাদনা আমাকেই করতে হবে, তখন আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি এবং বই'র শিরোনামটি 'বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠ বাঙালি' বলার পর গ্রহণ করেছেন। এই বইটিতে যাঁরা লেখা দিয়ে বইটি সমবৃদ্ধ করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁরা হলেন ঃ তোয়াব খান, সুলতানা কামাল, বেলাল চৌধুরী, ওয়াহিদুল হক, আতাউর রহমান, আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সৈয়দ শামসুল হক, মে. জে. (অব.) সি. আর. দত্ত বীর উত্তম, ড. অজিত কুমার দাস, নির্মলেন্দু গুণ, বজলুল রহমান, ড. মো. মাহবুবুর রহমান, আলহাজ আ. ফ. ম. মুহিতুল ইসলাম মুহিত, আনু মাহমুদ, মুসা সাদিক, আব্দুর রাজ্জাক, ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ড. মোহাম্মদ হাননান।

সুপ্রিয় পাঠক, আশা করি বইটির উপাদান আপনাদের অনুপ্রাণিত করবে একটি সুন্দর স্বপ্নের বাস্তবায়ণে। যার দ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উপসংহার টানতে চাই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিশুকিশোরদের জন্য লেখা আমার একটি ছড়ার কিছু পংক্তি দিয়ে।

'ঐ আকাশে চোখ তুলে চাও— শেখ মুজিব
নদ-নদী আর সাগর জলে— শেখ মুজিব
মানচিত্রের বর্ণিল রং— শেখ মুজিব
পতাকার লাল সূর্য— শেখ মুজিব।
শোন্ ছেলেরা
শোন্ মেয়েরা
চারদিকে সেই একই ধ্বনি
সোনার দেশ বাংলাদেশ
মুজিব নামের নেইকো শেষ, নেইকো শেষ।
মুজিব মানে বাংলাদেশ
মুজিব মানে বাংলাদেশ
মুজিব মানেই বাংলাদেশ।

৩০ বছর ধরে অশ্রু ঝরছে

শেখ রেহানা

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট, আর আজ ২০০৫-এর ১৫ আগস্ট। ৩০ বছর হয়ে এলো শাহাদাৎ বার্ষিকীর। একটি একটি করে দিন যে কিভাবে পার করেছি, সেই শোকাহত যন্ত্রণাময় নৃশংস ঘটনার কথা শুধু শুনেই এসেছি, চোখে দেখা হয়নি। বুকের ভেতরটায় যে কী বেদনা অনুভব করি সেটা স্বজন হারানো ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

এমন নৃশংস, নিষ্ঠুর ও অমানবিকভাবে কেন হত্যা করা হয়েছিল আমার বাবা শেখ মুজিবুর রহমান, মা ফজিলাতুন্নেছা, তিন ভাই– শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেলকে? আমার ভাবী সুলতানা কামাল ও রোজী জামালকে? আমার চাচা শেখ নাসেরকে? কি অপরাধ ছিল তাঁদের?

আমার বাবা রাজনীতি করতেন, বাঙালি জাতির স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন, বাংলার মানুষের মুক্তি অর্জনের সংগ্রাম করেছিলেন, এটাই কি ছিল তাঁর অপরাধ? তাহলে তাঁর রাজনীতিকে রাজনীতি দিয়ে মোকাবেলা করলো না কেন খুনিরা? কেন বেছে নিল এমন অমানবিক ষড়যন্ত্রের পথ তবে কি তাঁর বেঁচে থাকাটাই তাদের কাছে আতঙ্কজনক ছিল? তাঁর পর্বতসমান জনপ্রিয়তাকে তারা হত্যার মাধ্যমে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল?

আমার মমতাময়ী মা, ভাই ও ভাবীদের কি অপরাধ ছিল? তাঁরা তো রাজনীতি করতো না:? রাজনৈতিক পরিবার ছিল আমাদের, দেশকে আমরা ভালোবাসতাম। বাবার রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারী ছিলাম। তাঁর সংগ্রামী জীবনের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ছিল শুধু বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য; এ-জন্য তাঁর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনরা সবরকম সহযোগিতা করে এসেছে। এটাই কি ছিল আমার মা ও ভাইদের অপরাধ? আমাদের সবচেয়ে আদরের ছোট ভাই রাসেল, মাত্র দশ বছরের একটি শিশু; তাকে কেন হত্যা করেছিল ঘাতকরা? শৈশবের আনন্দ, ভালোবাসা ও হেসে-খেলে মাত্র জীবন শুরু করেছিল সে। সেই ফুলের মতো চঞ্চল আমার ছোট্ট ভাই রাসেলের কি অপরাধ ছিল? সে তো রাজনীতি বুঝতো না, জানতো না। খুনিদের হাত কি একবারও কাঁপেনি, বিবেক বলে কি কিছুই তাদের ছিল না? মানবিকতার সবটুকু কি তাদের হৃদয় থেকে মুছে গিয়ে সে সময় হিংস্র পশু হয়ে উঠেছিল? মানুষ কি এমন হতে পারে?

আজ ৩০ বছর পরও মায়ের সেই ৪৫ বছরের মুখখানার মমতামাখা ছবি ভুলতে পারি না। দশ বছরের রাসেলের সেই কোমল মুখখানা দু'চোখ ভরে থাকে। কামাল ভাই আজ ৫৫ বছরের হতেন। কামাল ভাই, জামাল ভাইয়ের বন্ধুরা যখন দেখা করে, তাদের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি, তখন ভাইদের কথা খুব মনে পড়ে। বেঁচে থাকলে তাঁরাও নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতেন। তাদের সাথে ভাইদের মেলাতে চেষ্টা করি। আব্বার সেই আদর, মুখ-ভরা হাসি অথচ গাম্ভীর্যময় ব্যক্তিত্ব যিনি বাঙালি জাতির জনক হিসেবে শ্রেষ্ঠতম নেতা, জানি না আজও তিনি বেঁচে থাকতে পারলেন না কেন? এমন নৃশংস হত্যা পৃথিবীর আর কোন দেশে ঘটেনি, আর কোন জাতির ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লেখা হয়নি।

খুনিদের কথাও ভাবি। কেন তারা এমন হত্যাকান্ড ঘটালো? তাদের কি স্বার্থ ছিল? বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ছিলেন, বাংলার মানুষ নিজস্ব ভূমিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, এসব কি তাদের সহ্য হয়নি? আর তাই হত্যার পথ বেছে নিতে হবে? বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে, ক্ষমতা দখল করে তারাও তো টিকতে পারেনি? অর্থ, ক্ষমতা এসবের মোহে তারা একটি পরিবারকে হত্যা করেছে, তাদের আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করেছে, এসব করে কি তারা তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়েছে? এ নির্মম হত্যার পর কি পেয়েছে তারা? কোন সে দুর্লভ সম্পদ? কি দিতে পেরেছে তারা এদেশের মানুষকে?

খুনিদেরও তো পরিবার রয়েছে। তাদের স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজনরাও কি স্বস্তি ও শান্তিতে রয়েছে, তাদেরও কি বিবেক তাড়া করে না? এমন নৃশংস ঘটনার জন্য তারাও কি অনুতাপ করে না? খুনিরা কি কখনও মা, ভাই, স্ত্রী, সন্তানদের মুখ দেখে না, তাদের ভালোবাসা পায় না? আমি জানি না।

আসলে আমরা তো সবাই মানুষ। মানুষের হৃদয় হতে পারে আদর্শময় শুভ্রতার প্রতীক, পবিত্রতায় মানবিক। আমাদের হৃদয়ে মনুষ্যত্ব বলে তো কিছু থাকা উচিত। কেন আমরা এমন হিংস্র পশু হবো যে মানুষ হয়ে মানুষ হত্যা করবো? মায়ের মমত্ব, ভাইয়ের ভালোবাসা, শিশুর নিষ্পাপ মুখ কেন রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে দিল খুনিরা?

আজ ৩০ বছর ধরে পিতার স্নেহ, মায়ের মুখ, ভাইদের ভালোবাসা, রাসেলের চঞ্চলতা আমাকে টানে। ৩২ নম্বরের বাড়িতে যখনই যাই আমার হৃদয় জুড়ে যে বেদনার অশ্রু ঝরে তা আমারই একান্ত। এমন হৃদয় বিদারক শোক নিয়ে বেঁচে থাকা বড় কষ্টকর। আমার এ কষ্ট উপলব্ধি করতে পারবে তারাই যারা স্বজন হারানো বেদনায় শোকাহত। মণি ভাইয়ের ছেলে পরশ ও তাপস আমার মতই

পিতৃ-মাতৃহারা। বাপ ও মায়ের স্নেহ, আদর, ভালোবাসা তারা তো বুঝেও উঠতে পারেনি, তাদের জীবনের এ মর্মান্তিক অসহায়ত্ব কি ঘাতকের দল একবারও উপলব্ধি করতে পারেনি মা বলে ঢাকা থেকে তাদের বঞ্চিত হতে হলো কেন? তারপরও বেঁচে আছি, সন্তানদের নিয়ে জীবন কাটাচ্ছি, মানুষের সঙ্গে কথা বলছি, কিন্তু যে-শোক আমাদের শক্তি যুগিয়েছে তাকে ধারণ করাও বড় কঠিন। এই কাঠিন্য আমাদের সবাইকে যেন স্বস্তি ও শান্তি এনে দেয়, সে কামানই করি। আমাদের বিবেক জাগ্রত হোক। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ হোক।

বাংলাদেশ ও শ্রেষ্ঠতম বাঙালি

আবুল মাল আবদুল মুহিত

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্টে ভারত উপমহাদেশের ১৯০ বছরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়। সারা উপমহাদেশের জন্য ছিল দুটি আনন্দের দিন। অবশ্যি স্বাধীনতা-প্রাপ্তি লগ্নে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লাখ লাখ লোক উদ্বাস্তু হয়ে বাসস্থান পরিবর্তন করে এবং হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং এই খুশির সঙ্গে মিশ্রিত ছিল গভীর দুঃখ এবং হতাশা। সেটাই ছিল ১৯৪৭ সাল–৫৭ বছর আগের ঘটনা। এই আগস্টের ১৫ তারিখটিও হচ্ছে বাঙালি জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত দিন।

১৯৭৫ সালে কতিপয় কুলাঙ্গার প্রতিবিপ্লবের অভিনেতা হিসেবে নৃশংসভাবে হত্যা করে বাংলাদেশের স্থাপিত ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সেবকদের আঠারো জনকে। সেনাবাহিনীর এক কাপুরুষ গোষ্ঠী ছলনার আশ্রয় নিয়ে, কেউ কিছু টের পাবার আগেই, এই বর্বরোচিত হত্যাপর্ব সমাধা করে। তাদের খুঁটির জোর ছিল শক্ত। বহিঃশক্তি এবং সেনা নেতৃত্বের একাংশ তাদের সমর্থন করে। বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় বিকাশের রাস্তা এভাবে কণ্টকাকীর্ণ হয় জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভবের মাত্র সাড়ে তিন বছরে। পরবর্তী ষোল বছর দেশটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জঙ্গলি আইনে শাসিত হয়। ক্ষমতালোভী অসৎ সেনা নেতৃত্ব দেশটাকে কুক্ষিগত করে রাখে এবং জাতিটির চরিত্র এবং মূল্যবোধের সমূহ ক্ষতিসাধন করে। স্বাভাবিক রাজনৈতিক বিকাশ, রুটিন অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামান্য সামাজিক অগ্রগতি এই সেনাশাসন রুদ্ধ করে রাখে। সর্বোপরি এই স্বৈরাচারী শাসন দেশে নেতৃত্বের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা লাভের পরপরই এই অপ্রত্যাশিত আঘাত জাতিটিকে দারুণভাবে পঙ্গু করে দেয়। এই দুঃশাসনের কুপ্রভাব থেকে জাতি এখনো মুক্তি পায়নি এবং ক্রমশঃ একটি বিপ্লবের পথে ধাবিত হচ্ছে।

বাঙালি জাতিগঠন প্রক্রিয়া হাজার বছরেরও পুরনো। জাতির বিকাশের প্রথম বীজ যখন উপ্ত হয় তখন বর্তমান জাতিরাষ্ট্রেও যে ধারণা তা মোটেই দানা বাধেনি। সপ্তম খৃস্টীয় শতাব্দীতে শুরু হয় বাংলাভাষার বিকাশ। একই সময়ে বাংলার ছোট ছোট রাজ্য মিলে একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রেরও বিকাশ হয়। পাল রাজবংশ এই দুইটি বিকাশেই বিরাট অবদান রাখে। পরবর্তী সেন আমলে বাংলার বিকাশে বাঁধা

আসলেও বৃহত্তর ভূখন্ডে একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলে। মুসলমানদের আগমন আদি, বৌদ্ধ ও হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন আর এক ঐতিহ্যের সমাহার ঘটায়। মুসলিম শাসকরা অচিরেই বাংলার ভূখণ্ডে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাংলাভাষার বিকাশে অবদান রাখেন। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ সালে শাহ-এ-বাঙালি খেতাব নিয়ে স্বাধীন বাঙালি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভূখণ্ডে এর পরেও অনেক রাজত্ব কায়েম হয়। দিল্লীর মোগল সম্রাটরা সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলায় তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করেন। তবে মোগল নবাবদের অনেকেই এদেশে স্বাধীন নৃপতি হিসেবে অবস্থান নেন। বাংলায় মোগল সাম্রাজ্যের সূর্য অস্তমিত হলো ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে। গোপাল, ইলিয়াস শাহ, হোসেন শাহ এবং পরবর্তীকালে মোগল নবাব শায়েস্তা খান বা আলিবর্দী বাংলার বিকাশে সবিশেষে অবদান রাখেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন বিশ্বাসঘাতকের হাতে। পরবর্তীতে প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও পরে বৃটিশ সম্রাটের প্রায় দুশো বছরের শাসন ককনো নির্বিঘ্নে চলে নি।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম দেয়। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে অবদান রাখে। বৃটিশ শাসনের অবসানে বাঙালিরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু এই সময়ে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা এবং দ্বন্দ্বও খুব উসকে যায়। বিংশ শতাব্দীতে এই ভূখন্ডে এক নতুন প্রজন্ম নেতৃত্বে আসে স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ লগ্নে। তারা রাজপুরুষ ছিলেন না। সমাজের সাধারণ স্তর থেকেই তাদের অভ্যুদয় হয়। তারা নিজ গুণে ও লেখাপড়ায় নিজেদের জন্য ইতিহাসে জায়গা করে নেন।

যে নতুন প্রজন্ম বৃটিশ শাসনের অবসানে যুবনেতৃত্বে সমাসীন ছিলেন তাদেরই জীবনকালে তারাই বাঙালি জাতির স্বকীয় সত্তায় সৃষ্টিতে সাফল্য লাভ করেন। এই প্রজন্মের অবিসম্বাদিত নেতা ছিলেন অতি সাধারণ এক বাঙালি যুবক– গোপালগঞ্জের অন্তর্গত টুংগীপাড়ার শেখ মুজিবুর রহমান। কৈশোরেই তাঁর নেতৃত্বের এবং সাহসী প্রতিবাদের চরিত্র প্রকাশ পায়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মূলধারার যুবনেতা বা ছাত্রনেতা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি হন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ও নেতা। স্বাধিকারের আন্দোলনে তিনি তার জীবন নিবেদন করেন। বাঙালির বঞ্চনা ও দুঃখ লাঘবের জন্য পাকিস্তানের তেইশ বছরের মধ্যে দীর্ঘকাল তিনি কারাগারে বন্দী থাকেন। তাঁর বিরুদ্ধে শতশত মামলা হয় এবং দেশদ্রোহের অভিযোগে তিনি "আগরতলা ষড়যন্ত্র" মামলার প্রধান আসামীও হন।

জাগ্রত বাঙালী ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এই মহান নেতাকে কারাগার থেকে ছিনিয়ে আনেন এবং মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলা খারিজ করে মহাপ্রতাপশালী সামরিক শাসক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান রেহাই পান। কারামুক্ত নেতা,

বাংলাদেশের অবিসম্বাদিত পরিচালক, শেখ মুজিবুর রহমান তখনই স্বীকৃতি পান "বঙ্গবন্ধু" হিসেবে। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ এই দুই বছরে ধাপে ধাপে এই নেতা জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি পাকিস্তানের কাঠামোয় এই অধিকার সমুন্নত করার জন্য ১৯৬৬ সালে ছয়-দফা কার্যক্রম ঘোষণা করেন। তার কারামুক্তির সময়ে এই ছয়-দফা হয় জাতীয় মহাসনদ। ছয়-দফার দাবিতে হয় পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং জনগণের ভোটের আশিরও বেশি শতাংশ। ১৯৭১-এর জানুয়ারিতে পাকিস্তান গণপরিষদের ৩১৩ জন সদস্যের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭টি আসন– পূর্ব পাকিস্তানে দুটি বাদে সব আসন। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনে পায় মোট ২৮৮।

কিন্তু পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থ– পশ্চিমের ভূস্বামী ও অভিজাত গোষ্ঠি এবং সেনাবাহিনী— কোন মতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ক্ষমতা নিতে দেবে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা বঙ্গবন্ধু এই প্রতিবন্ধকতাকে রাজনৈতিকভাবেই ঠেকাতে চান। তিনি কোন অনিয়মতান্ত্রিক বিপ্লবী বা হঠকারী সামরিক নেতা ছিলেন না। রাজনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বিক্ষোভ, সভা, হরতাল ঘোষণা করে তিনি সরকারকে অচল করে দিলেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে একদিকে সুশাসন বহাল করলেন এবং অন্যদিকে সামরিক সরকারকে সংলাপে বসতে বাধ্য করলেন। কিন্তু পাকিস্তানি কুচক্রি ক্ষমতালোলুপ জান্তা জেনারেল ইয়াহিয়া আর জুলফিকার আলী ভুট্টো সংলাপে বসলো প্রতারণার মতলবে। সংলাপ চলে ১৯৭০-এর ষোল মার্চ থেকে পঁচিশ মার্চ। অথচ ১৭ মার্চে সামরিক শাসক বাঙালি-নিধন ও বাংলাদেশ ধ্বংসের নীলনকশা "অপারেশন সার্চলাইট" অনুমোদন করেন।

পাকিস্তানি আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, তাই জাতির জনক ৭ মার্চেই ঘোষণা দেন ঃ

"তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো।...

"এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা হচ্ছে। বাঙালিরা বুঝে সুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো; মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জয় বাংলা।"

২৫ মার্চের কালরাত্রিতে ইয়াহিয়ার দস্যু বাহিনী বাংলাদেশে সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। আর বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা অবলম্বনে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক রণাঙ্গন ছিল প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি মহকুমায়। ১০ এপ্রিলে এই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য হলো "মুজিবনগর" সরকার এবং দৃপ্ত স্বাধীনতা ঘোষণা। ১৭ এপ্রিলে এই সরকারের অভিষেক হলো "মুজিবনগরে"। তারপর নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ। বিস্তীর্ণ বাংলাদেশে গেরিলা যুদ্ধ। মুক্তি-বিচ্ছুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হানাদার পাকিস্তানি দস্যুদল। ১৬ ডিসেম্বর এই দস্যুদল সৈন্য ও সহযোগী মিল ৯৩,০০০ আত্মসমর্পন করলো সংযুক্ত ভারত-বাংলাদেশ সেনা-কমান্ডের কাছে, ঢাকার রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে)। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ মুক্ত হলো।

সহস্র বছর ধরে যে যৌগিক বাঙালি জাতি গঠিত হচ্ছিল তারা বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে– ৫৭ হাজার বর্গমাইলে–প্রতিষ্ঠা করলো বাঙালিদের স্বাধীন দেশ। যে জাতীয়বোধ এতদিন ধরে বিকশিত হচ্ছিল তার আত্মপ্রকাশ হলো বাংলাদেশে। তাই বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে–ছিটিয়ে রয়েছে যে বাঙালী নৃতাত্বিক-গোষ্ঠি তাদের স্বপ্নের দেশ, গৌরবের দেশ প্রতিষ্ঠা পেল বাংলাদেশ। সব বাঙালি কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিক নয়, তারা একটি সীমিত ভূখণ্ডের অধিবাসী। অন্যান্য বাঙালির জন্য এইটি হলো আপনার দেশ, পরিচয়ের দেশ, গর্বের দেশ। যেমন জার্মানি হলো বিশ্বের সব জার্মান গোষ্ঠির আপনার দেশ বা গর্বের দেশ, নাগরিকত্বের নয়। বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের সৃষ্টি বাংলাদেশে। এখানেই এই জাতি ঘোষণা করে তাদের স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। এই যে একটি অনন্য সাধারণ অর্জন, এর স্বপ্নদ্রষ্টা ও পরিচালক হরেন ক্ষণজন্ম মহামানব–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর ছিল এই জাতির জন্য এক গভীর ভালবাসা। তার নিজস্ব সত্ত্বা এই জাতির সত্ত্বায় বিলীন হয়ে যায়। এই জাতির মঙ্গলসাধন ছিল তার জীবনের ধ্যান-ধারণা ও ব্রত। এই যৌগিক জাতিকে তিনি গড়ে তোলেন একটি ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, আধুনিক জাতি হিসেবে। এই সমাজে ধর্ম নিয়ে ঝগড়া থাকবে না, ধর্মকর্ম রাষ্ট্রকর্মকে প্রভাবিত করবে না। এই সমাজে বঞ্চনা চলবে না, বাঁচবার অধিকার থাকবে প্রতিটি নাগরিকের । এই সমাজে জনগণের ক্ষমতা প্রতিফলিত হবে তার নির্বাচিত নেতৃত্বের মধ্যে। এই সমাজে কেউ জ্ঞানের আলো ও চয়নের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হবে না। এই সমাজে সবাই স্বাদ পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির। এই সুন্দর স্বপ্ন দেখেন ও আমাদের দেখান টুংগীপাড়ার আমাদের মতই একজন–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দেশ পরিচালনার রূপরেখাও তিনি আমাদের দিয়ে যান। বিশ্বসভায় আমরা সকলের বন্ধু, কারো সঙ্গে নেই বিবাদ। কারোর প্রতি নেই আমাদের বিশেষ আকর্ষণ এবং সকলের প্রভাবই আমাদের উপর সমান। যেখানে মানবাধিকার লুণ্ঠিত সেখানেই আমরা সোচ্চার। অন্যায় ও বঞ্চনা আমরা কখনো মানি না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থা আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রশাসনের

নিম্নতম স্তরে কায়েম করবো। এক ধরনের ছয়-দফা প্রতিপালিত হবে আমাদের ৬৭-জেলায় (৬৪ জেলা ও ৩টি মেট্রোমহানগর)। এই স্বপ্ন এখনো স্বপ্ন, হয়তো তার জন্য প্রয়োজন আর একটি বিপ্লবের, আর একটি মুক্তিযুদ্ধের।

. জাতি এখন একটি ক্রান্তিলগ্নে। প্রায় তিন বছর ধরে একটি দুর্বৃত্ত সরকার জনজীবন তছনছ করে দিচ্ছে। দেশ অর্জনে যে মৌলবাদী শক্তি আমাদের শত্রুতা করে ও প্রতিহত করতে চেষ্টা করে, তারা এখন আমাদের ডান রাজনৈতিক শক্তির পরিচালক। রাজাকার পরিচালিত এই সরকার কখনো জনহিতে নিবেদিত হতে পারে না। দেশ তাই সন্ত্রাসের অভয়াশ্রম, নৈরাজ্যের পথে ধাবিত এবং লুটেরাদের হাতে জিন্মি। এই দুর্দিনেও আকাশের ঘনঘটা ভেদ করে দেখা যায় রূপালী আভা। এই সেদিন নববর্ষ আমাদের দেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে বিবিসির বিশ্বজরীপে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জাতির দুর্দিনে যখন সুখবর কোথাও নেই, এই রকম ঘোষণা আশার সঞ্চার করে। ক্ষণিকের জন্য হলেও দেয় মহা তৃপ্তি।

আমার মনে পড়ে ওয়াশিংটনে ১৯৮৭ সালে একটি এরশাদ-বিরোধী বিক্ষোভের কথা। ভয়েস অব আমেরিকার ইকবাল বাহার চৌধুরী সেই বিক্ষোভের বিবরণ ধারণ করতে গিয়ে আমার মন্তব্য গ্রহণ করেন। আমরা তখনো বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে বিভোর। সামরিক স্বৈরাচারের পতন চাই। সেই সময়ে একটি অনানুষ্ঠানিক আসরে ইকবাল আমাকে একটি প্রশ্ন করেন। ইকবাল ছাত্র বয়স থেকেই আমার পরিচিত। আমার স্ত্রীর সতীর্থ ছাড়াও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন হিসেবে আমার ঘনিষ্ঠ। ইকবালের প্রশ্ন, "আপনি কোন বাঙালি সন্তানকে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করেন?" নির্দ্বিধায় আমার উত্তর ছিল, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।" ইকবালের যথাযথ প্রশ্ন ছিল কাকে সবচেয়ে বেশি এড্‌মায়ার (admire) করেন। এডমিরেশনে শুধু শ্রদ্ধাবোধই যথেষ্ট নয়, সেখানে মুগ্ধবোধ ও আনুগত্যের বিষয়টিও রয়েছে। শেখ মুজিবকে ছাত্রজামানায় চিনি মুজিব ভাই হিসেবে। তিনি ছাত্রসমাজের নেতা ছিলেন, আমি তার পছন্দের দলের (ছাত্রলীগ) সদস্য ছিলাম না। তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন ছিল, তবে তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। তাঁকে মনে হতো এমন এক ব্যক্তি যার কথা বা অঙ্গীকার বা উদ্দেশ্য কার্যকরী করতে তিনি কার্পণ্য করবেন না ও সফল হবেন। চাকরি-জীবনে পাকিস্তান আমলে কদিন দেখি ব্যস্তসমস্ত মন্ত্রী ও দল-সংগঠক হিসেবে এবং পরবর্তী বারো বছর দেখি বিদ্রোহী, নির্যাতিত জননেতা হিসেবে। আইউবের সামরিক সরকার এবং তার ক্রীতদাস গর্ভনর আবদুল মোনেম খান শেক সাহেবের জীবনটিকে দুর্বিষহ করে তোলেন। রোজগারের রাস্তা বন্ধ, চলাফেরার স্বাধীনতা বদ্ধ, কথা বলার অধিকার অপহৃত। মামলার পর মামলা লড়তে আর সারাদেশের আদালতে হাজিরা দিতে দিতে হয়রান। এবং মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কারাগারে বন্দী। কিন্তু যখনই দেখা হয়েছে শির উচু করে সুপুরুষটি বহাল, সাহাস্যে উদ্ভাসিত, প্রচণ্ড ক্ষোভে ক্রুদ্ধ

সময়ে সময়ে। সর্বকালে জনগণের কল্যানের রাস্তা খুঁজতে লিপ্ত, বঞ্চনার প্রতিবিধানের কৌশল রপ্তে আগ্রহী। এর মধ্যে ফুটবল খেলায় দারুণভাবে আগ্রহী, সময়ে অসময়ে দর্শকের গ্যালারিতে বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত।

ইকবাল আরো খতিয়ে দেখতে চান। সাংবাদিকের অনুসন্ধান সবদিক বিবেচনা করতে চায়। তার পরবর্তী প্রশ্ন হয় আরো যে সব নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে অবহিত বা যাদের দেখেছেন তাদের সঙ্গে তুলনা করেও কি অভিমতটি সিদ্ধ?

আমি বেশ কজন নেতাকে নানাভাবে দেখেছি ও চিনেছি। শেরে বাংলা ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবকে বেশ চিনতাম– দুজনকে আমার কৈশোর থেকে এবং একজনকে যৌবনে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে খানিকটা চিনতাম। পাকিস্তানের অনেক নেতৃবৃন্দ ও সেনাপতিদেরও কাছে থেকে দেখার সুযোগ পাই। লেখাপড়ায় অনেকেই ছিলেন অনেক প্রাগ্রসর। আদব-কায়দায় কেউ কেউ ছিলেন আদর্শ মানুষ। সততা ও বিশ্বাসেও অনেক ছিলেন সমতুল্য। বঙ্গবন্ধুর অবস্থানটি ছিল অন্য মার্গের। জনগণের নাড়ীন ক্ষত্রের খবর তার ছিল অসাধারণ—শেরে বাংলা বা সোহরাওয়ার্দী কোনমতেই তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। কখন কোন দাবি জন-শ্লোগানে পরিণত হতে পারে, সেই বিচার তার ছিল মোক্ষম। অনেক আদর্শ বা ধারণা তিনি আবিষ্কার করেননি, কিন্তু একটি আদর্শকে জনগণের আদর্শে রূপান্তরিত করতে তিনি ছিলেন সার্থক শিল্পী।

জনহিতে নিবেদিত এমন নেতা আমি আর দেকি নি। তার নিকটতম অন্য ব্যক্তি ছিলেন তাঁর ডান হাত তাজউদ্দিন আহমদ। জনগণের মঙ্গল, বাঙালির সুখী জীবন তার মন, তার ভুবন, তার চিন্তা-চেতনা সব সময় আচ্ছন্ন করে ছিল। ত্যাগের ক্ষেত্রে তার ভুবন, তার চিন্তা-চেতনা সব সময় আচ্ছন্ন করে ছিল। ত্যাগের ক্ষেত্রে তার সমকক্ষ সম্ভবতঃ যারা জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করতো সেই বিপ্লবী বাঙালী ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। দেশের ও দশের জন্য তাঁর ত্যাগ ও তিতিক্ষা তাঁকে দেয় বঙ্গবন্ধুর আখ্যা। তাঁর আত্মসম্মানবোধে শ্লাঘা বোধ করবার ব্যক্তিগত সুযোগ আমার হয়েছে বারবার। তণ্ার সাহস যেমন ছিল সীমাহীন, তাঁর বাস্তবতাবোধ বা প্রয়োগবাদী চেতনাও ছিল তেমনি জাগ্রত ও ধারালো। একজন সাধারণ বাঙালি যার পাণ্ডিত্য তেমন অসাধারণ ছিল না, তিনিই শেষ বিচারে প্রতিষ্ঠা করেন বাঙালিদের জাতিরাষ্ট্র– সহস্র বছরের ঘাত-প্রতিঘাত ও আরাধনার ফসল। রবীন্দ্রনাথ শিল্প-সাহিত্য ও রুচির বিকাশে দিশারী। দেশবন্ধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ। জাতীয়তাবোধ জাগরণে বিপিন পাল চির-বিদ্রোহী। সমাজ বিনির্মাণে রাজা রামমোহন রায় সংস্কারের অগ্রদূত। বাংলা ভূখণ্ডের একীভূত অবস্থান রচনায় গোপাল, ইলিয়াস শাহ, শায়েস্তা খানরা মহান সম্রাট। ধর্মপ্রচারে হযরত শাহ-জালা বা অতীশ দীপঙ্কর অথবা শ্রীচৈতন্য নতুন দিগন্ত উম্মোচিত করেছেন।

আমাদের আপনজন প্রকাণ্ডভাবে বাংলার শাশ্বত উত্তরাধিকারের বাহক, একজন সাধারণ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান এদের সবার উপর বাঙালি জাতিকে উপহার দেন একটি জাতিরাষ্ট্র–৫৭ হাজার বর্গমাইলে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ। বিশ্ব-বাঙালির প্রাণের দেশ, গৌরবের ধন, পরিচয়ের ধারক। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা বাংলাদেশের নাগরিকরা এই দেশটির সুনাম ও ভাবমূর্তি বিনষ্ট করছি। বিশ্ব বাঙালিকে গর্বের একটি দেশ উপহার দিতে ব্যর্থ হচ্ছি। তবে বিশ্বাস করুন একবিংশ শতাব্দীর নুতন প্রজন্ম যখন দেশটিকে নিয়ে ভাবতে শুরু করবে, রাজনীতিতে অনীহাকে যখন আগ্রহে পরিণত করতে পারবে, তখন বাস্তবেই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির স্বপ্নটি বাস্তবায়িত হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নটি মূর্তরূপ পায় নি, কিন্তু মোটা দাগে সেই স্বপ্ন আমরা বুঝি। চাই একটি ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। চাই একটি কার্যকরী স্থানীয় সরকার। চাই একটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। চাই একটি সহনশীল রাজনৈতিক কালচার। চাই একটি সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ। চাই দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে লোভের সমাপ্তি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

আওয়ামী লীগের জন্ম ও স্মৃতির পাতায় বঙ্গবন্ধু

তোফায়েল আহমেদ

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন। বাঙালির জীবনে ঐতিহাসিক দিন। মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী দল আজকের আওয়ামী লীগ, তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগের আত্মপ্রকাশের সন্ধিক্ষণ। আমি তখন খুবই ছোট। বয়স সবে ছয়ের কোঠা ছুঁয়েছে। স্কুলে যেতে শুরু করেছি। রাজনীতির কিছুই বুঝি না। পরে বয়সের গণ্ডি পেরুতে পেরুতে বড়দের কাছ থেকে অনেক কিছুই জেনেছি। বঙ্গবন্ধুর গল্প শুনেছি। সকলে বঙ্গবন্ধুকে মুজিব ভাই বলে সম্বোধন করতেন। অন্যদের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে শোনা সেসব গল্প আমাকে অনুপ্রাণিত করত।

বাঙালির রাখাল রাজা, সকলের প্রিয় মুজিব ভাই তখনও বঙ্গবন্ধু হননি। আমি তাঁকে প্রথম দেখি ১৯৫৭ সালে, ভোলার সরকারি স্কুল-মাঠের উপনির্বাচনের জনসভায়। দেখা বলতে লাখো মানুষের ভিড়ে অনেক দূর থেকে উঁকি-ঝুঁকি দেয়া। আমি তখন অষ্টম শ্রেণীতে। প্রতিটি বাঙালির মমতায় সিক্ত বঙ্গবন্ধুর সেই দিনের আবেগ-মাখানো ভুবনজয়ী ভাষণ আমার কিশোর হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। মনের অজান্তে অনেকের সঙ্গে আমিও স্লোগান তুলি। মুক্তাকাশে দু'হাত উঁচিয়ে মুক্তির মিছিলে একাত্ম হই। এরপর কলেজের ছাত্রজীবনে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে আমার আনুষ্ঠানিক রাজনীতির পথচলা শুরু।

যাক, ফিরে আসি শুরুর কথায়। সেই ১৯৪৯ সালের ২৩ জুনের প্রসঙ্গে। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শামসুল হক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের জন্ম বিকাশের জন্য ঠিক এই দিনটিকেই বেছে নেন, কেননা ১৭৫৭ সালের এই দিনে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। এই ২৩ জুনেই সম্পৃক্ত হয়েছিল স্বাধিকার আন্দোলনের পূর্বকথা। সুপ্ত হয়ে থাকা এই আন্দোলনের শুরু অবশ্য তারও এক বছর আগে। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারিতে। ওই দিনে বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করেন আজকের বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

বঙ্গবন্ধুকে খুব কাছ থেকে দেখার, প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। আমি তাঁর চিন্তাচেতনায়, মননে স্বাধীনতাকে দেখেছি। আর তাই তো ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬-দফা এবং ১৯৬৯ সালের স্বপ্নশিখরে পৌঁছে দেন। তাঁর নেতৃত্বেই বাস্তবায়িত হয় মহান গণঅভ্যুত্থানের

সিঁড়ির পেরিয়ে তিনি গোটা জাতিকে স্বাধীনতার স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ। বিশ্ব-মানচিত্রে ঠাঁই করে নেয় গাঢ় লাল-সবুজের প্রিয় জাতীয় পতাকা। আজকে, আমার প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আত্মপ্রকাশের দিনে, খুব করে মনে পড়ছে বঙ্গবন্ধুকে। আসলে কেমন ছিলেন বাঙালির চিরজনমের আত্মার আত্মীয় হয়ে থাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান? তিনি নানাভাবে চিত্রিত হয়েছেন বিভিন্ন জনের কাছে। নন্দিত হয়েছেন দেশে-বিদেশে।

বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে আমি আমার অভিজ্ঞতাই আজকের লেখায় লিখছি, স্মৃতির পাতা থেকে। বঙ্গবন্ধু মনপ্রাণ উজাড় করে ভালবাসতেন বাংলাদেশ-বাঙালিকে। হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতেন বাঙালির দুঃখ-কষ্ট। বাঙালির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তিনি বাংলায় মিশে আছেন। দেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় তাঁর স্মৃতি অমর হয়ে আছে, থাকবে বহুকাল-চিরকাল। বাঙালির প্রতিটি বসতভিটা, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, দিগন্ত প্রসারিত সবুজে উজ্জ্বল হয়ে থাকা বঙ্গবন্ধু বিশ্ব-দরবারেও সমানভাবে উদ্ভাসিত হয়ে আছেন। আজও বিশ্ববাসী বঙ্গবন্ধুর নাম শুনে শ্রদ্ধায় নত হয়। বঙ্গবন্ধুকে নিঃস্ব-নিরন্ন, দিগ্‌ভ্রান্ত অসহায় মানুষের অধিকার রক্ষার মূর্তপ্রতীক হিসাবে অভিষিক্ত করে।

বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে আমার স্মৃতি শেষ নেই। দুনিয়ার অনেক দেশ আমি সফর করেছি বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী হয়ে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রতিটি ফেরামে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। ওই সময়ে খুব কাছ থেকে অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু শিখেছি। আমার এখনও চোখে ভাসে, মন-মননে পাহাড় সমান উচ্চতার তেজোদীপ্ত এই মানুষটি জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় কী সাবলীল বক্তৃতাই না করলেন! বাংলায় ভাষণ দিয়ে দারুণ এক অসাধ্য সাধন করে গেছেন এই মহান ব্যক্তিত্ব। আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রথম বাংলাভাষী এই বক্তার ভাষণ শুনে সেদিনের উপস্থিত রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সকলে বিমোহিত হন। ভাষণ শেষ হওয়ার পর নিজ নিজ আসন ছেড়ে এসে করমর্দন করে শুভাশিস জানান বঙ্গবন্ধুকে। জাতিসংঘে সেইদিন বঙ্গবন্ধু মন্ত্রমুগ্ধের মতো বক্তৃতা দিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাঙালী জাতিকে সম্মানিত করেছেন।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপোসহীন। শ্রদ্ধা করার মতো ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মানুষটি খুব সহজেই মানুষকে কাছে টেনে নিতেন। নাম মনে রাখতে পারতেন মাঠপর্যায়ের কর্মীদেরও। সঠিক সময়ে শতভাগ নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। তিনি যা কিছু বলতেন, চিন্তাভাবনা করে বলতেন এবং একবার যা বলতেন, সেখান থেকে একচুলও নড়চড় করতেন না। আর সম্ভবত এই একটিমাত্র কারণেই বঙ্গবন্ধুর জীবনের কোথাও ব্যর্থতার কোন ছাপ পড়েনি। তিনি নেতা হওয়ার বাসনা নিয়ে আওয়ামী লীগের জন্ম-বিকাশ ঘটাননি। নিজ হাতে গড়া সংগঠন আওয়ামী লীগের মাধ্যমে দেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। আর তাই তো তিনি জনগণের নেতা হয়েছেন। হয়েছেন নেতারও নেতা।

প্রতিটি বাঙালির মতো আওয়ামী লীগের প্রতিটি কর্মীকেও হৃদয় উজাড় করা ভালবাসা দিয়ে কাছে টেনে নিতেন বঙ্গবন্ধু। কর্মীরাই ছিল তাঁর সবকিছু। আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক দক্ষতা বাড়াতে তিনি বন্ধুর পথ ডিঙ্গিয়ে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বঙ্গবন্ধু সৎ-নিষ্ঠাবান কর্মীদের কাজের মূল্যায়ন করতেন। তাদের উৎসাহ দিতেন নানাভাবে। প্রশংসা করে কর্মীদের নব উদ্যমে উজ্জীবিত করতেন। কর্মীর ক্ষুদ্র অবদানকে অনেক বড় করে দেখিয়ে তাকে বিরাট অবদান সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দিতেন। বিশাল হৃদয়ের এই মানুষটি সকল রকমের ঝড়-ঝাপটা থেকে কর্মীদের আগলে রাখতেন সযত্নে। যে কোন স্তরের কর্মী যখন-তখন ইচ্ছা করলেই বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়ে তাদের সুখ-দুখের কথা জানাতে পারতেন। আর এই কারণেই বঙ্গবন্ধু হয়েছেন সবার প্রিয়। প্রিয় মানুষ, প্রিয় নেতা।

পাকিস্তানের সকল স্বৈরশাসকই বঙ্গবন্ধুকে জেলে আটক করেছে। যার কারণে চৌদ্দটি বছর কারাগারের দুঃসহ-দুর্বিসহ জীবনযাপন করতে হয়েছে তাঁকে। ওই সময়ে জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন, শাসকের রক্তচক্ষু আর ফাঁসির মঞ্চই ছিল বঙ্গবন্ধুর নিত্যদিনের সাথী। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন বহুবার। আর বঙ্গবন্ধু সব সময়ই তাঁর দেশ ও দেশের মানুষের জন্য এই সবকিছুকে বরণ করেছেন হাসিমুখে। এমনকি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের কারাগারের ভিতরে খুঁড় রাখা কবরের পাশে বসেও তিনি স্বাধীনতার প্রশ্নে অবিচল থেকেছেন। তাই তো গোটা বাঙালি জাতির আস্থা-বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে। বঙ্গবন্ধু আবর্তিত হয়েছিলেন জাতির আদর্শের প্রতীক হয়ে।

১৯৬৬ সালের এপ্রিল। ঐতিহাসিক ৬-দফার আন্দোলন তখন তুঙ্গে। মুক্তির নেশায় জনগণ উম্মাতাল। ওই সময়ে বঙ্গবন্ধু প্রথমে যশোর ও পরে খুলনায় জনসভা শেষ করে যশোর হয়ে ঢাকায় ফেরার পথে যশোরে গ্রেফতার হন এবং তৎকালীন মহকুমা প্রশাসকের কোর্টে অন্তবর্তী জামিন পান। কিন্তু ঢাকা মহকুমা প্রশাসক জামিন নামঞ্জুর করেন। পরে সেশন জজের আদালতে জামিন নিয়ে বঙ্গবন্ধু সন্ধ্যা ৭টায় বাসায় আসেন। ৮টার দিকে সিলেটে জনসভার বক্তৃতার ওপর ভিত্তি করে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হলে তিনি আবারও গ্রেফতার হন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সিলেট কারাগারে। সেখানেও মহকুমা প্রশাসক জামিন নামঞ্জুর করলে সেশন জজের আদালতে জামিন নিয়ে বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান। এর পরেও বহুবার কারা-দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে তাঁকে। ময়মনসিংহে দেয়া বক্তৃতার জন্য দায়েরকৃত মামলায় সিলেট কারাগারের গেট থেকেই গ্রেফতার করে রাতেই ময়মনসিংহে নিয়ে যাওয়া হয় বঙ্গবন্ধুকে। সেখানেও মহকুমা প্রশাসক জামিন নামঞ্জুর করলে সেশন জজের আদালতে জামিন নিয়ে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন।

এই যে দফায় দফায় গ্রেফাতার করা হলো, অত্যাচার-নিপীড়ন চালানো হলো, তারপরেও কিন্তু দমে যাননি বঙ্গবন্ধু। মন-মানসিকতায় চিড় ধরেনি একটুও। বরং ঠিক উল্টোটাই হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর বাঙালি স্বজনের মুক্তির লক্ষ্যে আরও শাণিত

হন। জীবন-মরণ ঝুঁকি নিয়ে মুক্তির সনদ ৬-দফার প্রচার কাজ চালান আরও ব্যাপকভাবে, মরিয়া হয়ে। ১৯৬৬ সালের ৮ মে নারায়ণগঞ্জের বিশাল জনসভা শেষে রাতে ঢাকায় ফিরে আসার পর রাত ১টায় তিনি গ্রেফতার হন পাকিস্তানের নিরাপত্তা আইনে। এবার তাঁর স্থান হয় ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে। এর পরপরই গ্রেফতার হন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের হাজার হাজার নেতাকর্মী। তাঁদের জীবনেও নেমে আসে অবর্ণনীয় নির্যাতনের স্টিমরোলার।

১৯৬৬ সালের ৭ জুন। বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি এবং ৬-দফা বাস্তবায়নের দাবিতে আওয়ামী লীগের ডাকে গোটা বাংলায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। বাঙালির রক্ত ঝরে ঢাকার তেজগাঁও, নারায়ণগঞ্জের আদমজীসহ বিভিন্ন স্থানে। মনু মিয়া ও মুজিব উল্লাহসহ অনেকের রক্তে লাল হয় পিচঢালা কালো রাজপথ। ক্ষুব্ধ বাঙালি এর প্রতিবাদে আরও গর্জে ওঠে। অন্যদিকে ঘৃণিত স্বৈরাচার জেনারেল আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করতে, নিজের গদি টিকিয়ে রাখতে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মেতে ওঠে। ওই ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি দিবাগত রাত ১টায় বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিয়ে কারাগারের গেট থেকেই আবারও গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। সেনানিবাসের একটানা প্রায় ৫ মাসের দুঃসহ জীবনে বঙ্গবন্ধু বাইরের জগতের কারোর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাননি। সংবাদপত্র পাঠের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হন তিনি। এমনকি ছোট খুপরির মতো একটি ঘরে একাকী আটকে রেখে গোটা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় তাঁকে। অর্থাৎ মানসিক যন্ত্রণা দেয়ার জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন, তার সবটাই করা হয়েছে সেনানিবাসের ওই ছোট প্রকোষ্ঠে।

১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি দুটো কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার জীবনে। প্রথমটি– এই দিনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রছাত্রী সংসদের (ডাকসু) ভিপি নির্বাচিত হই। পরেরটি– ভিপি নির্বাচিত হওয়ার পর কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু আমাকে দোয়া করে অভিনন্দনপত্র পাঠান। তিনি অভিনন্দ পত্রে ডাকসু নেতৃত্বের সংগ্রামী ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা করেন। বঙ্গবন্ধুর দোয়া-প্রত্যাশা বৃথা যায়নি। সেদিনের ডাকসুসহ চারটি ছাত্র সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৯৬৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে। সৃষ্টি করে ২৪ জানুয়ারির গণঅভ্যুত্থানের।

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী হিসাবে বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরু হয় ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন। এই বিচার যে একটা প্রহসন ও বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিতে ঝোলানোর ষড়যন্ত্র, তা বুঝতে একটুও কষ্ট হয়নি বাঙালিদের। আর তাই তো আসাদ, মতিউর, রুস্তম, মকবুল, সার্জেন্ট জহুরুল হক, ড. শামসুজ্জোহা ও আনোয়ারসহ অনেকের রক্তের বিনিময়ে বাঙালি ২২ ফেব্রুয়ারি তাদের প্রিয় মানুষ শেখ মুজিবুর রহমানকে সেনানিবাস থেকে মুক্ত করে আনে। পরের দিন ২৩

ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সংবর্ধনাসভায় আসেন শেখ মুজিব। ঐতিহাসিক এই দিনটি আমার জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার জীবনে এমন সুখের দিন আর কখনও আসেনি। তাই তো জীবনভর এই দিনটির কথা স্মরণে থাকবে আমার। আসলেই আমি চমৎকার সৌভাগ্যবান মানুষ। জনসমুদ্রে সভাপতিত্ব করার দুর্লভ সুযোগও পাই আমি।

সেদিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রাণের জোয়ার নামে। ১০ লাখ মানুষের পদভারে গোটা উদ্যানের সবুজ ছেয়ে যায়। গোধূলিলগ্নের অদ্ভুত সুন্দর আলোর আভায় মঞ্চে আসেন শেখ মুজিব। কেঁপে ওঠে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। সমবেত সকলের, জাতির কৃতজ্ঞতা, বাঙালি মনের আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ ঘটে একটি কণ্ঠে– আজ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু, বাংলার বন্ধু–যিনি ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। আওয়ামী লীগের জন্মদিনে বঙ্গবন্ধুকে সালাম জানাই। তাঁর প্রতি শত সহস্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

তোয়াব খান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা। বিশাল হৃদয়ের মানুষ নিঃসন্দেহে। মানুষ হিসেবে নেতা হিসেবে তুলনাহীন। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন দক্ষ এবং সফল। যে-অবস্থায় বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে ত্রিশ লাখ মানুষ মারা গিয়েছিল, দশ লাখ মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করা হয়েছিল, দশ লাখ মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করা হয়েছিল, যে-দেশের ৯০ শতাংশ অবকাঠামো ধ্বংস করা হয়েছিল, যে-দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করা হয়েছিল, যে দেশে কোনো প্রশাসন ছিল না সে দেশে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে যে-দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়, নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেদিক থেকে অদক্ষ ছিলেন না। তা যদি হতো, তা হলে দুই-আড়াই বছরের মধ্যে একটি স্বাধীন দেশের উপযোগী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারতেন না। দ্বিতীয়ত সব থেকে থেকে বড় সাফল্য তাঁর, মাত্র এক বছরের কম সময়ের মধ্যে স্বাধীন দেশের জন্য একটি সুষ্ঠু আদর্শ সংবিধান উপহার দেয়া, যা পাকিস্তান তার পঁচিশ বছরেও পারেনি।

বঙ্গবন্ধু প্রায়ই বলতেন একটা কথা। কোনো দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম বা মুক্তিযুদ্ধ "একদিন সুন্দর প্রভাতে উঠিয়া ঘোষণা করিলাম আর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হইয়া গেল"— এটা দুনিয়ার কোনো দেশেই ঘটেনি। এবং ঘটতে পারে না। স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি দীর্ঘ প্রস্তুতির বিষয়। দেশ ও জাতিকে সেভাবেই তৈরি করে সেপথে নিয়ে যেতে হয়। পর্যায়ক্রমে এগুতে হয়। বঙ্গবন্ধুর মতে, তিনি সেভাবেই দেশটাকে তৈরি করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন একটি নিরস্ত্র জাতির জন্য একমাত্র অস্ত্র। সে-অস্ত্র সমগ্র জাতি প্রয়োগ করতে পারে। এজন্যই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য ছিল। বঙ্গবন্ধু নিজেই একথা বলতেন। গান্ধীজির আন্দোলনে ব্রিটিশকে ভারত থেকে বিতাড়িত করার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু কীভাবে, সেটা পরিষ্কার নয়। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের পরিষ্কার কিছু লক্ষ্য ছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে সেগুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর একটা হলো : 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

অর্থাৎ স্বাধীনতা আর মুক্তি অর্জন করে ছাড়ব। আমরা কীভাবে করব। তিনি দেশবাসীকে বলেছেন : 'যার যা আছে তা-ই নিয়ে তৈরি হয়ে যাও। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।' লড়াই করব কীভাবে? পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে 'আমরা ভাতে মারব, পানিতে মারব।' ব্রিটিশ শাসকদের ঘাঁটি ছিল ভারতে, কিন্তু পাকিস্তানি শাসকদের মূল সরবরাহের ঘাঁটি ছিল ১২০০ মাইল দূরে। যদি এই সরবরাহ লাইন কেটে দেয়া যায়, সেটা অসহযোগের মাধ্যমে হোক আর সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই হোক, তা হলে এদের পতন ঘটবে, সম্ভবত এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর মূল পরিকল্পনা। স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রস্তুতি বিষয়ে তাঁর মূল পরিকল্পনা।

স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রস্তুতি বিষয়ে তাঁর বক্তৃতায় তেমন কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে তিনি প্রায়ই একটা কথা বলতেন যে লাখ লাখ লোক ভারতে আশ্রয় নেয়; এ ছাড়া পুরো আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব, সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য যারা পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করছিল, ভারতে শুধু রাজনৈতিক আশ্রয়ই পেল না, অন্যান্য সহযোগিতাও পেয়েছিল। এগুলো কি এমনি-এমনি হয়েছিল? বিনা প্রস্তুতিতে কেউ কাউকে আশ্রয় দেয়? দুনিয়ার কোথাও-না-কোথাও একটা প্রস্তুতি নিশ্চয়ই ছিল।

রাজাকার-আলবদরবিষয়ক সিদ্ধান্ত, উদারপন্থা বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করেছিলেন— এমন কথা শোনা যায়। আমার মতে রাজাকার-আলবদর বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর যে-নীতি, তা খুবই উদার ছিল এমন বলা অনুচিত। ১৯৭৪ সালে লাহোর ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন থেকে ফিরে বঙ্গবন্ধু রাজাকার-আলবদর তথা পাকিস্তানি দালালদের (কোলাবরেটর) জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। এই ঘোষণায় কিন্তু তিন ধরনের যুদ্ধপরাধীকে ক্ষমা করা হয়নি। (এক) যারা হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল; (দুই) যারা নারীধর্ষণে লিপ্ত ছিল; (তিন) যারা অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ইত্যাদিতে জড়িত ছিল। এই তিন ধরনের অপরাধীরা ক্ষমার আওতায় পড়বে না। অতএব ঢালাওভাবে বলা ঠিক হবে না যে, বঙ্গবন্ধু রাজাকার-আলবদরদের ক্ষমা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু মনে করেছিলেন কোনো না কোনো পর্যায় থেকে একটা জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা উচিত। সে-লক্ষ্যেই তিনি জাতীয় মার্জনা (ন্যাশনাল ক্লিমেন্সি) ঘোষণা করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বঙ্গবন্ধু বন্দি ছিলেন পাকিস্তানে। ফিরে এসে সচেতনভাবে বঙ্গবন্ধু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। প্রথমত বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা। তিনি মনে করেছিলেন, বাংলাদেশে যদি ভারতের সেনাবাহিনী থাকে তবে দুনিয়ার কোনো দেশই বিশ্বাস করবে না যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। সেজন্যই বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে ফেরার পথেই দিল্লিতে জনসভায় তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, আগামী স্বাধীনতা দিবসের আগেই যেন ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ থেকে চলে যায় এবং ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবেই এই প্রস্তাব মেনে নেন।

এভাবেই তিনি একের পর এক ব্যবস্থা নিয়ে ওই বলয় থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন।

ওআইসি সম্মেলনে যাওয়ার ব্যাপারে বলা দরকার, ওআইসি একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান। ৪০-৪৫টি মুসলিম দেশ ওআইস'র সদস্য। বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান দেশ। অতএব, বাংলাদেশ এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকতে পারে না, এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব চিন্তা। সেই চিন্তা থেকে বঙ্গবন্ধু ওআইসি সম্মেলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এখানে দুটো ছোট ঘটনার কথা বলছি। পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে পিরে এসে বঙ্গবন্ধু ইসলামি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। শুক্রবারে বায়তুল মোকাররমে জুমার নামাজও পড়তে গেলেন। এগুলো স্পষ্ট সিগন্যাল, আমরা মুসলমান এবং তার বাইরে চলে যাইনি। এখানে আরও কিছু উদ্দেশ্য ছিল— লাহোর ওআইসি যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, তা হলে অন্যান্য মুসলিম দেশের স্বীকৃতি সহজেই আদায় করা যাবে।

ছোট্ট একটা গল্প বলি। ১৯৭২ সালের মে মাসে শ্রমিক-নেতা মান্নান ওয়াপদা ঘেরাও করলেন। খবর পেয়েই বঙ্গবন্ধু সেখানে ছুটে যান এবং শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেয়। এভাবেই ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ ও উপস্থিতির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দিতে হয়। আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে যে-অভিযোগগুলো ছিল, তা ছিল স্বাভাবিক। সদ্য-স্বাধীন দেশে অবকাঠামো ছিল না বললেই চলে। প্রশাসন চালানোর মতো দক্ষ লোকবলের তীব্র অভাব। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছিল না। সেগুলো নতুনভাবে তৈরি করতে বেশ সময় লাগে। রাস্তাঘাট ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় পুলিশ অনেক সময় ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারত না যথাসময়ে। মুক্তিযোদ্ধারাও অনেক থানা ধ্বংস করেছিল। সব মিলিয়ে আইনশৃঙ্খলার উন্নতি বিধানে খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে। সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হচ্ছিল আস্তে আস্তে।

বাকশাল সম্পর্কে পপুলার কতোগুলো ধারণা আছে। যেমন অনেকে বলেন, বাকশাল সোভিয়েট ইউনিয়নের চাপে কিংবা পরামর্শে করা হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু চিকিৎসার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন গিয়েছিলেন এবং ২১ দিন সেখানে ছিলেন। এই ২১ দিনের মধ্যে মাত্র একদিন সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে আমিও উপস্থিত ছিলাম; এ-ধরনের কোনো আলোচনা হয়নি। দেশের কমিউনিস্টদেরও বঙ্গবন্ধু খুব ভালোভাবে জানতেন এবং বুঝতেন। এদের চাপে বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন, এমনটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। বঙ্গবন্ধু নিজে মনে করেছিলেন, বাকশাল গঠন দেশের জন্য ভালো হবে। সে-কারণেই বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠন করেন। বাকশালের কতোগুলো মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। (এক) জাতীয় ঐক্য; (দুই) দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ; (তিন) জন্মনিয়ন্ত্রণ; (চার) উৎপাদন বৃদ্ধি। মজার ব্যাপার হলো, এই ৪- দফা কিন্তু জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর তাঁর ১৯-দফা কর্মসূচির মধ্যে গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে

এরশাদও এই ৪-দফা গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এই-৪ দফা এমনই গুরুত্বপূর্ণ দফা যে কেউই সেগুলো বাদ দিতে পারেননি।

বেগম মুজিবের ভূমিকা :

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে অবশ্যই বেগম ফজিলাতুন্নেসার প্রভাব ছিল সহধর্মিণী হিসেবে। অনেক কিংবদন্তি বাজারে চালু ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাওয়ালপিন্ডিতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে গোলটেবিল বৈঠকে। মুক্ত না করে জামিনে। বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন, তুমি গোলটেবিল বৈঠকে যেও না, গেলে বঁটি দিয়ে কেটে ফেলব। বঙ্গবন্ধু যেহেতু জীবনভর রাজনীতি করেছেন, সে-কারণে তিনি তাঁর পরিবারের প্রতি খুব একটা খেয়াল রাখতে পারেননি। বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব এককভাবে সংসার চালিয়েছেন। সন্তানদের ভালোভাবেই বড় করেছেন।

হত্যা ও নিরাপত্তা দায়িত্বশীলরা কেউ কিছু করেননি। বঙ্গবন্ধু নিজেই এগুলো জানতেন। এদের কথা হয়তো জানতেন না, যারা তাঁকে হত্যা করেছে। জানলেও তিনি এগুলো গুরুত্ব দিতেন না। বঙ্গবন্ধু মনে করতেন, বাংলাদেশের কোনো মানুষ তাঁকে হত্যা করতে পারে না। তিনি প্রায়ই বলতেন, তোমরা তো আমার কথা শুনছ না। কিন্তু যখন ক্যাপ্টেন সাহেব আসবে, বেত দিয়ে পেটাবে, তখন তাদের কথা শুনবা। তারা তো আমাকে কিছু বলবে না, বলবে তোমাদের। অর্থাৎ এই ইনফরমেশন তাঁর কাছে ছিল এবং বিশ্বাস করতেন—ক্যাপ্টেন সাহেব তাঁকে কিছু করবে না।

এখন তো অনেক কিছু শোনা যায়, কোনো দেশের রাষ্ট্রদূত নাকি তাঁর কাছে গিয়েছিলেন সতর্ক করার জন্য ইত্যাদি। যা-ই হোক, এসব সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। তবে এগুলো জানানোর দায়িত্ব ছিল যাদের, তাঁরা তাঁকে জানাননি, এটা এখন পরিষ্কার বোঝা যায়। নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এমন দু-একজনকে ১৫ আগস্ট সম্পর্কে যখন জিজ্ঞেস করেছি এমন ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড কীভাবে ঘটল? তাঁদের জবাব এমন নিরুদ্বেগ ছিল যেন কিছুই ঘটেনি।

স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু যেমন

সুলতানা কামাল

পৃথিবীর ইতিহাসে যে-ক'জন বিরল ব্যক্তিত্ব তৃণমূল থেকে একেবারে শীর্ষ নেতায় রূপান্তরিত হয়েছেন— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তাঁদের অন্যতম। নিঃসন্দেহে তিনি ইতিহাসের একজন নিয়ামক, একজন নায়ক ছিলেন, ছিলেন সত্যিকার অর্থে জনমানুষের নেতা।

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সাথে সাথে বাংলার যে-মানুষটি প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হন— তিনি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। আইয়ুবশাহির একটা বিরাট কর্তব্যই যেন ছিল শেখ মুজিবকে হয়রানি করা।

মনে আছে, শেখ মুজিবকে বন্দি করে নেওয়ার কারণে আমেনা বেগম আওয়ামী লীগের দায়িত্বে ছিলেন। একদিন সকালের দিকে তিনি জিপে করে একজন ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে করে আমার মা'র কাছে নিয়ে আসেন। জানতে পারি সঙ্গের ভদ্রমহিলা বেগম মুজিব। তিনি যে-বাড়িতে ছিলেন সেই বাড়ির বাড়িওয়ালা বেগম মুজিবকে বলেছেন অবিলম্বে বাড়িটা ছেড়ে দিতে। শেখ মুজিবের পরিবারকে তিনি ভাড়াটে হিসাবে রাখতে পারবেন না। রাখলে তাঁর বিপদ হতে পারে। মা (সুফিয়া কামাল) সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাড়িওয়ালার সাথে কথা বলেন। কারণ, তাঁর একটা বাড়িতে তখন কোনো ভাড়াটে ছিল না। কিন্তু বাড়িওয়ালা শেখ মুজিবের প্রসঙ্গ শুনেই না করে দেন। মা তখন সেগুনবাগিচায় আশরাফ আলী চৌধুরীর সাহায্যে বেগম মুজিবের জন্য একটা বাড়ি ভাড়া পাওয়ার ব্যবস্থা করেন দেন। এর পরপরই বেগম মুজিব জানালেন, হাসিনাকেও স্কুল থেকে বলা হয়েছে যে, তাদের পক্ষে হাসিনাকে আর সেই স্কুলে রাখা সম্ভব হবে না। মা তখন হাসিনাকে নারীশিক্ষা মন্দিরে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে দেন। মা নারীশিক্ষা মন্দিরের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য থাকাতে সেটা সুবিধা হয়েছিল। তখন আমিও ঐ স্কুলেই তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। তখন থেকেই হাসিনা আর আমি সহপাঠী।

উপরের ঘটনাগুলি উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছিল একটা সংকটাপন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে। তাই আমার মা'র সাথে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কটা ছিল গভীর মমতার, যা পরবর্তী সময়েও অটুট ছিল। এখানে ছিল না কোনো ক্ষমতার লেনদেনের বিষয়, ছিল না কোনো সুযোগ-সুবিধার হিসাব-নিকাশ। অত্যন্ত মানবিক বন্ধুত্ব, দুঃসময়ে পাশে থাকার একটা বন্ধন।

এখনও বুকের গভীরে একটা উদ্বেল আবেগ তরতরিয়ে ওঠে যখন ১৯৬০-এর দশকের সেই সময়ের শেখ মুজিবকে মনে পড়ে। ১৯৬২-র অক্টোবরে একই দিনে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে আমরা নিজেদের বাড়িতে উঠে আসি। একই রাস্তায় বসবাস, তাই নিত্য সংযোগ। টুলু (আমার ছোট বোন) আর আমি যাতায়াতের সুবিধা বিবেচনা করে নারীশিক্ষা মন্দির ছেড়ে কামরুন্নেসা স্কুলে ভর্তি হলাম। হাসিনা তখন আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়ে। আমরা দুই বোন এক বছর কামরুন্নেসায় পড়ে আজিমপুর বিদ্যালয়ে চলে এলাম। আবার একসাথে স্কুলে যাওয়া, খেলাধুলা, তর্ক-বিতর্ক, ভাব হওয়া। পাড়ার বন্ধু হিসাবে স্কুলের পরে গল্প গুজব।

এরই মাঝে ৬-দফা, ১১-দফা আন্দোলন। শেখ মুজিব ক্রমশ শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধুতে পরিণত হচ্ছেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হলো। বঙ্গবন্ধুর মাথার উপর ফাঁসির দড়ি ঝুলছে। গণআন্দোলনের প্রচণ্ড আঘাতে বন্দিশালার চার দেয়াল বঙ্গবন্ধুকে আর ধরে রাখতে পারল না। দেশের শীর্ষ নেতার আসন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল। একদিন এরকম অবস্থায় আমি হেঁটে বড় রাস্তায় যেয়ে গাড়ির খোঁজে রওনা হয়েছি— বঙ্গবন্ধু বাড়ি থেকে গাড়িতে করে বেরিয়েছেন সকালের কাজে। গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন "মামা, কই যাও" আমরা মামা সম্বোধন করতাম। পালটা তিনিও মামা বলে কথা শুরু করতেন। আমার রেডিও অফিসে যেতে হবে শুনে গাড়িতে তুলে নিলেন। কুশল বিনিময় ইত্যাদির সাথে ধানমন্ডি থেকে যখন ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট ছাড়িয়ে প্রেস ক্লাবের দিকে গাড়ি মোড় নিল, আমাকে বললেন, "মামা, আমার তো মামলার শুনানি আছে, সময়মতো উপস্থিত না হলে এক্স পার্টি হয়ে যাবে, আমি কোর্টে নেমে গেলে গাড়ি তোমাকে রেডিও অফিসে দিয়ে আসবে।" এখন অবাক লাগে শেখ মুজিবের উচ্চতার এক মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রীকে কত সাদরে, সম্মানে তার কাজের জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার ঔদার্য ধারণ করতেন।

খুব ব্যক্তিগত কত স্মৃতিও চলে আসে। আমার বাবা ৩২ নম্বর রাস্তা দিয়ে হেঁটে মিরপুর রোড পর্যন্ত যেতেন বিভিন্ন কাজে। বাবার মাথায় টাক ছিল এবং খুবই ফর্সা রং থাকাতে রোদে মুখ মাথা সব লাল হয়ে যেত। বঙ্গবন্ধু লেকের ধারে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কখনো আমাদের বারান্দায় এসে মা-বাবার সঙ্গে কথা বলে যেতেন। একদিন বললেন, "হাসুর মা বলেছেন দুলাভাই লেক থেকে কিছু শ্যাওলা তুলে তা দিয়ে মাথাটা ঢেকে যান না কেন, রোদের চোটে লাল হয়ে যেতেন না।" বাবার উত্তর ছিল, "শুনেছি ওনার মাথায় অনেক চুল, এক গোছা কেটে দিলে মাথায় পরে নিতাম।" এমনই নানান কথায় অন্তরঙ্গতা আর অন্তরিকতা ফুটে উঠত দুই পরিবারের সম্পর্কের মধ্যে।

১৯৭১-এর একটা ঘটনা মুছে ফেলা যায় না। মার্চ মাসের উত্তাল সময়। সারা দিন, সারা রাত্রি চলেছে নানান কর্মযজ্ঞ। মিটিং, মিছিল, রিহার্সাল, অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে নিজের জন্য কারোই সময় নেই। পাশের বাড়ির ছোট ছেলে আজফার সারা

সকাল অপেক্ষা করে থাকে কখন একটু 'শেখ মুজিব'কে দেখবে। সেই দিন তারিখটা ছিল ৬ মার্চ ১৯৭১। আমি সকালের মিটিং সেরে দুপুরে ফিরেছি আবার বিকেলে বের হব বলে। বাবা বললেন আজফার আজকে 'শেখ মুজিব'কে না দেখে বাড়ি যাবে না। হাসিনাকে ফোন করতে হলো। হাসিনার কাছে জানলাম বঙ্গবন্ধু সারাদিন কারো সাথে কথা বলতে পারেননি। ৭ মার্চ ভাষণ দেবেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে– 'চার খলিফার' চাপ স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে হবে। ভয়ানক ব্যস্ততা বঙ্গবন্ধুর। তবুও ঠিক চারটায় তিনি চায়ের জন্য হাসিনাকে ডাকেন। তখন আজফারকে নিয়ে গেলে দেখা হতে পারে। আজফারকে নিয়ে গেলাম বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে। ভিড় ঠেলে সুফিয়া কামালের মেয়ে বলে ঢুকতে পারলাম। ঠিক চারটায় বঙ্গবন্ধু দরজা খুলে হাসিনাকে চায়ের জন্য বললেন। হাসিনা আজফারকে কোলে করে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। সেই ৬ মার্চের অসম্ভব একটা সময়েও তিনি হাসিমুখে আজফারকে কোলে তুলে নিলেন, নিজের গলার মালাটা খুলে ওর গলায় পরিয়ে দিলেন— চোখে অবশ্যই অশ্রু টলমল করছিল। এই ছিলেন বঙ্গবন্ধু। কী বৃদ্ধ, কী যুবক, কী তরুণ/কিশোর, কী শিশু সবার জন্য ছিল তাঁর হৃদয় অবারিত, তাঁর হস্ত প্রসারিত এবং নেত্র অশ্রুসজল। তিনি যে তাঁর দেশের সব মানুষের হাসিমুখটাই দেখতে চাইতেন এবং সেজন্য ছিলেন আবেগ-থরথর—আমার স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধুর সেই চেহারাটাই ফুটে আছে।

সোনার অক্ষরে লেখা নাম : জয় বঙ্গবন্ধু

বেলাল চৌধুরী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে একটি সচল জীবনপ্রবাহ, একটি সম্পূর্ণ জীবনদর্শন, একথা কি আজ আর নতুন করে তোলার প্রয়োজন আছে? প্রকৃত প্রস্তাবে এই ব্যাপারটাকে খণ্ড করে দেখতে গেলেই যত বিপত্তি। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে যিনি মিশে আছেন মানুষের প্রাণ-সঞ্জীবনী শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো, তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের ব্যাপ্তি এতই সুবিশাল যে তাঁকে দেশকাল-পাত্রের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতর দেখার প্রয়াসটাই একটা নিদারুণ ও মারাত্মক ভুল, সাধারণত কুয়োর ব্যাঙেরা যে-ভুল করে থাকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আছেন তিনি নিরন্তর নদীর স্রোতে, সাগরের তরঙ্গ কল্লোল, আকাশের অবারিত নীলিমায়, জারি-সারি, মুর্শিদা আর উদাত্তকণ্ঠ ভাটিয়ালির সুরে, লতাপাতার ঝিরিঝিরি মর্মরে, পাখির কলরবে, শ্রমিকের মুষ্টিবদ্ধ হাতে, কৃষকের শরীরে মুক্তোদানা ঘামে, নৌকোর মাঝির হিল্লোলিত পেশিতে, শিশুদের কলকাকলিতে, আবালবৃদ্ধবনিতার দৃপ্ত শপথে। একথাগুলোকে কিন্তু আবেগতাড়িত কাব্যকথা ভাবলে ভুল করবেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের আপামর শোষিত, নিপীড়িত সাধারণ মানুষের স্বতোৎসারিত নিত্যপ্রবাহিত জীবনপদ্ধতির ধারাবাহিক ছন্দের ভেতর গেঁথে আছেন চিরদিনের মতো। আবহমান বাংলা ও বাঙালির যত ঐতিহ্যবাহী লোকজ ধারা রয়েছে, তার প্রতিটির ভেতরই তাঁর অধিষ্ঠান, হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত অমলিন রক্ত শতদলের মতো।

শোষিতের গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর আরাধ্য ধ্যানজ্ঞান, স্বপ্ন-সাধ যা-কিছু। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের মহান স্থপতি এবং বাঙালি জাতির জনকের স্বপ্ন কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমরা ১৯৬৯-৭০-এ যেমন তাঁর নামের মন্ত্রে বাংলাদেশের আট কোটি মানুষ যে একই সুত্রে গ্রথিত হয়েছিল সেকথা কি আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে? বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম নতুন দেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল তাঁরই নেতৃত্বে সে-কথাটাই উচ্চারণ করতে অনেকে বিষম খায়, এটাই আমাদের কাছে পরম দুঃখের। মুজিব ছিলেন দোষে-গুণে আমাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ। সাধারণ ঘরের ছেলে। আপ্লুত হয়ে উঠতেন প্রবল আবেগে। ভেসে যেতেন ভাবাবেগে, সমান স্নেহ-মমতায় হয়ে

পড়তেন বিগলিত, অথচ এই মানুষটিই যখন কোনো সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন, সেই বাল্যবয়স থেকেই হয়ে উঠতেন অপ্রতিরোধ্য, আকাশচুম্বী উন্নত শির, বজ্রকণ্ঠ নির্ঘোষে অটল। ন্যায়নীতির প্রশ্নে আমৃত্যু ছিলেন অবিচল ও আপোসহীন, নিজের পছন্দেই বেছে নিয়েছিলেন সংগ্রামের জীবন যে-জীবন ছিল চরম অনিশ্চয়তার, আত্মত্যাগের। শেখ মুজিব তাঁর সংগ্রামমুখর ও কর্মবহুল জীবনে কখনো কোনো বাধাকেই বাধা বলে মানেননি। কোনো বিপত্তিকেই বিপত্তি হিসেবে গণ্য করেননি। প্রকৃত অর্থে শেখ মুজিবই প্রথম বাঙালি যিনি জগৎসভায় বাংলাদেশকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাঁর পূর্বসূরিদের পথ ধরে।

অথচ আজকে আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, সেই শেখ মুজিবকে নিয়েই শুরু হয়েছে নানারকম কূটচাল, যখন তিনি সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে এবং শুধু নিজেই নন, তাঁর প্রিয় স্বজনদের বুকের তরতাজা রক্ত দিয়ে শোধ করে গেছেন সব ঋণ। ব্যক্তি হিসেবে এই নিদারুণ ঘটনা যখন আমাদের কাছে চরম ও পরম লজ্জার তখনও আমাদের বোধোদয় ঘটেনি। অবশ্য সমগ্র ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকালে এটা নতুন কিছু বা বিছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। যুগে যুগে দেশে দেশে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে মাত্র। শুনতে অপ্রিয় হলেও সত্য কথা বলতে গেলে ইসলামের গোটা ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়গুলোই রক্তাক্ত ও শোকাবহ। ভাই সহোদর ভাই'র পিটে পেছন থেকে ছুরি বসিয়েছে, পিতা সন্তানকে, সন্তান পিতাকে, তা ছাড়া প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র, কলহ-বিবাহ, উদগ্র ক্ষমতালিপ্সা, হানাহানি তো আছেই। অথচ ইসলাম কথাটার মানেই শান্তি। রসুলে করিম (সাঃ)-এর আদর্শ ছিল মানুষের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, পরমতসহিষ্ণুতা এবং সবচেয়ে বড়কথা শ্রেণীবৈষম্য উৎপাটিত করে সাম্য, মৈত্রী ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এখানেই ইসলামের সৌন্দর্য এবং অন্যনতা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ইসলাম মানেই যাবতীয় অশান্তি, গোলযোগ। রসুলে করিমের প্রদর্শিত পথ থেকে আমরা সরে এসেছি যোজন পথ দূরে। এরই সাম্প্রতিক উদাহরণ তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-ইরাক দুই মুসলিম দেশে দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শেষ হতে-না-হতেই পার্শ্ববর্তী দেশ কুয়েতের ওপর ইরাকের নির্লজ্জ ও দাম্ভিক হামলা। এখন দেখা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়েই যত সব টানাহেচড়া। তাঁর বিদেহী পুণ্যাত্মা হয়তো তাঁর স্বদেশীদের এই আদেখলাপনা দেখে নিশ্চয় বেদনাহত এবং রুদ্ধবাক। শেখ মুজিবের সবটাই নাকি ভুল। স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন সেটা ভুল। আজীবন আপোসহীন সংগ্রাম করে গেছেন, জীবনের বেশিরভাগই কয়েদখানায় কাটিয়েছেন, স্বাধীনতারর স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁর বিশাল বুক চিতিয়ে সমস্তরকম প্রতিরোধ, গণসংগ্রামের আগে এগিয়ে গেছেন অকুতোভয়ে। এর সবই ভুল। বেবাক ভুল করে গেছেন। নরপিশাচ পাকিস্তানি বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। দেশের আট কোটি লোক তাঁর ডাকে একাত্ম হয়ে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে

পড়েছিল, ৩০ লাখ লোক আত্মাহুতি দিয়েছিল তাঁর এক কথায়। 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'— এসব নাকি সবই ভুল। ১৯৬৯-এর গণজাগরণ ছিল মিথ্যা। স্বাধীনতার ডাকের, নিলামের ডাকের মতো, এখন অনেক দাবিদার। বঙ্গবন্ধুর নাম করে কেউ বেতারে ঘোষণা দিয়েছিলেন, কেউ পতাকা তুলেছিলেন, কেউ নাকি তারও বহু আগে স্বাধীনতা শব্দটি বানান করতে শিখছিলেন, যিনি বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের জন্য যে-বংশদণ্ডটি সরবরাহ করেছিলেন তিনিও যে স্বাধীনতা সংগ্রামী তাতে সন্দেহ কী আর! হায় রে স্বাধীনতা! মুজিব না থাকলে নাকি বহু আগেই দাসত্বের শৃঙ্খল মোচন করে ফেলতেন ল্যাজগোটানো বীরপুরুষেরা। সত্যি তো তিনি কত বড় ভুল করে গেছেন। পাকিস্তানের দোসরদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করে কয়েক লাখ রাজাকার-আলবদরদের প্রাণভিক্ষা দিয়ে গেছেন। সাধের পাকিস্তান-প্রত্যাগতদের সাদরে বরণ করে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। মীরজাফরের অনুচরদের ক্ষমাঘেন্না করে গেছেন। সুতরাং তাঁর চেয়ে বড় অপরাধী কে?

সবচেয়ে কষ্ট হয় যখন আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাই সোচ্চার হয়ে এসব কথা বলেন। তাঁরা ভুলে যান তাঁদের নিজেদের অবস্থান। মধ্যবিত্তসুলভ বিভ্রান্তির জালে নিজেরা যেমন জড়িয়ে পড়েন তেমনই অন্যদেরও সমান বিভ্রান্ত করতে পারলে তাঁরা মনে করেন তাঁরা একটা সাফল্য অর্জন করেছেন। শেখ মুজিবকে নিয়েও এই বিভ্রান্তিসৃষ্টির নিরুন্তর প্রয়াস কিন্তু কম হচ্ছে না মুজিবেরই সৃষ্ট বাংলাদেশে। এ-প্রবণতা হয়তো দিনে দিনে বাঙালির জাতীয় চরিত্রই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুযোগ পেলেই যে-কারুর চরিত্রহনন একটা আত্মঘাতী নেশার মতো পেয়ে বসেছে অনেককে।

অবশ্য এখানে একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার এই যে, এইসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ভাষা কিংবা রচনাশৈলী এতই মননশীল, প্রাঞ্জল ও বায়বীয় আর জটিল যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের কোনো কথাই সাধারণ মানুষ বুদ্ধিতে কিছু বুঝতে পারে না। বোধগম্য হয় না।

আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখছি না-বুঝে মুজিব-বিরোধিতা একটা চলতি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা কাদের ঔরসজাত বলা মুশকিল। মহা মুশকিল। তাদের জন্য বলি, মুজিব অন্তত আত্মমর্যাদার রুদ্ধ অর্গলটা তো খুলে দিয়ে গেছেন, যার বদলে সত্য কথা বলতে গেলে আমরা তার প্রতিদানে কতটুকু কী করতে পেরেছি। সমগ্র দেশে নাহয় ছেড়েই দিলাম, রাজধানী ঢাকা শহরেই কি আমরা তাঁর একটি ভাস্কর্য স্থাপন করতে পেরেছি? সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের যে-মঞ্চে দাঁড়িয়ে ১৯৭১-এর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রোমাঞ্চ-জাগা অবিস্মরণীয় স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন সেখানে আমরা কি অনায়াসেই একটি কুতুব মিনারের চেয়েও উঁচু বিজয়সৌধ গড়ে তুলতে পারতাম না? বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আজ এতগুলো বছর কেটে গেছে আমরা কি জাতির পিতা ও স্থপতির একটা প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরেছি? এরকম অসংখ্য প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু এসবের উত্তর দেবার দায়ভাগী গোটা

দেশবাসীর সঙ্গে আমি নিজেকেও একজন বলে মনে করি। দিবানিশি এসব প্রশ্ন আমাকে কুরে কুরে খায়। নিরুত্তরে নিজের গ্লানিতে নিজেই লজ্জিত হই। প্রশ্ন উঠতে পারে আমাদের সেই অসম সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধারা কই? সবাই যেন নিজ নিজ খোলসের মধ্যে গুটিয়ে বসে রয়েছেন। সবাই কি বিবরবাসী হয়ে গেছে? কিন্তু না, বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস বলে, আগের যুগে যা-ই ঘটুকু না কেন, তেজস্বী ও বীর্যশালী বাঙালি জনগোষ্ঠী একবার ফুঁসে উঠলেই আর কারুর নিস্তার নেই।

হতে পারে স্বাধীনতার দশ বছর পেরুতে-না-পেরুতেই আমরা এক দখলদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত হয়ে আর এক নব্য দখলদার বাহিনীর হাতে পড়েছি। হয়তো তারা নিজেদের মনে করছে দারুণ প্রতিপত্তিশালী কেউ একটা বনে গেছেন, কিন্তু ইতিহাসে দেখা গেছে এরা পরবর্তীকালে টীকা-টিপ্পনিতেও স্থান পায় না। এ-ব্যাপারে জাতির ইতিহাস বড়ই সুস্পষ্ট আর নির্মম। জাতির পিতাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার অধিকার এদের কেউ দেয়নি। জাগ্রত জনতার রোষে একদিন এরা খড়কুটোর মতো ভেসে যাবেই, যেতে বাধ্য।

আর তখনও সোনার অক্ষরে জ্বলজ্বল করতে থাকবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। এটাই সত্য আর অনিবার্য। ইতিহাসও তা-ই বলে। জয় বঙ্গবন্ধু। জয় বাংলা।

হৃদয়টা ছিল তাঁর আকাশের মতো

ওয়াহিদুল হক

এক.

চার বীর নবযুবা সঙ্গীসহ যুদ্ধে গিয়েছিলাম, দোসরা এপ্রিল, একাত্তরে। ওরা বয়সাধিক্যের কারণে আমাকে রাইফেল দিল না। আমাকে আরম্ভ করতে হলো নিজের লড়াই, যার আরম্ভ হয়েছিল আটচল্লিশেই আমার স্কুলের অন্তিম সময়ে, সরাসরি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, হাতের কাছের এবং মনের ভিতরে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। বীর সঙ্গী হাসান ইমামও ঠিক করলেন, তিনি তাঁর সতীর্থ চলচ্চিত্র শিল্পীকুশলীদের সঙ্গে মিলেই যুদ্ধপ্রায়াসে থাকবেন, যেমনটা ছিলেন জহির রায়হান। যে কিনা, আমার চোখে মুজিব-তাজউদ্দিনের পরই ছিল শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্রাকেটবদ্ধ হয়ে।

শেষ হলো যুদ্ধ। আমাদের গানের দল, মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা, গোটাবার দিনে দীপেন কাঁদলেন সভায়। আনন্দে নয় আশঙ্কায়। সকল মুক্তিযোদ্ধার মা'টি হয়ে। যান আপনারা দেশে, বিজয় করা স্বাধীন দেশে। কিন্তু মনে রাখবেন, দেশবাসী দশ মাস সহিংস নিরাপত্তাহীনতায় বাস করায়, প্রতিদিন দশ হাজার খুনের মধ্যে থাকায় তাদের চিত্তে দারুণ জখম হয়েছে, ব্রুটলাইজড হয়েছেন তাঁরা। এ নিরাময় না হলে, বাঙালি যে নিজের মাংস নিজে খাবে, স্বাধীন দেশে। পরে দেখা গেল যে তার তো চিকিৎসা হয় নি মমতা-ভালোবাসা দিয়ে, উলটে পাকিস্তানের রেখে যাওয়া এবং অনুপ্রবিষ্ট চরেরা রাষ্ট্রীয় মঙ্গল-প্রভাতটিতেই হনন করল আমাদের স্বাধীনতার নির্মাতাকে। তাঁর মমতাটি ভুল জায়গায় গিয়ে পড়েছিল, নরহত্যায় উদ্যত হবু-ঘাতকদের শিরোপাপের। এ থাক, পরের কথা আগে কেন আসে।

কলকাতার জীবনে নয় মাস একবেলা খেয়ে, ওজন দাঁড়িয়েছিল আটত্রিশ কেজি। কোথাও বসলেই ঘুমিয়ে পড়ি। দারুণ অর্থাভাব, তাই। ষোলোই ডিসেম্বর এসে চলে গেল, দেশে ফেরার সঙ্গতি নেই। জানুয়ারিতে প্রশ্ন পেলাম ছোটলু (আলী যাকের), বেণু (মাহমুদুর রহমান) ও তাদের ভাইবোন মিলে ভাড়া-করা বাসে ঢাকা আসবে, আমি কি ওদের সহযাত্রী হব? কূল মিলেছে, আমি তো আর নাই।

বাস কামারখালি নদীপড়ে পৌঁছাতে বিকাল হয়ে গেল। দুপুরের খাবার খেতে বসে খেয়াল হলো আজ দশই জানুয়ারি (১৯৭২)। সারাবেলা তার রেডিও তাক

করে রেখেই ছিল। ভেসে এল তার থেকে প্রত্যাদেশ— প্রায় সেই মুক্তিদাতা মহাপুরুষের কণ্ঠ। আমি প্রতি দেশবাসীর মুখে হাসি ফোটাব। তাঁকে আমরা মারলাম, যেমন করে মেরেছিল রবীন্দ্রনাথের অমর কাব্য শিশুতীর্থের যাত্রীদল তাদের পথ-প্রদর্শক নেতাকে। তাঁর মৃত্যু হলো রক্তস্নানে, তাঁর স্বপ্ন রয়ে গেল জীবন্ত গোলাপটির, প্রতিটি শুভমনস্ক দেশপ্রেমিক হৃদয়ে। কথা তো বেশি নয়, বড় নয়, বেঁকাচোরা জটিলও নয়। দেশবাসী সকলের মুখে হাসি ফুটাতে হবে।

দীপালির (লেখকের নাতনি) মুখে হাসি নেই। আমারও নেই, পকেট মরুসাগর। দীপালি খালিহাতে বাজারে যাবে? মুদি বাকি দেয়, কাঁচা বাজারে কেউ বাকি চায়ও না। দীপালি উপায় বার করতে ওস্তাদ। কোথায় একটা গরিবদের বাজার কাছে, কোন কলনির ফাঁকায়। মাছ-মাংস মেলে না, ওঠে প্রচুর আনাজ-তরকারি, শাকসবজি। গরিবরাই আনে, গরিবরাই বেচে, গরিবরাই কেনে। দাম কম, মাঝখানে মধ্যবর্তী ফড়িয়া কম বলে। মাংস খাওয়া ছেড়েছি, বয়স হয়েছে খাওয়া খারাপ বলে। মাছ আরো দাম, তার বেলায় দোহাই দিই—ও ধনীরা খায়। কম খাই বলে। মাছ আরো দাম, তার বেলায় দোহাই দিই–ও ধনীরা খায়। কম খাই চাল মাগ্‌গি। ওজন চব্বিশ থেকে চুয়াত্তরে ছিল বাষট্টি কেজি। এখন পঁচাত্তরে নেমেই গেল ছাপ্পান্নয়। থাকি নিম্নবিত্ত পাড়ায়, বস্তিসংলগ্ন। বাড়ি-ভাড়া সব নিয়ে-টিয়ে চার হাজার, বাড়ির মালিকের সমুদ্রের মতো হৃদয়— রাস্তার কুকুর পালেন জোড়া দুই সন্তানস্নেহে, আমাকেও তাই। এসব হাঁড়ির খবর জানলে ঘুচে যাবে ক্যাসেটের মোড়ক উন্মোচন করতে আমার ডাক। ওখানে সকলে গাড়ি করে আসে, শৌফার-চালিত। আমারও ছিল, পঁচাত্তরে সিপাহি-জনতা বিপ্লবে, ওটাকে পাপজ্ঞানে বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলাম—আমার স্বল্প পুণ্যের কাজের একটি। এখন আমরা দুটি প্রাণী, আমি করাঘাত করছি আশির দরজা, দীপালি আমার এক-চতুর্থাংশ সময় কাটাচ্ছে ধরাধামে। আর সকালে আসে সবুজের মা, কাজে সাহায্য করবার জন্যে। কিন্তু খায় না। আমাদের চলে না, তাই হাসি নেই নিজের থেকে। কেউ এলে হাসতেও হয়, ভয়ও লাগে। হাসিনার আমলে ভালো ছিলাম, সাহিত্য করে বলি, 'ছিলাম' সুবর্ণ সময়ে। শেখ তো সময় পেলেন না, তাঁর আত্মজা দেশকে কবিগুরুর সোনার বাংলা করেই ছাড়বেন মনে হয়েছিল। বাপের কথা নির্ঘাত রাখবে—হাসি ফুটবে সকলের মুখে। তার আগাম হিসেবে দেশে জানমালের নিরাপত্তা হয়েছিল খুব। রেকর্ডটা খারাপ করাবার জন্যে বোমারু জঙ্গি মৌলবিরা ছায়ানটে, ময়মনসিংহের সিনেমা হলে—এবং সম্ভবত নাখোশ নারাজ চোরাচালানকারীরা, সম্ভবত বাক্যনবাব তরিকুলের নেতৃত্বে, উদীচী সম্মেলনে ডজন ডজন মানুষ খুন করে। এবং শেষাবধি পরাজিত পাকিস্তানিরা জিয়া ও খালেদার এবং প্রতিভার বরপুত্র ২০০১-এর নির্বাচনটাকে খুন করে, তারাও মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়ে যায়। নির্বাচনোত্তর বছরে কেবল হিন্দুদের মারে (আওয়ামী ভোটব্যাংক বলে), তারপর যে-কেউ সত্যের ন্যায়ের কথা বলে এবং ক্যাডার-ধার্য খাজনা কিংবা

মেয়ে কিংবা দোকান বাড়িঘর জমিজমা দিতে আপত্তি করে, তাদের সমানে মারতে থাকে। এক সময়ে তারা বিগড়ে যাওয়া স্বীয় ক্যাডার মারতে আরম্ভ করে। ক্লীন হার্ট আরো কত কী পবিত্র কথার আড়ালে। তারপর তারা ক্রমে ক্রসফায়ারের গাঁজা আবিষ্কার করে, কৃতিত্ব সম্ভবত খাড়াচুলো ডক্টর জনসন বাবর মিয়ার। এমনতে সুদর্শন এবং কিঞ্চিৎ নাজুকে তারেককে দেখলেই আবার নারায়ণগঞ্জের ডেভিডের কথা মনে পড়ে। তাকে র‍্যাব হাউন্ডিং করে মেরেছিল, একের বিরুদ্ধে বুঝি এক প্লাটুন। এবং জীবনে এক যুদ্ধের ছবি দেখেছি, এত খুনের ছবি দেখেছি, ডেভিডের লাশের মতো অপমানিত লাশ কোথাও দেখিনি। নাদুস-নুদুস শরীরটায় বাঘের মতো বড় একটা মুখ। উপুড় হয়ে শুয়ে। উপুড় হলে মাথাটা কোনো এক কাতে তাকে। লাশটার মাথা সযত্নে এমন রেখেছে যে, নাকমুখথুঁতনি সবটা মাটিতে পড়ে ধেবড়ে আছে, যেন মরেও সিজদা দিচ্ছে, ঐ মৃতদেহ লাঞ্ছনার ছবি তুললো কাগজের লোকেরা। ছাপল পরদিন। সারা জীবন কত নিষ্ঠুরতা, কত অপমান দেখেছি, এমন আর দেখিনি। ছেলেটা (ডেভিড) মাত্র একদিন আগে তারেককে নারায়ণগঞ্জে সংবর্ধনা দিয়েছিল। নাকের বদলে নরুন পেলাম আমরা। মুজিব গিয়ে কি তারেক এলো, মায়ের ছেরে, বাপের ছেলে।

দুই.

বাঙালিকে পাকিস্তানের পায়ের তলায় রেখেছিল বাঙালিরই ভিতর মুসলমান-মুসলমান ভাই-ভাইস্বরূপ অজ্ঞতা। কখনো তাকে কেউ বলেনি ভারতে পাকিস্তানের সমান মুসলমান বাস করে তারা আমরা ভাই।

ইন্দানেশিয়ায়, বালি দ্বীপ ছাড়া, সর্বত্র মুসলমানদের বাস, প্রায় পনেরো কোটি— পাকিস্তানের দ্বিগুণ। এবং পাকিস্তানের মতো দূরও নয় তা। তারা ভাই হয় না কেন? তারা শাসন করতে আসে না কেন? মালয়েশিয়া মুসলমান এবং আরো কাছে। পাকিস্তানিরা কেবলই ছড়ি-ঘোরানোর ভাই এবং এর সঙ্গে আরো শত ধাপ্পা, মিথ্যা, অজ্ঞতা বাঙালি মুসলমানকে পাকিস্তানের খাটের পায়ে বেঁধে রেখেছিল। বাঙালির পায়ে আরো বড় রজ্জুটি ছিল হিন্দু (মানেই শত্রু) জ্ঞানে ভারতবিদ্বেষ।

পাকিস্তানকে অখণ্ড অক্ষত রাখবার পক্ষে এত যে কথা, তা সব মিলিয়েও রাষ্ট্রশক্তির (অর্থাৎ সশস্ত্র সামরিক-বাহিনীর) চূড়ান্ততার কখনোই সমকক্ষ হতে পারত না। তবু পাকিস্তান হলো 'কাপুট', কেন? বাঙালি জেগেছিল কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত এক হয়ে—এবং উত্তীর্ণ মনুষ্যত্বের দুর্গম তীর্থে। এবং তার এই জাগরণের সূচনা হতে থাকে উনিশশো আটচল্লিশে জিন্নাহকে 'নো' করায়, উঠে দাঁড়িয়েছে স্বাধীন দুই পায়ে, ঘুমের সমস্ত জড়িমা ছাড়িয়ে, মুজিবের ছয়-দফায়। হ্যাঁ, মুজিবই হচ্ছে সেই আশ্চর্য নাম যাতে কেন্দ্রিত হয়েছিল সব বাঙালির যত জাগরণ...যত প্রতিরোধ। এবং এই জাগ্রত প্রতিরোধকে, জাতীয় ঐক্যে পরিণত করবার মানুষটি ছিলেন সেই মুজিব। মুজিবের উত্থানের ব্যাখ্যা কঠিন এবং অবিশ্বাস্য। কলকাতায়

ছাত্রকালে শামসুল হুদা, শাহ আজিজ, নূরুদ্দিন, সাদেকুর রহমানের একই পাকিস্তানি নিশান বরদার নিখিল ভারত ছাত্রলীগ ছিল। তারপর?

সোহরাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে হেরে গিয়ে এলেন না এদেশে, ভারতের মুসলমানদের (ও গান্ধীজির) সেবা করবার জন্য রয়ে গেলেন ভারতে। একটা কাউন্টার-মুসলিম লীগ দাঁড়ালে তারপর রাজনীতির আশা জাগায়া হাত-ইশারা পেয়ে তিনি এলেন এপার বাংলায়। মুজিব কি কেবল তারই কারণে প্রতিবাদী রাজনীতি গ্রহণ করলেন? তা হ'লে মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন কেন? সোহরাওয়ার্দী–মুগ্ধতার ব্যাপারটা ছিল মুজিবের অনেক দিন। কিন্তু এটাই তাঁর জীবনের প্রধান নিয়ামক ছিল না। শহীদ সাহেব ও অন্যান্য সব মুসলমান নেতাদের মতো তিনি পদলালসায় রাজনীতি করতেন না। রাজনীতি তিনি করতেন, তাঁর বুদ্ধিতে যতদূর কুলায়। অধিকাংশের (তথা কৃষকের) মঙ্গলের স্বার্থে তাঁর অভ্রান্ত কিবলা ছিল সর্বমানবের, তাঁর আশপাশের সর্বগরিবের কল্যাণ। এবং সেখানে পৌঁছাবার তাঁর অবলম্বন ছিল এই লাঞ্ছিত নিপীড়িতের মতামত। সকলেই জানে তিনি জাতির 'পালস্' কতটাই না পড়তে পারতেন। ওটাই যে তাঁর একটা প্রধান কাজ ছিল জীবনের।

বৈরুতের হোটেল-কক্ষে শহীদ সাহেবের অমর্যাদাকর মৃত্যু হলে, মুজিবের সেই মুগ্ধতার বাধা কাটল এবং তিনি এখন পূর্ণত মানুষের কাতারে। মুজিব বয়সে আমার বড় কিন্তু কেন যেন আমরা, বোধ করি তাজউদ্দিনের আগে, একই সঙ্গে স্বাধীন বাংলার চিন্তা আরম্ভ করি আটচল্লিশেই। সোহরাওয়ার্দী-শরৎ বসু এক অখণ্ড বাংলা নয়, পাকিস্তানি বাংলার পাকিস্তানিত্ব ঘোচাবার স্বপ্নে আমরা আক্রান্ত হই। শহীদ সাহেবের মৃত্যুতে সেই স্বপ্ন একেবারে মূর্তি ধরে সামনে এসে দাঁড়াল। গণঅভ্যুত্থানে দেশ যেন আর তখনই পাকিস্তান মানে না।

কিন্তু নতুন বাধা এসে দাঁড়াল। ১৯৭০ সালে সারা পাকিস্তানের প্রথম ভোটে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। এর ফলে শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেন। প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাঁর বড় দুই কাজ হবে : (১) সিন্ধু, সরহদ, বেলুচিস্তানে স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা এবং (২) বাংলাকে পৃথক করতে পাকিস্তানি রাষ্ট্রশক্তির সশস্ত্র বাধাকে অকার্যকর করা। কিন্তু তিনি জানেন, পাকিস্তানের দখলদারেরা তা কখনোই ঘটতে দেবে না। তাই তো সাতই মার্চের ঘোষণা। তাই তো তাঁর ধরা দেওয়া, তাজউদ্দিনসহ সকলকে সরে যেতে বলে।

এই উন্নত-শির মুক্তিদাতা বীরের শেষ অসামান্য কর্ম—পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো প্রকার নিগোসিয়েশনে না যাওয়া— যার ভয় পেয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। এবং মুজিবের 'মৃত্যু তবু কথা নয়' বীরকর্ম ইন্দিরাচক্ষে মুজিবকে পরিচয়ের প্রথম থেকেই শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলো।

দেশে ফিরলেন বীর। একটা বিপ্লবোত্তর দেশকে তাঁর চেনা-জানা ওয়েস্টমিনিস্টার পদ্ধতির গণতন্ত্রে ঢোকাবার চেষ্টায় প্রথম ভুল হল— পাকিস্তান-

ফেরত আর্মি ও সিভিল অফিসারদের সরকারে নিয়ে নেওয়া এবং এখানকার কোলাবরেটর আমলাদের না ছোঁয়া। সফ্‌দরের মতো লোককে পুনর্নিয়োগ দেওয়া। কিংবা আদৌ একটা আকামের স্ট্যান্ডিং আর্মি পোষা। ভারতীয় আর্মিকে তড়িঘড়ি বিদায় করবার সিদ্ধান্তেরই দুর্ভাগ্যজনক উলটোপিঠ ছিল এগুলি। দ্যাখো আমরা সত্যই কত স্বাধীন। তোমরা পছন্দ না করলেও আমরা ওআইসিতে যাই। ওই দেখানোর ব্যাপারটা দরকার ছিল না। দরকার ছিল না মৌলবাদের প্রতি সদয় হবার সূত্রে তাদের দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা গেলাবার চেষ্টা করবার। তাঁর সাড়ে তিন বছরের সরকার ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বের পুরোটা সময় যে আমি অবুঝের মতো কত কী লিখেছি তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁর সব দৃশ্যত আপসের বিরুদ্ধে। তিনি বেঁচে থাকলে, নেতৃত্বে ফিদেলের মতো স্থায়িত্ব পেলে সে-সবে হয়তো লজ্জার কিছু থাকত না। কয়েকটি মাত্র খুনি, রাজনীতি নয়, তাঁকে তাঁর বংশগুদ্ধ হত্যা করল। আমি সারাজীবনের জন্য ক্ষমার অতীত সমালোচকটি থেকে গেলাম।

কৃষকের সন্তান, আর মুসলিম, আগে এসেছে বাংলার রাজনীতিতে। এ. কে. ফজলুল হক। তিনি কত উপকার করেছেন নিম্নবর্গীয় মানুষের। মুজিবও এলেন সেখান থেকে। দিলেন বাঙালিকে এক সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র। প্রতিষ্ঠা দিলেন আন্তর্জাতিকভাবে। গড়ার কাজে যেটুকু এগিয়েছিলেন, তা ভেঙে আমরা খাচ্ছি,— এই জগতের নিকৃষ্ট কৃতঘ্ন জাতি। মুজিব উন্নতদর্শন সুপুরুষ ছিলেন, অবাঙালিসুলভ, রবীন্দ্রনাথেরই মতো। ঋদ্ধ শালপ্রাংশু। তাঁর রাজনীতিতেও তাই ছিলেন আমৃত্যু। নীতিপরায়ণ, অনেক সময় অবুঝ। বন্ধু কাস্ত্রোর বুঝটা তিনি নেননি।... মূল্য দিতে হল, যেমন দিতে হয়েছিল গান্ধীকে। কিন্তু মূল্য যে দিতে হল তাঁর বাংলাকেও। মানুষটা কেবল দেহে বড় ছিলেন না, হৃদয়টা ছিল তার আকাশের মতো। মুজিবহত্যার বিচার কয়েকটি খুনিকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দিলেই হবে না। ওটা কোন ব্যাপর নয়। বাংলা আবার মুজিব-বাংলার রবীন্দ্র-বাংলার পথ ধরলেই সেই হত্যাকাণ্ডের প্রতিকার হবে।

বাংলার মাটি ধন্য তব আগমনে

আতাউর রহমান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আলাদা করে কিছু লেখার চেষ্টা করি নি; তবে আমার বিভিন্ন লেখায় তাঁর প্রসঙ্গ এসেছে। আমি দেশের একটি দৈনিকে নিয়মিতভাবে সম্পাদকীয় পাতায় কলাম লিখি। সেসব কলামেও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রসঙ্গ এসেছে; না এসে যে উপায় নেই। কারণ তিনি আমাদের জীবনকে কোন না কোনভাবে প্রভাবিত করেছেন। আমি আমাদের জীবন বলতে বাঙালির অকিঞ্চিৎকর জীবনের কথাই বলছি। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আমি বেশ কিছু নিবন্ধকার এবং কলামিষ্টের লেখা পড়েছি। তবে তেমন কোন নিঃসঙ্কোচ বা স্পষ্টবাদী লেখা পড়িনি। অনেক লেখায় চাটুকারিতা, সত্যের অপলাপ ও বিকৃতি লক্ষ্য করেছি কিন্তু দোষে-গুণে মানুষটি প্রায় কখনও বিচার করা হয় নি। বড় মানুষের ভুল-ভ্রান্তি কি থাকে না? তাঁরা প্রজ্ঞা ও মেধা দিয়ে জগৎ ও জীবনকে পরিবর্তন করেন, নব যুগের সূচান করেন। কিন্তু তাঁদেরও ত্রুটি থাকে, তা না হলে উনি মানুষ পদবাচ্য হন না। দোষ-ত্রুটি বা ভুল থাকে না দেবতার বা অপদেবতার।

শেখ মুজিবর রহমান জনগণের মানুষ, তাঁকে তেমনভাবে দেখতেই আমি ভালবাসি। তিনি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, জীবন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বড় হয়ে জনগণের মানুষ হয়েছিলেন, এটাই আমাদের কাছে পরিতৃপ্তি বিষয়। মিলিনিয়াম সংখ্যা 'টাইম' ম্যাগাজিনে মহাত্মা গান্ধীকে গত শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে, কারণ তিনিই বিশ্বামানুষকে হাতে-কলমে শিখিয়েছিলেন যে, সত্যিকার অস্ত্র ছাড়া কেবলমাত্র অহিংসার অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করা যায় এবং সে অহিংস-যুদ্ধের বিজয়ও তিনি ভারতকে স্বাধীন করে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। আমি বলছি না যে, তিনি একাই ভারতকে স্বাধীন করেছিলেন; সেই দীর্ঘ সংগ্রামে ভারতের সকল জাতি ও ধর্মনির্বিশেষে কারো ভূমিকা উপেক্ষায় ছিল না; তবে গান্ধীজি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নিঃসন্দেহে। এই গান্ধীজিকে নিয়ে হাসি-ঠট্টা কম হয় নি। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত কথা ছিল যে, বাপুজীকে গরীব রাখতে ভারতের বেশি অর্থ নষ্ট হয়। উনি ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করতেন। তৃতীয় শ্রেণী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যা খরচ পড়ত তা ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর

একটি টিকেটের দামের চেয়ে ছিল বেশি। তারপরে উনি ধনাঢ্য বিড়লাদের আশ্রয়ে থাকতেন। এসব বক্রোক্তি মহাত্মার মহিমাকে ম্লান করতে পারে নি। এমনকি ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টিন চার্চিলের দেয়া ভারতের "অর্ধনগ্ন ফকীর" এই উপাধিও মহাত্মার মহত্বকে নিষ্প্রভ করতে পারে নি। আসলে হীরাতে ছোট-খাট মালিন্যের বিন্দু থাকলেও তা দ্যুতি ছড়ায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন তাই– তিনি তাঁর কর্মময় এবং অবশেষে কর্মক্লান্ত জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাঙালি তথা বিশ্বাস মানবের মানবিক বোধ ও অসাম্প্রদায়িকতার দ্যুতি ছড়িয়েছেন। আমি তাঁর সম্পর্কে গালভরা কোন বিশেষণ ব্যবহার করব না। যা অনেকেই ইতোমধ্যে করেছেন। বাঙালির অনেক গুণ ও ক্ষমতা আছে; কিন্তু অনেক সময় তা অতি কথনে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। শেখ মুজিবর ছিলেন রক্তমাংসে গড়া একজন খাঁটি বাঙালি পিতা ও ভ্রাতা এবং এই গুণই তাঁকে নেতৃত্বের শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি মহাভারতের নায়ক যুধিষ্ঠিরের মত। যুধিষ্ঠির অস্ত্র চালনায় অর্জুন বা ভীমসেনের তুল্য নয়। কিন্তু প্রজ্ঞা ও স্থিতিতে শ্রেষ্ঠ। তিনি ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বড়, তিনি ধর্মপুত্র এবং যুদ্ধে স্থির, তাই তাঁর পরামর্শ চাড়া অপর চার ভাই এক পাও এগোতো না। তিনি গৃহী মানুষ কিন্তু রাজনীতিও ভালভাবে বুঝতেন। তিনি ভুলও করতেন। স্ত্রী দ্রোপদীকে নিয়ে বাজী ধরতেও পিছপা হন নি। তবুও তিনি দোষে-গুণে ভাইদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সব্যসাচী লেখক বুদ্ধদেব বসু তাঁর "মহাভারতের কথায়" তাঁকে সেভাবেই মূল্যায়ন করেছেন। আমি শেখ মুজিবকেও একজন গৃহী রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে দেখি। এই মানুষটির হৃদয় ছিল অতলান্ত মহাসাগরের মত গভীর এবং মন ছিল মহারণ্যের মত উদার। সব ধর্ম, বর্ণ ও বিশ্বাসের মানুষ তাঁর কাছে সমানভাবে স্বীকৃত ছিল। নিজে পরম বিশ্বাসী মুসলমান হয়েও ধর্মে ভেদে মানুষে মানুষে বিভাজন শেখ মুজিবের পছন্দ ছিল না। সব বড় মানুষের মহত্বের লক্ষণ হল তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনা। শেখ মুজিবর রহমান সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক এবং উদার মানুষ ছিলেন। উনি বিশ্বাস করতেন,

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'।

এই চেতনা থেকে উনি মনে প্রাণে একজন সমাজতন্ত্রীও ছিলেন। উনি মানুষে মানুষে আর্থিক তুলাদণ্ডের হিমালয়সম বিভাজন পছন্দন করতেন না। সব মানুষের আর্থিক আয় সমান হতে পারে না, কমিউনিস্ট দেশগুলোতেও তা ছিল না, কিন্তু একটি উন্নয়নশীল দেশে বঙ্গবন্ধু আশা করতেন যে, মানুষে মানুষে যেন আর্থিক সামর্থের দিক থেকে যোজন যোজন মাইল বিভেদ সৃষ্টি না হয়। তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয় নি। তৃতীয় বিশ্বের একটি অতি দরিদ্র দেশ হয়েও আমাদের দেশে মানুষদের হিমালয়সম জীবনযাত্রার তারতম্য ঘটেছে।

বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার একবার দেখা হয়েছিল তাঁর ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের বাড়ীতে। কবি-নাট্যকার জিয়া হায়দার তখন নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের সভাপতি এবং আমি সাধারণ সম্পাদক।

১৯৭০ সাল, পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন তখন তুঙ্গে। শেখ মুজিব তখন বাঙলিদের অবিসংবাদিত নেতা। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর তখন মোনায়েম খান। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলাতে একটি আন্তর্জাতিক লোকজ নাট্য প্রদর্শনীর আসর বসবে। জিয়া হায়দারের মাধ্যমে বাংলাদেশ আমন্ত্রণ পেল। আমি আর জিয়া ভাই বসে ঠিক করলাম একটি যাত্রা দল নিয়ে যাওয়াই সঙ্গত হবে; তবে তার জন্যে ন্যূনতম খরচ হবে ১২ লক্ষ টাকা। স্থানীয় আতিথেয়তা ফিলিপাইনস সরকার প্রদান করবে; কিন্তু ২০-২৫ জন লোকের যাতায়াত ভাড়া নিজেদের বহন করতে হবে। আমরা কোন রকম সাক্ষাতের অনুমতি না নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি চলে গেলাম। জিয়া হায়দারের কথা হল; বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিমান মানুষ, উনি সরকারের আমলাদের বলে দিলে তাঁরা টাকার ব্যবস্থা করে দিবে। সময়টা তখন বিকেল। আমরা তাঁর ড্রইং রুমে গিয়ে বসলাম। জিয়া হায়দারের সাথে বঙ্গবন্ধুর ভাল পরিচয় ছিল, তবে আমাকে উনি চিনতে না। পাশের ঘরে আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদসহ তরুণ নেতাদের কয়েকজন আলাপ-আলোচনা করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে বঙ্গবন্ধু "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদেরই বসুন্ধরা', গুণ গুণ করে গাইতে গাইতে দোতলার সিড়ি ভেঙ্গে ড্রংই রুমে নেমে এসে আমাদের দেখে একটু হকচকিয়ে গেলেন। পরনে তাঁর সাদা বড় চেকের লুঙ্গি আর হাতাওয়ালা গেঞ্জী। জিয়া ভাইকে আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলেন, জিয়া ভাই সংক্ষেপে বললেন। বঙ্গবন্ধু বললেন,

আমি অতসব বুঝি না, আমার বাংলাদেশের কথা বাইরের মানুষ জানবে তো? জিয়া ভাই উত্তর দিয়েছিলেন, 'যাত্রা' শিল্প তো আমাদের নিজেদেরই সম্পদ। তোফায়েল আহমেদকে উনি পাশের ঘর থেকে ডেকে পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন গভর্ণর মোনায়েম খানের একান্ত সচিবকে টেলিফোনে সংযোগ লাগাতে। একান্ত সচিবের নামটা প্রকাশ করতে চাই না। বঙ্গবন্ধুর নাম শুনে সচিব মহোদয় বঙ্গবন্ধুর সাথে সংক্ষিপ্ত কথা সারলেন; আমরা বুঝলাম টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সরকারী ফান্ড না পেলেও, বিভিন্ন সরকারী-আধা সরকারী এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে টাকাটা তুলে দেবার ব্যবস্থা হবে। আমরা বিস্মিত হয়ে চলে এলাম এই ভেবে যে; সরকার বিরোধী একজন গণনায়কের কথা সরকারের আমলারা কিভাবে শোনেন! যাহোক, টাকাটা জোগাড় হয়েছিল কিন্তু সেই নাট্যোৎসবে আমাদের যাওয়া হয় নি, কারণ ফিলিপাইনসের অভ্যন্তরীণ কারণে উৎসবটা ভেস্তে গিয়েছিল। ব্যক্তিত্বের দিক থেকে বঙ্গবন্ধু ছিলেন একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাঁকে মুখের উপরে "না"

বলা পক্ষ বা বিপক্ষ দল কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। আমি ভুলতে পারি না, ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে আমাদের মঞ্চ নাটকের উপর প্রমোদ কর রহিত হয়েছিল এবং শতাব্দীর পুরোনো কালাকানুন, 'নাটকের সেন্সরশিপ' আইন সিভিল ও পুলিশ প্রশাসনের হাত থেকে তিনি তুলে নিয়ে বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমীকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন এবং আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সহজতর করে দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর একটি অসাধারণ সাক্ষাৎকারের কথা আজও আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে। বঙ্গবন্ধু যখন স্বাধীন বাংলাদেশে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন তখন জগৎ বিখ্যাত টেলিভিশান ব্যক্তিত্ব ডেভিড ফ্রষ্ট তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। আমি সাক্ষাৎকারটি একাধিকবার দেখেছি। অনেককে বঙ্গবন্ধুর এই সাক্ষাৎকার নিয়ে বক্রোক্তি করতে শুনেছি। বিশেষ করে তাঁর ইংরেজী বলার ঢং ও শব্দচয়ন নিয়ে। আমি ওসব দেখেনি, আমি দেখেছি মানুষটির সাহসী ও সৎ উত্তর এবং ডেভিড ফ্রষ্টকে সাক্ষাৎকার দিতে বাঘা বাঘা রাষ্ট্রনায়কেরাও ভয় পেতেন। ডেভিড ফ্রষ্ট বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই ঊষ্ণ হৃদয় রাষ্ট্রনায়কের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। প্রশংসা করেছিলেন তাঁর বিরাট হৃদয়ের।

বঙ্গবন্ধু তরুণ বয়সে পাকিস্তানের মন্ত্রী সভার সদস্য ছিলেন। পাকিস্তানের সর্বশক্তিমান একনায়ক আইয়ুব খানের সামনের পায়ের উপর পা তুলে তাঁর প্রিয় এ্যারেনমুর তামাক পুরে পাইপ টেনে কথা বলতে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। তাঁর সম্বন্ধে দু'তিনটি বিষয় উত্থাপন করলে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। একটি দেশেল একটি কার্যকরী ও চলমান সরকার শুধু একটি মানুষের অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে এমনভাবে অচল হয়ে যেতে ইতিহাসের কোন লগ্নে কখনও দেখা যায় নি। মহাত্মা গান্ধীও বোধহয় এতটা পারেন নি। মহাত্মা গান্ধীর পথ অনুসরণ করে মার্চ ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। পথের ফেরিওয়ালা থেকে ছাত্র, শিক্ষক, আমলাসহ দেশের সব স্তরের ও পেশার মানুষ বঙ্গবন্ধুর পেছনে সেদিন বিনাপ্রশ্নে একজোট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সব কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গিয়েছিল ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ি। ঐ বাড়ির কর্তার নির্দেশ অনুযায়ী দেশ চলত। তারপর পাকিস্তানিরা না পেরে ওঠে হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠল, আমাদের উপর নেমে এল ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর প্রলয়ঙ্করী রাত। আসলে সংসদ-গণতন্ত্র মানলে বঙ্গবন্ধুরই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল। এই ৩৫ বছরের পাকিস্তানসহ উপমহাদেশের উত্থাণ-পতনও, উচ্ছৃঙ্খলা দেখে মনে হচ্ছে সেটা না হয়ে ভালই হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেয়েছি, সেটা কম বড় কথা নয়। দেশটি হয়ত একদিন শক্ত পায়ে দাঁড়িয়েও যাবে। সেই সময় টাইম ম্যাগাজিনের

প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল যে, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্ণো দেশের জনগণের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁকে বাঙ্ককার্ণো (ভাই কার্ণো) বলা হত এবং তাঁর গোছল করা পরিত্যক্ত জল খেয়ে নাকি মানুষ দৈহিক উপকার পেত। সোয়েকার্ণোর প্রসঙ্গ টেনে 'টাইম' ম্যাগাজিনের প্রতিবেদক লিখেছিল–শেখ মুজিবুর রহমানের কথা তার দেশবাসীর কাছে গসপলের মত (বাইবেলে বর্ণিত যীশু নবীর বাণীর মত)। তাঁর জনপ্রিয়তা সোয়েকার্ণের জনপ্রিয়তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

শেখ মুজিবর রহমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। আমার কবিগুরু বলে কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ টানতেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও কবিতার বেশ কিছু তাঁর মুখস্থ ছিল। পাকিস্তানের জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও ভারত হয়ে যেদিন উনি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশে পা রাখলেন সেদিনের জন-সমাগম ছিল দেখার মত। তাঁকে এক নজর দেখার জন্যে সেদিন মানুষের মধ্যে যে আকুতি দেখেছি। তার ছবি আমার হৃদয়ে চিরদিনের জন্যে আঁকা হয়ে গেছে। আমাদের বঙ্গবন্ধু নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ৯ মাস পরে দেশে ফিরে এলেন; কিন্তু সে আগের টগবগে মুজিব নয়, কিছুটা রোগা ও ক্লান্ত; তবুও তেজগাঁ বিমান বন্দরে নেমেই আবৃত্তি শুরু করলেন এই বলে যে; আমার কবিগুরু বলেছেন...

"নমোনমো নম, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাট, গগন ললাট চুমে তব পদধুলি–
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।"

তাঁর প্রশ্নাতীত রবীন্দ্রপ্রীতির জন্যে 'ন' হণ্যেতে'র ও 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথে'র লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর আজীবনের সংগ্রহীত বিভিন্ন রবীন্দ্রস্মৃতি স্মারক বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন সংরক্ষণের জন্যে।

বঙ্গবন্ধু বাংলাকে আর বাংলার মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তাঁর সমগ্র সত্ত্বা জুড়ে ছিল দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা। মৃত্যুর গহ্বর থেকে ফিরে দেশেল উপর পা দিয়ে তিনি তাঁর জননী জন্মভূমিকে ফিরে পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি ছিল অত্যন্ত প্রখর। একবার তাঁর সাথে কারো দেখা হলে তার নাম এবং পারিবারিক ইতিহাস তাঁর জানা হয়ে যেতে বরাবরের জন্যে। দশ বছর পরে সেই ব্যক্তিটির সাথে দেখা হলে তিনি হুবহু তার নামও বাবার নাম বলে দিতে পারতেন। এইভাবে তিনি কয়েক হাজার মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। তাঁর মেমোরি স্পেস আজকের কম্পিউটার মেমোরির স্পেসের চেয়ে বড় ছিল। দেশকে ভালোবেসে, দেশের মানুষকে ভালোবেসে তিনি বহুবার পাকিস্তানি প্রশাসনের রক্তচক্ষুর শিকার হয়েছিলেন। অনেক বছর তাঁর জেলে কেটেছে। আগরতলা মিথ্যা মামলায় তাঁকে জড়িয়ে তাঁর জীবনকে জর্জরিত করার প্রয়াস

পেয়েছিল পাকিস্তানি প্রশাসন। কিন্তু বার বার প্রশাসনকে হার মানতে হয়েছিল তাঁর চারিত্রিক ঋজুতা ও কষ্টভোগ করার অবিশ্বাস্য ক্ষমতার কাছে। এই ক্ষেত্রে তাঁকে শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তীসম নেতা ন্যালসন মেন্ডেলার সাথে তুলনা করা চলে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চোখজোড়া ছিল দেখার মতো আয়ত। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ছিল দেশের মানুষের জন্যে অপার ভালোবাসা। মায়াভরা দু'টো চোখ, দৈহিক সৌষ্ঠব ও উচ্চতা নিয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সত্যিকার সুপুরুষ। তাকে দেখে আমাদের বরিশালের মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজতে যাই না আর"।

বাঙালি জাতি আর বঙ্গবন্ধু আলাদা কোন সত্ত্বা ছিলনা; পরস্পর ছিল পরিপূরক। দেশের মানুষকে চোখ বন্ধ করে উনি বিশ্বাস করতেন আর সেটাই তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। বিভিন্ন উৎস থেকে একাধিক বিপদ সঙ্কেত পাওয়া সত্ত্বেও তিনি সতর্ক হন নি, শুধু একই কথা বারবার বলেছেন; আমাকে কে মারবে? তাঁর নিশ্চিত ধারণা ছিল; তাঁর দেশের মানুষ উর্দিপরা হোক বা উর্দিহীন হোক তাঁকে হত্যার জন্যে কখনও অস্ত্র হাতে তুলে নেবে না। তাঁর ধারণা নিষ্ঠুরভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের উপর একটি মূল্যবান লেখা লিপিবদ্ধ হয়েছে "অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়" নামে সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাসেমের প্রবন্ধ সংকলনে। নাজমুদ্দিন হাসেম বঙ্গবন্ধুর উপর লেখা নিবন্ধনটির নাম দিয়েছেন "শেখের সমসাময়িক"। এই নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও কুটনেতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। হেনরী কিসিঞ্জারের সাথে তখনকার বাণিজ্যমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাকের অশুভ আঁতাতের চিত্র পাওয়া যায় এই লেখনীতে যা পরিশেষে বঙ্গবন্ধুর হত্যা-ষড়যন্ত্রে পর্যবসিত হয়। এই নিবন্ধের কয়েকটি লাইনের উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

"পৌঁছে দেখি গণভবনে দুর্লভ জনশূন্যতা। ভেতরের আঙিনায় রাষ্ট্রপতি পদচারণা করছিলেন ডাক্তারের উপদেশ মতো, থমকে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আকাশপানে চেয়ে আছেন। একটু ইতস্তত করে এগিয়ে গিয়ে দেখি পশ্চিমের আকাশে গোধুলির বিষণ্নতায় ডুবে গিয়ে উদাস কণ্ঠে গুণগুণ করছেন–

মন বলে, আমি চলিলাম
রেখে যাই আমার প্রণাম
তাঁদের উদ্দেশ্য যাঁরা জীবনের আলো
ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো"

বড় মানুষের বড় ভুল হয়। বঙ্গবন্ধুর 'বাকশাল' সৃষ্টির পেছনে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক বিবেচনা ছিল, এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নেই। তবে তৎার অবর্তমানে যে প্রজ্ঞাবান ও সৎ মানুষটি দেশের দিশারী ছিলেন, সেই তাজউদ্দিন আহমেদকে দূরে সরিয়ে দেওয়াটা বঙ্গবন্ধুর বড় ভুল ছিল এবং হয়ত তারই জন্যে তাঁকে জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্য দিতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন সত্যিকার অর্থে 'বঙ্গবন্ধু', এমন সার্থক নামকরণ আমি আর দেখি না। আমি শেষ করছি অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতার পংক্তি দিয়ে। যাতে রয়েছে আমার গভীর বিশ্বাস ও প্রত্যয়।

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবর রহমান
দিকে দিকে আজ রক্তগঙ্গা
অশ্রু গঙ্গা বহমন
তবু নাহি ভয় হবে হবে জয়
জয় মুজিবুর রহমান।

A-95783
Northern University * Bangladesh * NUB Library

সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ ভাষণ

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

আজ থেকে সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্বে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত একাত্তরের ৭ মার্চের ভাষণ যোগাযোগ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগের এক বিস্ময়কর ঘটনা। যোগাযোগ বিষয়ে আধুনিক নিয়মকানুনের এক আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটেছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাসিক ভাষণে।

প্রতিমিনিটে গড়ে ৫৮ থেকে ৬০টি শব্দ উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু ১৯ মিনিটে এই কালজয়ী ভাষণটি শেষ করেছিলেন। সম্প্রচার তত্ত্বে প্রতি মিনিটে ৬০ শব্দের উচ্চারণ একটি আদর্শ হিসাব। এক হাজার একশত সাতটি শব্দের এ ভাষণের কোন বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি নেই, কোন বাহুল্য নেই– আছে শুধু সারকথা, সারমর্ম। তবে দু-একটি স্থানে পুনরাবৃত্তি বক্তব্যের অন্তর্লীন তাৎপর্যকে বেগবান করেছে।

ভাষণের সূচনা পর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে- 'There is nothing like a good beginning for a speech'। বক্তব্যের প্রারম্ভে শ্রোতার মানসিক অবস্থান (audience orientation) ও সাম্প্রতিক ঘটনা উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক বলে যোগাযোগ তত্ত্বে যা বলা হয় (refer to audience and refer to recent happenings) তার আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটে বঙ্গবন্ধুর এই যুগান্তকারী ভাষণে।

তিনি শুরু করেছিলেন, "ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।" অত্যন্ত কার্যকর বক্তৃতার অবতরণিকা– যা পুরো বক্তৃতার মূল ভিত্তি তৈরি করেছে ও শ্রোতৃকুলকে অভ্যুদিত বক্তৃতার আভাস দিচ্ছে।

পুরো বক্তৃতার আধেয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে বক্তৃতাটি মুলত পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয় বার্তা ও তার স্বাভাবিক অনুযাত্রায় পাকিস্তানের তদানীন্তন রাষ্ট্রকাঠামোর পরিসমাপ্তির প্রজ্ঞপ্তি ও বিবরণী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ও মূলসূত্র ৭ মার্চের এই বক্তৃতা। মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস এ বক্তৃতা ছিল আমাদের সিংহনাদ বা যুদ্ধ স্লোগান। শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ সকলের গায়ের লোম খাড়া হয়ে যেত এই বক্তৃতা শ্রবণে। বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে উচ্চারিত এই বক্তৃতা সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে শুধু ঐক্যবদ্ধই করে নি, তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। কারণ, এ ভাষণই ছিল কার্যত (de facto) স্বাধীনতার ঘোষণা।

জনযোগাযোগে যেসব speech idiom ব্যবহার করার কথা তা অত্যন্ত সঠিকভাবে সুপ্রযুক্ত হয়েছে এই বক্তৃতায়। বাংলাদেশের জন্মের প্রাক্কালে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতার বাংলার জনগণের সাথে সংলাপ এই বক্তৃতা। প্রাঞ্জল কথোপকথনের ভঙ্গিমায় অতি সহজ সাবলীল ভাষায় তাৎক্ষণিক রচিত এই ভাষণ আমাদের স্বাধীনতার মূল দলিল। শ্রোতাকে আকর্ষণ করার লক্ষ্যে তিনি সংলাপের বাচনশৈলী অনুসরণ করেছিলেন অত্যন্ত সুচারুভাবে। বক্তৃতার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি প্রশ্ন উত্তাপন করেছেন। সরাসরি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন পাঁচটি। "কি অন্যায় করেছিলাম? কি পেলাম আমরা? কিসের আর-টি-সি? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব?" বক্তার সাথে শ্রোতার মেলবন্ধন সৃষ্টিতে 'ask question and then answer' পরামর্শের সুপ্রয়োগ ঘটেছে এ ভাষণে। পুরো ভাষণে বর্তমান কালের যৌক্তিক ব্যবহার বক্তৃতাটিকে সজীবতা দিয়েছে। আবার কথোপকথনের ধারার স্বার্থে তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সুন্দর সংমিশ্রণও ঘটিয়েছেন এই বক্তৃতায়।

বক্তৃতার যেসব অংশে বঙ্গবন্ধুর আদেশ, নির্দেশ বা সতর্কসংকেত দিচ্ছেন সেসব স্থানে বাক্যগুলো স্বাভাবিকভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। বহু গবেষণার পর যোগাযোগ তাত্ত্বিকদের declaratve বাক্য সংক্ষিপ্ত করার বর্তমান নির্দেশিকা বঙ্গবন্ধুর ভাষণে যথাযথ প্রতিফলিত। ভাষণ থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। সরকারি কর্মচারীদের বলি : আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল। কেউ দেবে না।"

রাষ্ট্রনায়কোচিত ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক বক্তৃতার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ কর্মোদ্যোগ, কর্মপরিকল্পনার সাথে শ্রোতাদের শুধু পরিচিত করানোই নয়, বরং তাদেরকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা। বঙ্গবন্ধু কাজটি অত্যন্ত সফলভাবে সাধন করেছিলেন তাঁর এ বক্তৃতার মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর প্রোৎসাহনমুলক বক্তব্য–

"তোমাদের ওপর আমার অনুরোধ রইল : প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের

তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।"

সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এই বক্তব্যকেই হুকুমনামারও অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাদেশ বলে সেদিন গ্রহণ করেছিল। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্গবন্ধু চরিত্রের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণের সময়ও তাঁর মানবিক উদারতার কোন হেরফের কখনও যে ঘটে নি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ৭ মার্চের ভাষণ। রাষ্ট্রের জন্মমৃত্যুর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়েও তিনি "আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব" বলার সাথে সাথেই আবার আশশ্বাসবাণী উচ্চারণ করেন– "তোমরা আমার ভাই– তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপরে গুলি চালাবার চেষ্টা কর না।" কঠিনের সাথে কোমলের এমন সহাবস্থান বঙ্গবন্ধুর মাঝে সর্বদাই বিদ্যামান ছিল।

যথাযথ তথ্যচয়নের ফলে বক্তৃতাটি অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ হয়েছে, আর তীক্ষ্ণ যুক্তিবিন্যাসের কারণে শ্রোতাদের মাঝে তীব্র প্রণোদনা সঞ্চারে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়– 'যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য– আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী-আর্ত মানুষের মধ্যে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।"

সহজ ভাষায় এ ধরনের জোরালো যুক্তিবাদ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের এক সহজাত বিশেষত্ব। বক্তব্যের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য বক্তৃতার মাঝামাঝি এসে সূচনা বক্তব্যের সম্প্রসারণ বা পুনরাবৃত্তির কথা বলা হয় আজকাল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে আশ্চর্যরকমভাবে এ দিকটিও প্রতিভাসিত। যখন তিনি বক্তৃতার মাঝামাঝি এসে বলেন, "তাকে আমি বলেছিলাম– জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপরে গুলি করা হয়েছে। কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন বিচার করুন।"

অন্যের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে গেলেও বঙ্গবন্ধুর put up the attirbution first-এর নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। বক্তার নাম প্রথম উল্লেখ করে তারপর তার মন্তব্য/বক্তব্য উত্থাপন করেছেন। যেমন– "ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না" কিংবা "ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন। তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম" ইত্যাদি। সার্বজনিন ভাষণের একটি প্রধান দায়িত্ব কর্মসূচির নির্ধারণ (agenda setting function), যা বঙ্গবন্ধুর এই বক্তৃতায় সুস্পষ্টভাবে বারবার। কিন্তু কঠোর কর্মসূচি প্রদান কালেও বঙ্গবন্ধুর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির (humanistic approach) যে

কোন তারতম্য ঘটত না–তার স্বাক্ষর নিম্নোক্ত বক্তব্য: "আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারি, ফৌজদারি, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ঠ না করে, সেজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জর্জকোট , সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো– ওয়াপদা, কোন কিছু চলবে না।"

জনযোগাযোগে ব্যক্তি বা ঘটনার মর্যাদা আরোপন (status conferral-function) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার বিভিন্ন অংশে এই বিধানের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, তিনি বলছেন– "আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছিয়ে দেবেন" কিংবা "আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যতদূর পারি ওদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব।

সর্বজনীন বক্তব্যে ও জনযোগযোগ কার্যকর ফল লাভের জন্য চ্যালেঞ্জ উত্থাপনের (posing a challenge) প্রয়োজনীয়তা সর্বনবিদিত একটি পদ্ধতি। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে এসে যখন বলেন, "প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা রক্ত যখন দিতে শিখেছি, রক্ত আরও দেব– এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইন্‌শাআল্লাহ"– তখন বোঝা যায় যে তিনি যোগাযোগ বিদ্যার শিল্পকূল প্রণালীতে পরম দক্ষতার সাথে কিভাবে শ্রোতাদেরকে বক্তৃতার সাথে গেঁথে ফেলেছেন।

যে কোন বক্তৃতার সংজ্ঞা নির্দারণীয় অংশ সাধারণত শেষেই উচ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে যোগাযোগবিদদের আধুনিক অভিমত। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের শেষ বাক্য "এবারের সংগ্রাম-আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম–স্বাধীনতার সংগ্রাম।" অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ে ব্যক্ত স্বাধীনতার কার্যত ঘোষণা– যা ৭ মার্চের বক্তৃতার সংজ্ঞা হিসাবে স্বীকৃত । যে প্রক্রিয়ায় তিনি ভাষণ শেষ করেছেন তা যোগাযোগবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকের সাথে হুবহু মিলে যায়। যেখানে বলা হয় 'Don't drag out your conclusion'। আমরা প্রায়ই 'পরিশেষে বলছি', 'একটি কথা বলেই শেষ করছি' বা 'পরিশেষে এ কথাটি না বললেই নয়' ইত্যাদি ভূমিকা করে বক্তব্য শেষ করি। কিন্তু এই ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু সরাসরি speech definition-এ প্রবেশ করেছেন– যা আধুনিক তত্ত্বের যথাযথ প্রয়োগ এবং যা ছিল সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্বে অকল্পনীয়।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ১৯৪০ সালের ৪ঠা জুন তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন, "We shall flight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender." এখানে 'We shall fight' ছিল বক্তৃতার সংজ্ঞা।

একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মার্টিন লুথার কিং ১৯৬৩ সালের ২৮ শে আগস্ট যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তার সংজ্ঞা অংশ ছিল 'I have a dream'। উক্ত বক্তৃতার একটি অংশ ছিল নিম্নরূপ : "I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self evident, that all men are created equal. I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be judged by the colour of the skin, but by the content of their character".

আমরা জানি যে, বলিষ্ঠ বক্তব্য সর্বদাই সংক্ষিপ্ত হয়। একাত্তরের ৭ মার্চ তারিখে প্রদত্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তট-অতিক্রমী ভাষণ তেজস্বী বক্তৃতার এক শ্রেষ্ঠ উদহারণ। একটি ভাষণ একটি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে কি দারুণভাবে প্রোৎসাহিত করেছিল– তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা ও স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ কণ্ঠস্বর সংকলিত এ ভাষণের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও সময়োপযোগিতা বিশ্লেষণ গবেষকদের জন্য এক স্বর্ণখনি। এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে যেভাবে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত ও দীক্ষিত করেছিল– তা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছে নতুন এক বক্তৃতা আলেখ্য। সার্বজনিক বক্তৃতা।

বিশারদ, গবেষক ও যোগাযোগবিদদের জন্য এ ঐতিহাসিক ভাষণ একটি আবশ্যিক পাঠক্রম হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে দেশে-বিদেশে। আমাদের প্রাত্যহিক চিন্তা-চেতনা ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিশীলিত ও স্বচ্ছ উপস্থাপনা সার্বজনিক সম্ভাষণ বা (public address) এ অন্যতম শর্ত।

এ প্রসঙ্গে ডেল কার্নেগীর উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, 'The best argument is that which seems merely and explanation' অর্থাৎ সর্বোত্তম মুক্তি হচ্ছে শুধুই সঠিক ব্যাখ্যা। তৎসময়ের ঘটনাবলীর আনুপূর্বিক প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এই ভাষণটিকে সব সময়ের জন্য যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছে।

সাত মার্চের ঐতিহাসিক অভিভাষণ বঙ্গবন্ধুর extempore speech হলেও লক্ষণীয় যে উপস্থিত বক্তৃতার সচরাচর পরিদৃষ্ট লক্ষণ যেমন বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি, শব্দ চয়নে মুহূর্তের দ্বিধাগ্রস্ততা ইত্যাদি ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। বিশাল

জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে কোন টীকা বা নোট ব্যতিরেকে ছেদহীনভাবে এমন নির্মেদ ও নির্দেশনামূলক ও একই সাথে কাব্যময় বক্তৃতা প্রদান একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব বিধায় আন্তর্জাতিক সাময়িকী নিউজউইক তখনই বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' বলে আখ্যায়িত করেছিল একাত্তরের ৫ এপ্রিলে প্রকাশিত তাদের প্রচ্ছদ নিবন্ধে। এই বক্তৃতা আক্ষরিক অর্থেই ছিল একটি বিপ্লব, যার ফলশ্রুতি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা। শব্দের এমন সুপ্রযুক্ত ব্যবহার সত্যিই এক বিস্ময়কর ঘটনা।

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতায় শব্দের ব্যবহার বিশ্লেষণ করলে যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসনের (১৭৭৩-১৮২৬) বিখ্যাত উক্তি "the most valuable of all talents is that of never using two words when one will do" আমাদের স্মারণে আসে। সাত মার্চ একাত্তরের এই ভাষণ বাংলা ভাষায় শুধু শ্রেষ্ঠ ভাষণ নয়, পৃথিবীর এটি একটি অনন্যতম ভাষণ। কারণ এ ভাষণ আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা। সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর 'good On-air personality' বৈশিষ্ট্যের কারণেই বিশাল জনসমাবেশে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এ শ্রেষ্ঠ ভাষণ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

ভস্ম যদি সর্বাঙ্গে আমার

সৈয়দ শামসুল হক

আজ তীব্র আমার বিলাপ।
মুল্যবোধে পড়ে আছে প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে
লাশ হয়ে– কতকাল, কত আমি দেখব এভাবে?
একদিন দেখেছি যে মূল্যবোধে দাঁড়ানো পুরুষ–
আমি একদিন দেখেছি যে
সমুখে পুরুষ সেই বীর সেই পিতা
আজ যদি একবার ফিরে পাই তাঁকে,
একবার যদি দেখি জীবিত সে আবার–আবার–
যদি তাঁর কাছে যেতে পারি,
তবে আমি, তাঁর কাছে দেবো আজ একটি বিচার–
সময়ের-চাবুকের–দেখানো এ দেহে কত কালের প্রহার।
কী তার উত্তর হয়, জেনে নেবার। কিন্তু
তিনি কি আপন তাঁর মহাপরাক্রমে
পতিত এ বাঙালির সঙ্গে ফের কথা বলবেন?
তাকাবেন স্মিত হেসে, স্নেহে সব কথা শুনবেন?

দ্যাখো, আমি অগ্রসর হই, কিন্তু তিনি নাই–নাই
তাকাই পেছনে, দেখি, তিনি আর নাই–
ডান দিকে যাই কিন্তু তাঁকে তো দেখি না–
বাম দিকে–শূন্যতাই হাসে খলখল।
অথচ তাঁরই তো জানা, একমাত্র জানা,
আমিও তো একদিন উত্তোলিত হয়েছি রমনায়।
সিঁড়ি বেয়ে তাঁর সঙ্গে আমিও উঠেছি–
বলেছি, এবার এই সংগ্রাম মুক্তির;
স্বাধীনতা! আমিও বলেছি তাঁরপ্রতিধ্বনি হয়ে।
ধ্বনি হয় প্রতিধ্বনি-প্রতিধ্বনি এভাবে মিলায়?
এভাবে মিলায় যেন গ্রহণের সূর্য ঢেকে যায়–
গাধার চিৎকারে তবে ডুবে যায় সিংহের গর্জন?
তবে আর পৃথিবীতে আশা বা কোথায়?

যারা তাঁকে দেখেছিল, তারা কেন অন্ধ হয়ে যায়?
আলো কেন আঁধারে মিলায়?
যেন ভূমি থেকে আল্-বন্ধনের রেখা মুছে যায়,
গোধন হারায় চাষা, পিতৃহীন ভূমিহীন হয়,
বিধবার বন্ধকের হার ওঠে বণিকের পত্নীর গলায়।
এখন সড়ক থেকে দরিদ্রের অধিকার পথ হাঁটাবার
কেড়ে নিয়ে গেছে দুষ্টকাল।
এখন জঙ্গল থেকে কাঠুরের অধিকার কাঠ কাটবার
কেড়ে নিয়ে গেছে নষ্টকাল।
এখন গ্রামের থেকে রাখালের অধিকার বাঁশি বাজাবার
কেড়ে নিয়ে গেছে স্তব্ধকাল।
সড়কের দুর্জন আজ বীরদর্পে হাঁটে
নিষ্ঠুর কুড়ালে আজ বৃক্ষ ভেঙেপড়ে,
বাঁশির সাতটি ছিদ্রে দানবের অট্টহাসি বাজে।
পশুভক্ষ খাদ্য খায় মানুষেরা আজ
বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ লুকোয়,
উন্মাদ বৃষ্টিতে ভেজে, আশ্রয় মেলে না।
পিতৃহীন শিশুদের কেড়ে নিয়ে মাতৃস্তন থেকে
প্রচণ্ড আছাড়ে তার মাতা ভেঙে ফ্যালে।
লোকেরা ক্রন্দন করে, পড়ে থাকে লাশ মূল্যবোধ'
মুছে যায় স্মৃতি শ্রুতি ইতিহাস পাঠ।
এত যে ক্রন্দন এত শোষণ পেষণ, শাপগ্রস্ত অধিকার
ফসলের ক্ষেতে পঙ্গপাল,
অনাবৃষ্টি, হিম, এক বিরান কুটির,
তবু লাশ থেকে যায় লাশ,
মানুষ নশ্বর বটে, কণ্ঠ তার অবিনশ্বর কি নয়?
কেন তবে কানে আর পশে না সে ব্রজকণ্ঠ আজ–
এত যে আকাশে মেঘ, কেন চিরে ওঠে না বিদ্যুত?

কেন দিগন্তের
একপ্রান্ত থেকে আর প্রান্ত শুধু করে হাহাকার–স্তব্ধতার?
বস্তুত সে হৃদয় আমার, বস্তুত সে বদ্বীপ বাংলার।
আমি উঠব চিৎকার করে?
শুধু আমি? একা আমি? আর কেউ নয়?
হোক তবে তাই। হোক আমার কণ্ঠেই
উচ্চারিত হোক তবে–এবার সংগ্রাম।
কণ্ঠ চিরে রক্তের ধারায় তবে আমারই এ কণ্ঠ
থেকে বেরোক চিৎকার আজ–স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!!

স্বাধীনতা চাই!
দ্যাখো, আমি করছি চিৎকার।
জনকের পুত্র আমি, কবি আমি, কণ্ঠ চিরে করছি চিৎকার।
তবু তুমি দাঁড়াবে না উঠে?
তবু তুমি এই হাতে রাখবে না হাত?
লাশের শরীর ছুঁয়ে আজো তুমি শপথে নীরব?
কিন্তু ছিলে, তুমিও তো ছিলে সেই রৌদ্রজ্বলা মাঠে,
ছিলে তুমি দশ লক্ষ জনসমাবেশে,
তুমিও তো তুলেছিলে হাত,
হাত ছিল তোমারও তো মুষ্ঠিবদ্ধ,
ভুলে গেলে সব?
কেবল দেখছ তুমি শব–এক শব–
আর অন্য কিছু নয়!
যদি তাই হয়, তবে আমি বলছি তোমাকে–
নষ্ট তুমি, আর নষ্ট এই ভাগ্য পায়–
নিজেকে খোয়ায় তারা, দুর্জনেরা অধিকার পায়–
কালের খড়্গে তার পুত্র হত হয়,
পাপের ধর্ষণে তার কন্যা নষ্ট হয়,
মারী নেমে আসে দেশে, মৃতগণ কবর পায় না,
বিধবারা রোদন করে না,
সোনা তার উজ্জ্বলতা মুহূর্তে হারায়,
গৃহ থাম কাটে কীট,
জলরাশি মহারোলে উঠে এসে গ্রাস করে ভূমি,
মরুর উত্তাপ নামে শীতের মাসেও।
কিন্তু আমি আশাহীন নই।
একদিন গলিত পাথর থেকে সোনা বেরুবেই–
মাটি থেকে শস্য ফের উদ্‌গত হবেই–
কুটিরের খড়ে রোদ আবার পড়বেই–
রাখাল বাজাবে বাঁশি, গোধন ফিরবেই,
কেননা যে লাশ সে তো লাশ সে তো নশ্বর বস্তুত–
অবিনাশী জনকের স্বর।

যখন ছিলেন তিনি, প্রহরায় আমি তুমি সবাই ছিলাম–
আবার থাকবো।
যখন ছিলেন তিনি, তাঁর পদতলে প্রবাহিত হতো ক্ষীর–
আবার বহাবো
যখন ছিলেন তিনি, মানুষেরা সসম্মানে দাঁড়িয়ে উঠত–
আবার দাঁড়াবো।

যখন ছিলেন তিনি, গায়কেরা মধুকণ্ঠে যে গান করত–
আবার গাইবো।

আপাতত, এই যে আমাকে দ্যাখো ধুলায় পতিত,
ধুলা ও ভস্মের বস্ত্রে উলঙ্গ যে এই,
তৃণভূমে মরা ঘাস, ভাগাড়ে শকুন,
তুমি এই যে আমাকে দ্যাখো
আজ দৃষ্টিহীন,
বস্তুত আমিই তুমি, এই দৃষ্টি ফিরে আসবেই,
সাত ছিদ্রে সুর ফিরে পাবে বাঁশি, আর
মাংস ফিরে পাবে হাড়,
প্রাণ ফিরে পাবে তারা আমাদের বদ্বীপে আবার।
আবার ধ্বনিত হবে সংগ্রাম এবার–
আবার ধ্বনিত হবে স্বাধীনতা–
প্রতিধ্বনি ছুঁয়ে যাবে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তর।
মহাজল কলরোলে প্রমত্ত ফেনিল।
তেরোশত নদী ফের বহে যাবে আবার বদ্বীপে।
আমার শরীর থেকে পচনের গন্ধ মুছে যাবে–
মারীচিহ্ন মুছে গিয়ে আবার আমার দেহ
আমাদের দেহ ফিরে পাবে ত্বক,
উজ্জ্বলতা পাবে মুখ আবার স্বর্গের
সরোদের স্বর্ণস্বরে ডুবে যাবে সমস্ত বিলাপ।
ভস্ম মেখে এই গান রি আজ–করে যাবো আমি
জাতির শরীর থেকে আবার–আবার–
ভস্ম ধুয়ে উঠে দাঁড়াবার ॥

শেখ মুজিবই বাংলাদেশের ঠিকানা

আবেদ খান

একটি কথা ভাবতে অবাক লাগে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা থেকে অবিশ্বাস্য রকমের সংগ্রাম করে অগ্রসর হতে হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার থেকে শুরু করে পাকিস্তান আমলের প্রতিটি সরকার তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে কেবলমাত্র একটি মানুষকেই চিহ্নিত করেছে। তাঁর নাম শেখ মুজিব। তাই তাঁকে বারংবার কারাগারে যেতে হয়েছে, একটার পর একটা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয়েছে। মুজিব পাকিস্তান ভাঙতে চান এ অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই। সেই তখন থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ভারতের স্বার্থ হাসিল করার জন্য পাকিস্তান দু টুকরো করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

এখানে একটি বিষয় ভাববার মত। সাতচল্লিশেরর দেশবিভাগকে পাকিস্তানের শাসকরা দেখেছে সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে। পাকিস্তান মুসলমানের দেশ এবং মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে পারে না– এই উগ্র সাম্প্রদায়িক ধ্বনি পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠির জন্য অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ছিল। এই ধ্বনি দিয়ে তারা সাধারণভাবে সেই চল্লিশের দশক থেকে এ দেশের বিরাট জনগোষ্ঠিকে ভারতের প্রতি বৈরি করে তুলতে পেরেছিল। কাজেই সাতচল্লিশের অব্যবহিত পরে পাকিস্তানকে অস্বীকার করা কিংবা জিন্নাহ অথবা মুসলিম লীগ সম্পর্কিত সামান্যতম সমালোচনামূলক শব্দ উচ্চারণ করাও ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। সে সময় থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির শেখ মুজিবকে তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করেছিল। তখন সরকারবিরোধী ব্যক্তি বা দলকে ভারতের চর বলে আখ্যায়িত করা হত। ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলাকে এই ভাষাতেই অভিযুক্ত করা হয়েছিল। উনিশ শ' বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন যদি সফল না হত এবং চুয়ান্নর নির্বাচনে যদি মুসলিম লীগের ভরাডুবি না হত, তা'হলে বোধহয় আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হত এবং শেরেবাংলা, ভাসানী বা সোহরাওয়ার্দী এবং অবশ্যই শেখ মুজিব, তাজউদ্দিনের জন্য অপেক্ষা করতো হয় অন্ধ কারাপ্রকোষ্ঠ কিংবা ফাঁসির দড়ি। লক্ষ্য করার ব্যাপার, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির রোষানল থেকে শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী কোনও না কোন সময় রক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু শেখ মুজিবের নিষ্কৃতি ছিল না। পাকিস্তানিরা মুজিবকে নিঃসঙ্গ করার জন্যে আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খানদের

মত রাজনীতিককে আওয়ামী লীগ থেকে বিছিন্ন করেছে, নিষ্ক্রিয় করেছে অনেক একনিষ্ঠ কর্মীকে। কিন্তু এতকিছুর পরে শেখ মুজিব ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয়েছেন। "আগরতলা ষড়যন্ত্র" মামলার মত একটি বিপজ্জনক মামলায় অভিযুক্ত হতে হয়েছে তাঁকে। তারপর মানুষের বিশ্বাস ও ভালবাসায় সিক্ত শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু হয়েছেন। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা কিংবা খল-রাজনীতিকদের সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে তিনি এগিয়ে গেছেন তাঁর স্বপ্নের সিংহদ্বারের দিকে।

শত্রু কিন্তু তাঁকে নিশ্চিহ্ন করার পর পরিহার করেনি কখনও। উনিশ শ' একাত্তরে তারা চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে। বঙ্গবন্ধু বন্দীত্ব বরণ করেছেন, কিন্তু তার আগেই তাঁর স্বাধীনতার ডাক পৌঁছে গেছে বাংলার প্রতিটি ঘরে। যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে বাংলার আবাল- বৃদ্ধ-বনিতা। স্বাধীনতা এসেছে অনেক রক্তের বিনিময়ে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজের দেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন বিজয়ীর বেশে। দেশ স্বাধীন, মানুষ স্বাধীন এবং যে মানুষটি এই স্বাধীনতার স্রষ্টা তাঁর তো হওয়ার কথা প্রতিপক্ষহীন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই জাতির যে বঙ্গবন্ধুর মত মানুষকে তাঁর জীবদ্দশায়ই বার বার অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে। দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষা, সততা এবং নিষ্ঠার অগ্নিপরীক্ষা। নিজের মানুষের কাছে বারবার জবাবদিহি করতে করতে ক্লান্ত এই মানুষটি তবু হাল ছাড়েন নি। কবিগুরুর সেই অমর বাণী "মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ" নিজের হৃদয়ে ধারণ করেই একদিন রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েছেন।

তারপরেও চলে গেছে তিন দশকেরও বেশি সময়। আর এই সময়ের মধ্যে তিনি পরিত্রাণ পাননি। শত্রু তাড়া করছে তাঁর ছায়াকে পর্যন্ত। প্রতি মুহূর্তেই তারা বুঝতে পারছে যে, এই মানুষটির ন্যূনতম চিহ্ন থাকলেও তারা নিশ্চিত হতে পারবে না। কিন্তু দিন যত যাচ্ছে ততই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠছেন। ওদের ভয় যত বাড়ছে, যতই তারা প্রাণপণে চেষ্টা করছে বঙ্গবন্ধুকে বিস্মৃতি অন্ধকারে ডুবিয়ে দিতে, ততই তিনি আরও অপরিহার্যতা নিয়ে, আরও অনিবার্যতা নিয়ে উজ্জ্বলতর হচ্ছেন। বিস্ময়কর ব্যাপারটা এই যে আজীবন যোদ্ধা এই মানুষটি মৃত্যুর পরেও এই এতদিন ধরে যুদ্ধ করে চলেছে, নিজের জন্য নয়– বাংলাদেশেরই জন্য। কারণ শেখ মুজিব ছাড়া বাংলাদেশের তো আর কোনও ঠিকানা নেই।

বঙ্গবন্ধু, শিল্পাচার্য ও কিছু অনুভব

শিল্পী হাশেম খান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তিনবার তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলাম। খুব কাছে থেকে তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। আর যে লোকটির কারণে প্রথমবারের মত বঙ্গবন্ধুর কাছে যেতে পেরেছিলাম তাঁর নাম নূরুল ইসলাম। নূরুল ইসলাম তার কিশোর বয়স থেকে, সেই পঞ্চাশের দশক থেকে, আওয়ামী লীগের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী, বঙ্গবন্ধুর প্রিয়ভাজন, অত্যন্ত কাছের লোক। আওয়ামী লীগের প্রচার কাজের সঙ্গে দীর্ঘদিন তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পোস্টার তৈরি করা, লিফলেট পুস্তিকা ও বিভিন্ন রকম প্রচার কাজ, মুদ্রণ, বিলি ও সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার কাজটি সুচারুরূপে সমাধা করার জন্যে একজন পারদর্শী ও সাহসী ব্যক্তিত্ব এই নূরুল ইসলাম। স্বাধীনতা আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে যে সাড়া জাগানো পোস্টার "সোনারবাংলা শ্মাশান কেন" এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল– তার রূপকার ছিলেন এই নূরুল ইসলাম।

প্রচার কাজে তাঁর নিষ্ঠা ও কর্মোদ্দীপনার কারণে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা অনেকেরই তাঁকে সম্বোধন করতেন "পোস্টার নূরুল ইসলাম" নামে।

১৯৬৬ সালের এক সন্ধ্যায় ~~হন্তদন্ত~~ হয়ে ছুটে এলেন তিনি আমার ঠিকানায়–২৫ গোপীবাগ ৩য় গলির বাড়িতে। বললেন, আওয়ামী লীগের ৬- দফার লোগো, পতাকা, প্রচারপুস্তিকা, প্রচ্ছদ ও পোস্টার ইত্যাদি করতে হবে। মুজিব ভাইয়ের সাথে আলোচনা করে এসেছি। আপনাকেই সব করতে হবে।

নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আমার তখন কোনও পরিচয় ছিল না। তবে ছাত্রলীগের অনেকের সঙ্গেই তৎকালীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কারণে–বিশেষ করে পোস্টার, ফেস্টুন ডিজাইন করা, ছবি আঁকা ইত্যাদির কারণে পরিচয় ছিল, ঘনিষ্ঠতা ছিল। যেমন, শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রব, আবদুর রাজ্জাক, শামসুজ্জামান খান, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, আবদুল আজিজ বাগমার, মাযহারুল ইসলাম বাকী প্রমুখ। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের অসংখ্য পোস্টার এঁকেছি, তৈরি করেছি। পোস্টার আঁকা, পুস্তিকার প্রচ্ছদ কিংবা কোন সভা বা অনুষ্ঠানের মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি কারণে নূরুল ইসলাম যখন-তখন আমাকে কাজে লাগাতেন। হয়তো আন্দোলনের কাজে আমার আগ্রহ দেখে

প্রচার কাজের বিভিন্ন শিল্পকর্মে তিনি আমাকে আস্থাভাজন মনে করতেন। আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগের ফরমায়েশ অনুযায়ী নূরুল ইসলামসহ, তাঁর সঙ্গে মিলেমিশে সেই ষাটের দশকে কত পোষ্টার, ফেস্টুন যে এঁকেছি, ছবি এঁকেছি, প্রচার পুস্তিকার প্রচ্ছদ এঁকেছি আজ তার হিসেব মেলানো কঠিন কাজ।

যা হোক, তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি এবং তার থেকে মুক্তি পাওয়ার সনগ আওয়ামী লীগের ছয়-দফা শিগগিরই ঘোষণা করতেই যাচ্ছে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ছয়-দফা'র লোগো, পতাকার নকশা ইত্যাদি কাজ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আমার মত এক তরুণ শিল্পকর্মীকে এতবড় দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে, আমি খুবই ভাবনায় পড়ি। নূরুল ইসলামকে বলেই ফেলি অনেক বড় বড় ও অভিজ্ঞ শিল্পী আছেন তাঁদের কাউকে দিয়ে কাজটা করালে ভাল হত না?

মুজিব ভাইয়ের সাথে সব কিছু আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত হয়েছে। ছয়-দফার এসব কাজ আপনিই করবেন। নূরুল ইসলামের পরিষ্কার জবাব।

প্রায় সাত-আটদিন অনেক নকশা এঁকে, জল্পনা-কল্পনা করে ছয়-দফার লোগো, পতাকার নকশা, পোস্টার ও অন্যান্য শিল্পকর্ম দাঁড় করলাম। শেখ ফজলুল হক মনি ও নূরুল ইসলাম কাজগুলোসহ আমাকে নিয়ে একেবারে নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মুখোমুখি। তৎকালীন হোটেল ইডেনের সামনের মাঠে সবার ব্যবস্থা করে ছয়-দফা জনসাধারণের সম্মুখে ঘোষণা দেয়া হবে। তার প্রস্তুতি পর্বের কাজের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন হোটেল ইডেনের বারান্দায় আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের সাথে বসে আলাপ করেছেন। শেখ মনি ও নূরুল ইসলাম আমার আঁকা নকশা ও অন্যান্য শিল্পকর্ম তাঁর সামনে তুলে ধরল। এই প্রথম আমি বঙ্গবন্ধুর সামনে (তখন অবশ্য "বঙ্গবন্ধু" উপাধি পাননি) তাই খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমার আঁকা নকশা, পোস্টার ইত্যাদি তাঁর পছন্দ হবে তো! এরপর এখানে উপস্থিত রয়েছেন অন্যান্য নেতা। তাঁরা সবাই কী বলে কে জানি!

বঙ্গবন্ধু পাইপ টানছেন আর নিবিষ্ট মনে একটি একটি করে নকশা দেখছেন। অন্যান্য নেতার সামনে নকশাগুলো ঠেলে দিচ্ছেন আর মৃদু ও গম্ভীর স্বরে বলছেন, হ্যাঁ দেখেন।

আমার বুকে তখন দপ্‌দপ্‌ আওয়াজ। ঘাবড়ে যেয়ে রীতিমত ঘেমে উঠেছি। কী বলেন কে জানে। নকশা ও ছবি যদি পছন্দ না হয়। শেখ মনি বলে উঠলেন, মামা, হাশেম ভাই নকশাগুলোর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা তৈরি করেছেন। হাশেম ভাই, আপনি ব্যাখ্যাগুলো বলুন।

আমি আরো ঘাবড়ে যাই। বঙ্গবন্ধু আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চেহারায় মৃদু হাসি দেখে এবার খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। তিনি খুশি হয়েছেন। বললেন, বেশ ত ব্যাখ্যাগুলো কী একটু শুনি।

সাহস পেয়ে আমি প্রতিটি নকশার অর্থ ও ব্যাখ্যা ধীরে ধীরে বললাম।

ডিজাইনগুলো ভাল হয়েছে না? তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বঙ্গবন্ধু অন্যান্য নেতার উদ্দেশে বললেন, আপনারা কী বলেন, মনোগ্রাম আর বললেন, খুব ভাল হয়েছে। নূরুল ইসলাম এবার যত তাড়াতাড়ি পারো এগুলো ছেপে বের কর। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, যে মঞ্চ থেকে ছয়-দফা ঘোষণা হবে তার "ব্যাকসিনে" এই "সিমবলিক" নকশা দিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে। আর এই "মনোগ্রাম" ও নকশা চয়-দফার সবরকম প্রচারে ব্যবহার করতে হবে।

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর সারল। সমস্ত ভয় কেটে গেল আমার। ছয়-দফা'র লোগো, পুস্তিকা ও পোস্টারের ডিজাইন নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পছন্দ হয়েছে। আমি সেদিন হালকা মেঘের সাথে আকাশে ঘুরে বেড়াবার আনন্দ অনুভব করলাম।

শেখ মুজিবের ইচ্ছে অনুযায়ী ছয়-দফা ঘোষণা-মঞ্চে পোস্টারের নকশা ব্যবহার করা হল। ছয়-দফা উপলক্ষে দৈনিক ইত্তেফাক একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলো এবং ইত্তেফাকের পূর্ণ-পৃষ্ঠার প্রচ্ছদে ব্যবহার হল ঘোষণা- মঞ্চের অঙ্গসজ্জা।

বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার শিক্ষক শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এক সন্ধ্যায় আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, বাংলাদেশের সংবিধান গ্রন্থটি ছেপে বের হচ্ছে। কীভাবে ছাপা হবে, ছবি নকশা কিছু হবে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হবে। বঙ্গবন্ধুর সাথে আগামীকাল সকাল ১১টায় গণভবনে দেখা করতে হচ্ছে। তুমিও আমার সাথে যাবে।

পরদিন যথারীতি শিল্পাচার্যে সঙ্গে গণভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামনে হাজির। সেখানে আগেই উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন। তিনিই সংবিধান গ্রন্থটির শিল্পমান সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য শিল্পচার্য ও বঙ্গবন্ধুর সেই সভার আয়োজন করেছিলেন। ঘরে ঢুকতেই সফেত পাঞ্জাবী, পাজামা ও মুজিব-কোট পরিহিত শেখ মুজিব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আবেদিন ভাই, আসুন।

তারপর করমর্দনের জন্যে দু'জনকেই হাত বাড়িয়ে দিলেন। আবেদিন স্যার আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করলেন। বঙ্গবন্ধু মাঝখানে শিল্পাচার্যকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, আবেদিন ভাই, আপনি বসুন, আমিই ওর পরিচয় দিচ্ছি। ও আমার ছয়-দফার মনোগ্রাম, নকশা, পোস্টার করেছিল। ছয়-দফা ঘোষণার জন্যে যে মঞ্চ তৈরি হয়েছিল তার ব্যাকসিনটা ও এত সুন্দরভাবে করেছিল আমার এখনো সব মনে আছে। ছয় রং, ছয়টি গঠন ও আকৃতি ইত্যাদি দিয়ে সেদিন ছয়-দফার যে ব্যাখ্যা দিয়েছিল আমি আগে ভাবতেই পারিনি আমার রাজনৈতিক ব্যাখ্যাও বাঙালিদের নায্য অধিকারসহ নকশা, ছবি দিয়ে ছয়-দফার এত চমৎকার ব্যাখ্যা হয়। আবেদিন ভাই, সংবিধান গ্রন্থে ছবি আঁকার জন্যে আপনি ঠিক লোককেই পছন্দ করেছেন।

আমি বিস্ময়ে অভিভূত। সেই কবে ১৯৬৬ সালের এক বিকেলে বিশ মিনিটের এক সাক্ষাৎ। আমার মত এক সাধারণ তরুণের কতা 'ছয়-দফা'র মনোগ্রাম ও পোস্টারের নকশা, তার ব্যাখ্যা সব কিছু এতদিন পর তাঁর মনে আছে। গত ছয় বছরের তাঁর ওপর দিয়ে কত ঝড়-ঝঞ্জা বয়ে গেছে। কতবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। ঊনসত্তরের আন্দোলন, আগরতলা মামলা, স্বাধীনতা যুদ্ধে নয় মাস পাকিস্তানের জেলে দুর্বিষহ জীবন, ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন, দেশকে গড়ে তোলার এক দুর্জয় স্বপ্ন নিয়ে এগুচ্ছেন। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র স্মৃতিও তাঁর কাছে ম্লান নয়।

সেদিন অনেক কথাই আলোচনা হল। তবে মূল আলোচনা ছিল সংবিধান গ্রন্থটির ছবি-নকশা ইত্যাদি সমন্বয়ে একটি সুদৃশ্য গ্রন্থ তৈরি করা। বঙ্গবন্ধু শিল্পাচার্যকে বললেন, আবেদিন ভাই, পাকিস্তানিরা সবই তো ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। সব সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। আমার কাছে জাতির অনেক চাওয়া এবং পাওয়া, আমি যে কী দিতে পারবো জানি না। অনেক পরিশ্রম করে আমরা একটা সংবিধান তৈরি করেছি– আট কোটি বাঙালির মুখে হাসি ফোটানোর জন্যে, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে সরকারের কিছু নিয়ম, আইন ও দলিল। আমি কিছু দিবার না পারলেও আমার পরে যারা আসবে অন্তত এই সংবিধান সামনে রেখে তারা জাতিকে নিশ্চয় কিছু দিবার পারবে। আবেদিন ভাই, সংবিধানের মত রস-কষহীন একটা বিষয় কতটুকু শৈল্পিকভাবে ও সুন্দরভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরবো সেই পরামর্শ আপনি ছাড়া আর কে দেবার পারবে। আমি কাজ করবার পারি, খাটবার পারি কিন্তু তা সুন্দরভাবে করা, কাজকে শৈল্পিক রূপ দেয়া আপনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। এই সংবিধান গ্রন্থের রূপ কেমন হবে, ছবি, নকশা এসবের প্রয়োজন আছে কী নেই– সুন্দর প্রকাশনার দায়িত্বটুকু আপনার হাতে তুলে দিতে চাই।

শিল্পাচার্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুকে দেখছিলেন, তাঁর শুনলেন এবং বললেন, আপনি যা চাইছেন, তা আমরা শিল্পীরা কতখানি পারবো জানি না, তবে আমরা আপনার সাথে আছি। যে সোনারবাংলা গড়ার স্বপ্ন আপনি দেখছেন– আজন্ম এই ইচ্ছাকেই তো আমি লালন করে চলেছি। আজ আপনার উৎসাহ ও স্বপ্ন আমাকে এবং শিল্পীকে সমাজকে অনুপ্রাণিত করছে।

এরপর প্রায় চারমাসের অনলস কর্মের ফলে শিল্পাচার্যের নেতৃত্বে ড. কামাল হোসেন ও আমরা পাঁচ জন শিল্পীর একটি দল দিনরাত পরিকল্পনা, চিন্তা এবং তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী সংবিধানের প্রতিটি পাতার জন্য নকশা তৈরি করি। যার মধ্যে বাংলাদেশের লোকশিল্প ও লোকাচারের রং রেখার ব্যবহার করে, বাংলার রূপ-বৈচিত্র্যের এক আবহ সৃষ্টির প্রয়াস করা হয়েছে।

সংবিধান গ্রন্থের অন্যান্য শিল্পীরা হলেন জুনাবুল ইসলাম, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, আবুল বারক আলভী ও ক্যালিগ্রাফির জন্য আবদুর রউফ।

সংবিধান গ্রন্থটি যেটি বাংলা ভাষায়, সেটিতে মুদ্রণ যন্ত্রের টাইপ ব্যবহার না

করে প্রতিটি পৃষ্ঠা হাতে লেখা হয়েছে। অর্থাৎ বাংলা হাতের লেখা ব্যবহার করে পুরো গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে। ইংরেজি ভাষার গ্রন্থটিতে টাইপ ব্যবহার করা হয়েছিল। এমন একটি মূল্যবান দলিল-গ্রন্থ ইচ্ছে করলে দেশের বাইরে যে কোনও উন্নত দেশ থেকে সুন্দর পরিপাটি মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা যেত। অনেকেই সেই পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু শিল্পাচার্য, বঙ্গবন্ধু ও ড. কামাল হোসেন একটি বিষয়ে একমত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিলেন। তা হলো– আমাদের যা সম্পদ আছে, যে প্রযুক্তি আছে, যে কর্মী আছে, শিল্পী আছে তা দিয়েই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। যে নিষ্ঠা ও চেতনা নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি– দেশ গড়ার কাজেও মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনাকে কাজে লাগাতে হবে। নিতান্তই প্রয়োজন না হলে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই সংবিধান গ্রন্থের জন্যে শুধু কিছু উন্নতমানের কাগজ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। সরকারি মুদ্রণালয়ের অতি পুরনো একটি মুদ্রণ যন্ত্রকে সামান্য মেরামত করে গ্রন্থটি মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দেশ তখন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত হলেও ঢাকা ও চট্টগ্রামের কয়েকটি উন্নত মানের মুদ্রণালয় থাকা সত্ত্বেও একটি আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থে ও সরকারি মুদ্রণালয় এবং সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ববোধকে সচেতন করার প্রয়োজনে এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। সত্যি সত্যি সরকারী মুদ্রণালয়ের কর্মচারী ও কর্মকর্তারা সবাই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজটি সমাধা করেছিলেন। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করায় সরকারের প্রতি তাদের সন্তোষ প্রকাশ পায়। সংবিধান গ্রন্থটির মুদ্রণ শেষ হলে সরকারি মুদ্রণালয়ে এক সমাবেশে কর্মচারী ও কর্মকর্তারা– তাদের প্রতি সরকারের আস্থা ও দায়িত্ব অর্পণের কারণে বঙ্গবন্ধু, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে তাদের আনন্দ, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। সোনারবাংলা গড়ার কাজে বঙ্গবন্ধুর হাকে বলিষ্ঠ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ইচ্ছাকেও প্রকাশ করে।

শিল্পাচার্য ও ড. কামাল হোসেন শিল্পকর্মে শোভিত ও পরিপাটিভাবে মুদ্রিত সংবিধান গ্রন্থটি নিয়ে গণভবনে বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিলেন। সঙ্গে আমরা পাঁচজন শিল্পী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলাম। বঙ্গবন্ধু একটি একটি পাতা তুলে সংবিধানের পৃষ্ঠাগুলো অবাক হয়ে দেখছেন। কিছুক্ষণ দেখার পর মুগ্ধ ও অভিভূত দৃষ্টিতে আমাদের সবার দিকে তাকালেন। বললেন, আবেদিন ভাই, এত সুন্দর কী করে করলেন! আমি যে ভাবতেই পারছি না! কিছুই তো ছিল না, ভাঙ্গা প্রেস, ভাল কালি নেই– তারপরও আপনি কি অসাধ্য সাধন করলেন। আপনারা শিল্পীরা কত সুন্দর ও পরিপাটি করে বাংলার মানুষের জন্য সংবিধান গ্রন্থ তৈরি করলেন। কিন্তু আমি কি করি? আমি কি পারব আমার বাংলাকে এত সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে? এই যেমন আপনারা পারলেন এই সংবিধান!

–বঙ্গবন্ধু, এই কাজটা তো আপনিই করলেন। আপনার পরিকল্পনা ও চিন্তাকে আমরা একটা রূপ দিলাম। আমরা আপনার হাতিয়ার, আপনার কর্মী। বাংলার

মানুষের দেশ গড়ার সংবিধান– শৈল্পিক রূপ লাভ করুক, সুন্দর একটি চেহারা অর্জন করুক- আপনার স্বপ্ন ও অভিলাসকেই আমরা শিল্পীরা রূপ দিয়েছি। আমাদের শিল্পীদের মত বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ ও কর্মী আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। যাকে যে কাজে প্রয়োজন আপনি আহ্বান জানালেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। আপনার আহ্বানেই যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ পাক-হানাদারদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পাক সেনাদের মত অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধবিদ্যা বাংলার মানুষের ছিল না। তবুও তারা যুদ্ধ করেছে। ৩০ লক্ষ মানুষ রক্ত দিয়েছে। তেইশ বছর সংগ্রাম ও নয়মাস হাতিয়ার দিয়ে যুদ্ধ করে বলিষ্ঠ ও দক্ষ পাক বাহিনীকে হটিয়ে নিজের দেশকে মুক্ত করেছে। আজ আপনার স্বপ্ন– এই বিধ্বস্ত বাংলাকে সোনার বাংলা রূপে গড়ে তুলবেন। বাংলার মানুষ আপনার হাতকে শক্তিশালী করার জন্যে তৈরি, আপনি ডাকুন।

বঙ্গবন্ধু অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন সংবিধান গ্রন্থটি। তারপর বললেন,– আবেদিন ভাই, আপনি তো আমার কাজটা করে দিলেন। এখন আমি আপনাদের জন্যে কি করতে পারি বলুন।

–আমি এবার একটা কাজে হাত দিতে চাই। আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন। শিল্পাচার্য বঙ্গবন্ধুকে বলতে লাগলে–ঢাকার পাশে যে ঐতিহাসিক সোনার গাঁ, সেই সোনার গাঁকে আমি নতুন রূপে গড়ে তুলতে চাই। এই অঞ্চলেই তৈরি হত সারা বিশ্বে খ্যাত শিল্পকর্ম "মসলিন" যা আজ হারিয়ে গেছে। এমনিভাবে বাংলার অনেক ঐতিহ্য ও লোকশিল্প আজ লুপ্তপ্রায় এবং যে কটি বেঁচে আছে তা কোন কদর পাচ্ছে পুনর্জীবিত করার জন্যে এখনি পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সোনার গাঁয়ে একটি লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের লোকশিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের শিল্পকর্মে উৎসাহ প্রদান ও উজ্জীবিত করার প্রয়াসে আমি একটি বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়েছি। আর তা বাস্তবায়নে আপনার সাহায্য ও উৎসাহ প্রয়োজন। সোনার গাঁকে বাস্তবে রূপ দিতে পারলে আপনার সোনারবাংলা গড়ার কাজ অনেকখানি এগুবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বঙ্গবন্ধু একটু অবাক হয়ে শিল্পচার্যের দিকে তাকালেন। একটু সময় নিলেন। সংবিধানের পাতা উল্টাতে উল্টাতে আনন্দ ও বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললেন, আবেদিন ভাই, আপনি আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী এখুনি কাজে নেমে যান। আমি এবং বাংলাদেশ সরকার আপনাকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা দেয়ার জন্য প্রস্তুত। শুধু আমার ছোট্টো একটা অনুরোধ, সোনার গাঁয়ে মাঝে মাঝে আমি আপনার কাছে গিয়ে থাকবো। আমার জন্য আপনার পাশে একটু জায়গা রাখবেন। সুন্দর কিছু সৃষ্টি করার শক্তি ও প্রেরণা আপনার কাছ থেকে যাতে পেতে পারি ও শিখতে পারি সেই ব্যবস্থা আমাকে করে দেবেন।

সংবিধান এবং সোনারবাংলা গড়ার স্বপ্ন– দুটি মানুষের কথোপকথন। আমি সেদিন বিমোহিত। মহামানব দেখতে কেমন হয়, এমন কোন ধারণা আমার নেই।

কিন্তু সেদিন এই দুজনকে আমার মনে হয়েছে, দুই মহামানবের সম্মুখে আমরা। বিশাল বক্ষ দু'জনের। যে বক্ষ ধারণ করে আছে বাংলার আপামর মানুষকে। সোনার গাঁ ও সোনারবাংলা গড়ার স্বপ্নকে। দুজনের মধ্যেই এক অদ্ভূত মিল। এই দুই মহামানব হারিয়েও গেছেন আমাদের মাঝে থেকে প্রায় একইভাবে। দুজনকেই ছিনিয়ে নিয়ে গেছে মানবজাতির শত্রুরা–দুর্বৃত্ত ও দুর্জনরা। শিল্পচার্যকে অকস্মাৎ ছিনিয়ে নিল– দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগ আর বঙ্গবন্ধুকেও অকস্মাৎ হত্যা করল কিছু দুর্বৃত্ত– সৈন্য– বাংলার শত্রু!

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজ পঁচিশ বছর। শিল্পাচার্যের সোনার গড়ার স্বপ্ন সফল হল না। কী কাকতালীয় মিল। বঙ্গবন্ধুর সোনারবাংলা গড়ার স্বপ্নও সফলতার মুখ দেখল না।

আমার শেখ মুজিব

বেলাল বেগ

মুক্তিযোদ্ধা, বিজ্ঞানী ও লেখক ডঃ নূরন নবী তাঁর অসাধারণ আত্মকথামূলক বই "জন্মেছি এ বাংলায়" উল্লিখিত এক মন্তব্যে বলেছেন, শেখ মুজিব কর্মী হিসাবে তাঁকে খুঁজে পাবার আগে তিনি তাঁকে (শেখ মুজিব) নেতা হিসাবে আবিষ্কার করেছিলেন। ডঃ নূরন নবী যে পরিবেশে সূর্যের মত শেখ মুজিবকে দেখতে পেরেছিলেন, উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতাভিত্তিক রাজনীতির উদ্ভব না হলে তা হয়ত সম্ভব হত না। অনুরূপভাবে, বাংলাদেশ নামক স্বাধীন দেশে শোষণ-ভিত্তিক সামন্তবাদী এবং ঔপনিবেশিক সমাজের অস্তিত্ব না থাকলে আমার সঙ্গেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেখা হত না।

পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলাকে বিকলাঙ্গ পাকিস্তানের অস্তিত্ব বাজায় রাখার একটা উপায় হিসাবে মনে করা হত। ঐ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সরকারি বৃত্তি নিয়ে লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আমার সুযোগ হয়েছিল। প্রথমে পড়াশোনা এবং পরে টেলিভিশনে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আমি তিন বছরেরও বেশি সময় পাকিস্তানে ছিলাম। ঐ সময়ে পাকিস্তানের সর্বশ্রেণী মানুষের সঙ্গে মেশার আমার একটা সুযোগ হয়েছিল। আমি লক্ষ্য করেছি, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ নিরক্ষর, পশ্চাপদ ও দরিদ্র হওয়া ছাড়াও ছিল একবারেই ধর্মান্ধ। তখন আমাদের সাধারণ মানুষ তাদের মতই নিরক্ষর, পশ্চাদপদ ও দরিদ্র ছিল বটে, কিন্তু কখনই ধর্মান্ধ ছিল না। তাদের তুলনায় আমাদের মানুষের মানসলোক অনেক বেশি আলোকিত ছিল। অন্যদিকে পাকিস্তানি সমাজের উপর তলার মানুষগুলি ছিল উপনিবেশবাদপালিত সামন্তবাদী শোষক। সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু বা বেলুচিস্তানের গ্রাম-গঞ্জের মত ইস্ট পাকিস্তানও তাদের কাছে নেহায়েত একটি শোষণক্ষেত্র ছিল। আমাদের উন্নত সংস্কৃতি এবং আলোকিত ইতিহাস সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। পাকিস্তানে প্রথমে ছাত্র ও পরে সরকারি কর্মচারী হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতার ফলে আমি জানতাম, এ রাষ্ট্রে আমাদের কোন ভবিষ্যত নেই। তখন অনেকে গোপনে এমন ধ্যানধারণা পোষণ করতেন। একবার ঢাকা-লাহোর আকাশপথে বিমানে বসে আমি কয়েকজন বাঙালি সিএসপি অফিসারকেও এ ব্যাপারে ফিসফাস আলোচনা করতে দেখেছি। বঙ্গবন্ধু ৬- দফা দাবী উত্থাপন করে আমাদেরই ঐ না-বলা চিন্তা-চেতনাকে প্রবলভাবে

প্রকাশ্য করেছিলেন। আমি ৬-দফা সমর্থন করলেও পাকিস্তান-উচ্ছেদের ধারণাকে উগ্র মনে করতাম। কারণ, ৬-দফায় বাঙালিদের জাতীয় মুক্তির কথা থাকলেও বাঙালি দরিদ্র মানুষের মুক্তির কথা ছিল না, অথচ তখন পাকিস্তান কি ভারতের মৌলিক সমস্যাই ছিল পশ্চাদপদতার অবসান ও দারিদ্র্যমুক্তি। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সে পথে না গিয়ে শোষণ ও দমনের পথ ধরে। পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানি ধনিক-বনিক সমাজের লুণ্ঠনের চারণভূমি হয়ে পড়ে। উচ্চ-মূল্যবোধ-সম্পন্ন অধিকার-সচেতন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত বাঙালি এর বিরুদ্ধে ক্রমশঃ ফুঁসতে থাকে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন এই জেগে ওঠা বাঙালির ইচ্ছা-সম্রাট। তাঁর কাছে আমি গোপনে বশ্যতা স্বীকার করলাম, কিন্তু তখন পর্যন্ত তিনি আমার মন জয় করতে পারেন নি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দারিদ্র্যমুক্তির সংগ্রামের নতুন প্রেক্ষিত দেখা দিল। সকল ধর্মের ধনী-নির্ধন লক্ষ লক্ষ বাঙালি স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে, কোটি কোটি মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করেছে এই স্বাধীনতার জন্য। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃস্টান, ধনী-গরীব, সকল বাঙালির রক্তের সাগরে কোন দল বা গোষ্ঠির রক্ত আলাদাভাবে সনাক্ত করার আর উপায় থাকল না।

স্বাধীনতার পর অকল্পনীয় শক্তিতে জেগে ওঠা সকল শ্রেণীর মানুষ নিজ নিজ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাদের স্বপ্নগুলি হাতের মুঠোয় পেতে চাইল রাতারাতি। এমন অচিন্ত্যপূর্ব পরিস্থিতির জন্য কেউ প্রস্তুত ছিলেন না; না বঙ্গবন্ধু, না দেশের মানুষ। দেশের মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য স্বাধিকার চেয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধু তার জন্য "বজ্রকণ্ঠে" হাঁক দিয়েছিলেন। পাকিস্তানি লুটেরা শাসকগোষ্ঠি আমাদের ন্যায় সংগত অর্থনৈতিক সংগ্রামের গুরুত্ব না বুঝে, আমাদের শান্তিকামী নিরীহ মানুষদের যুদ্ধ ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এই যুদ্ধ গরীব মানুষদের জীবন ও সমাজকে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণীঝড় বা সুনামির মত লণ্ড ভণ্ড করে দেয়। স্বাধীনতার পর সমস্ত মানুষের অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতি সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের সমস্যা একসঙ্গে দেখা দেয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পুণরুদ্ধার ছাড়াও স্বাধীন দেশের জন্য রাতারাতি একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্রও দরকার। ওদিকে শত্রুরা পরাজিত হলেও শত্রুতা অব্যাহত রেখে সর্বত্র ষড়যন্ত্রের বিষ ঢেলে যাচ্ছিল। অবস্থা সামাল দিতেই বঙ্গবন্ধু প্রকৃত বন্ধুর মতই সকল দায়িত্ব ও বিপদ নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। এমন সাহস কেবল মাত্র তিনিই দেখাতে পারেন যিনি অবলীলাক্রমে বলতে পারেন, "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, এদেশকে মুক্ত করেই ছাড়ব ইনশা আল্লাহ।" তখনকার পরিবেশ পরিস্থিতিতে নিজেকে প্রেসিডেন্ট বানানো ও বাকশাল গঠন কেবলমাত্র একজন যুগান্তকারী দেশপ্রেমিকের পক্ষেই সম্ভব ছিল। বঙ্গবন্ধুর ঐ চিন্তাগুলি কত মৌলিক ও গভীরভাবে আন্তরিক ছিল তার প্রমাণ বাকশাল গঠন উপলক্ষে দেয়া জাতীয় সংসদে তাঁর ভাষণ।

৭ই মার্চে দেয়া তাঁর অলৌকিক ভাষণের মত সংসদে দেয়া ভাষণটিও ছিল

স্বতঃউৎসারিত, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জলপ্রপাতের মত নিগমিত। বস্তুতঃ বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণেই তাঁর অধিকাংশ মৌলিক চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে। ঐ নিরাভরণ বলিষ্ঠ ঋজু ভাষণের ভাব, ভাষা, বক্তব্য ও ব্যক্ত প্রেমের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু একটা অশরীরী আত্মার মত আমার ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলেন। আমি নিশ্চিত জানতাম মণি সিংহের মত তিনিও আমার একজন নেতা এবং সম্ভবতঃ তাঁর চেয়েও বড়।

বাকশাল গঠনের পূর্বে আমার কাছে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত বাঙালির নেতা। বাকশাল গঠনকালে জাতীয় সংসদে দেয়া ভাষণের পর থেকে আমি আবিষ্কার করলাম তিনি শোষিত মানুষেও নেতা। তিনি বলেছিলেন পৃথিবীতে দু'রকম মানুষ আছে– একদল শোষক ও অন্যদল শোষিত। "আমি শোষিত মানুষের পক্ষে।" একজন বক্তৃতাপ্রিয় মানুষের পক্ষে এটা একটা কথার কথা হতে পারত, কিন্তু বৃটিশ ঔরসজাত ব্যুরোক্রেসীকে যখন তিনি ধ্বংসের আহ্বান জানান তখনই আমি জানলাম সত্যে, বিশ্বাসে এবং আবেগে তিনই আমাদের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক শোষণ ও শ্রেণীসংগ্রামের গতি-প্রকৃতি নিয়ে তখন সমাজতান্ত্রিক শিবিরে নানা তত্ত্বের কুস্তাকুস্তি চলছিল। ঠিক সে সময় বঙ্গবন্ধু বলে দিলেন, "ও মিঁয়ারা, আমি একটা কথা সাফ সাফ কয়া দিবার চাই, সাফ-কাপুড়্যা মানুষ থাইকা বাঁইচা থাইকবা।" দরিদ্র মানুষদের জীবনের বাস্তবাত এবং বুর্জোয়া শোষণকে এমন সহজ মেঠো-ভাষায় পৃথিবীর আর কোথাও প্রকাশ করা হয়েছে কিনা, আমরা জানি না। আপাদমস্তক বাঙালি ছিলেন বলে বঙ্গবন্ধু বাঙালির সহজাত সমাজতান্ত্রিক জীবনবোধকে এত সহজে ধারণ করতে পেরেছিলেন।

সেইদিন, একজন পাঁড়েজি

দাউদ হায়দার

এক

ভূগোলটা এই রকম, আনোয়ার শাহ রোডের প্রবেশমুখেই যাদবপুর থানা। থানার গা-ঘেঁষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন হোস্টেল। একই কম্পাউন্ডে তিনটি বিল্ডিং। একটু দূরে-দূরে। হোস্টেল "এ" ব্লক একেবারে শেষে। "সি" মাঝখানে, "বি" গেট-লাগোয়া।

উনিশ শ' সত্তরের গোড়ায় মেইন হোস্টেল ছিল নকশালপন্থীদের ঘাঁটি। পুলিশের সঙ্গে কেবল মারপিটই নয়, যুদ্ধও হয়েছে নকশালপন্থী ছাত্রদের। হোস্টেলের দেয়ালে গোলাগুলির দাগও দেখেছি ১৯৭৫ সালে।

আমার রুমমেট ব্যারাকপুরের অলোক চট্টোপাধ্যায়। ইলেকট্রনিক্সের ছাত্র। অসম্ভব মেধাবী। নকশাল-রাজনীতির সমর্থক। রাত বারোটার আগে লেখাপড়া ধাতে নেই তাঁর। ভোর চারটে-পাঁচটা পর্যন্ত চলবে। অভ্যেসটা রপ্ত করলুম আমিও।

থানার ঠিক বিপরীতে সুবিমল দত্তর আড়াই-তলা বাড়ি। প্রথম ভারতীয় হাইকমিশনার বাংলাদেশে। আদি বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে। প্রায়ই তাঁর আস্তানায় যাই। স্নেহ করেন আমাকে। কথায়-কথায় একদিন, অনেকটাই আপন মনে যেন, বললেন, বঙ্গবন্ধু কী বাঁচবেন?– কেন এই শঙ্কা?– প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান, কূটনীতির কৌশলে। লক্ষ্য করি, চেহারা বিষাদমাখা। বলেন, ঘরের শত্রু বিভীষণরা ঘিরে ধরেছে তাঁকে।

– কে, কারা বিভীষণ, খোলাসা করেন না কিছুই।

দুই

মেইন হোস্টেলের পয়লা গেটকিপার পাঁড়েজি। বিহারের। তেলেজলে এবং আগুনে পাকানো শরীর।

বয়স তেত্রিশ। লম্বাচওড়া। ঝাঁকড়া চুল। কড়া গোঁফ। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'বাংলার ডাকাত'– এর সঙ্গে হুবহু মিশ খায়।

আমি বাংলাদেশের এবং মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি, আমরা পাঁড়েজির কাছে খুব সম্মানিত এবং গর্বের আমি। দেখা হলে কুর্নিশের ভঙ্গিতে কথা বলেন। 'শেখ মুজিব শের কা বাচ্চা নেহি, শের কা শের লীডার।' শুনে মজা পাই। "হা বাবু, শেখ সাহাব আচ্ছি আদমী হ্যায়। বাংলাদেশ আজাদ কর দিয়া।"

পাঁড়েজি খুব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে শেখ মুজিবের জীবনচরিত শুনতে চান। প্রায়ই নানা-ছলে আমার রুমে আসেন। দুই-একটি কথার পরেই মুজিব- প্রসঙ্গ। বলি একদিন, 'মুজিব নিয়ে এত উৎসাহ কেন?

– "ও তো শের কা শের। আমার ঘরে মুজিব সাহাবকা তসবীর হ্যায়। দেখবেন ? আসুন আমার কামরায়।"

– বলে কী লোকটি? আমার রুমে শেখ সাহেবের ছবি নেই দেখে বিস্ময় মানেন। "আপ কা কামরা মে শেখ সাহাব কো তসবীর নেহী? আজীব বাথ"।"

পাঁড়েজি সাধারণ মানুষ। শেখ মুজিবকে নিয়ে কেন এত উৎসাহ?

একটু গোয়েন্দাগিরি করি। আরো বেশি মিশি। শেখ মুজিবের কথা বলি। তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়। বলেন, "শেখ সাহেব যখন জেলে, পাকিস্তানে, পূজো দিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধে– সেনাদের ৩৭ ঢাকা দিয়েছি তহবিলে। আমার তো টাকা নেই বাবু।" শুনে আমি ৩৭ টাকা দিতে চাই। "না বাবু, মাফ করবেন। বাংলাদেশ আজাদ হো গিয়া, মুজিব সাহাব আ গিয়া, ছব ঠিক হো যায়েগা। আজ কা তকলিফ, দু-পাঁন্চ (পাঁচ) বরষ দুখ হ্যায়, ছব মুশকিল আসান হো যায়েগা।"– পাঁড়েজি অভয় দেন।

তিন

রাত দেড়টায় ঘরে ফিরেছি। রুমমেট অলোক জেগে। পড়ছিলেন। বাথরুমে গিয়ে জামাকাপড় বদলে, হাতমুখ ধুয়ে ফিরে আসি। গল্প হয় কিছুক্ষণ। অলোক বললেন, রাত আড়াইটের বেশি। ঘুমোই। তুমি পড়ো।

জুলিয়াস সিজার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নোট লিখছি। জমা দিতে হবে টিউটোরিয়াল।

বিছানায় যাই পাঁচটার দিকে। ঘুমিয়ে পড়ি। দশ মিনিটও হয়নি। দরজায় হঠাৎ কড়া নাড়া। সশব্দে। লোক জেগেই খিস্তি শুরু করলেন। ঘুম পোক্ত হয়নি। মেজাজ তিরিক্ষে। স্বাভাবিক। দরজা খুললেন অলোকই। সামনেই পাঁড়েজি। মুখে কোনো কথাই নেই। দাঁড়িয়ে। চোখে জল।

ঘরে ঢুকেই জড়িয়ে ধরেন আমাকে। নির্বাক। অলোক-আমি তাজ্জব।

মাথায় চক্কর দেয়, মার শরীর ভালো। গতকালই ঢাকা থেকে দাদুভাইয়ের(রশীদ হায়দার) চিঠি পেয়েছি।– কোন দুঃসংবাদ নয় তে?

জিজ্ঞেস করি ঢাকা থেকে ফোন এসেছিল? টেলিগ্রাম? পাঁড়েজি হিন্দি বাংলা মিশিয়ে যা বললেন, মমার্থ এই, "শেখ সাহাবাকো কোতল কোর দিয়া। বহু (বউ), লাড়কালাড়কি ভি জিন্দা নেহি। পরিবার খতম হো গিয়া।" পাঁড়েজির চোখে জল এবং চোখ লাল। অলোক বললেন, সারারাত নিশ্চয় গাঁজা ও দিশি টেনেছ। মুখ দিয়ে গন্ধ বেরুচ্ছে। আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে সাতসকালে ড্রামা করতে এসেছে? শেখ মুজিবকে হত্যা করবে কার সাহস? সঙ্গে বউ, ছেলেমেয়েকেও? ইমপসিবল। তুমি কোথায় শুনলে?

প্রসূন বাবু (থানার পুলিশ) বলেছেন।

তিনি কি করে জানলেন?

"রেডিওতে শুনেছেন। আমাকে ডেকে নিয়ে এই 'কাহিনী' শোনায়ে, আউর বলিয়ে, 'হোস্টেল মে বাংলাদেশের হায়দার সাব হ্যায়, উসকো বলিয়ে।....বাবু, শেখ সাহাব আচ্ছি লিডার হ্যায়।" বলে নিশ্চুপ। চোখে জল।

আমাদের রুমে রেডিও নেই। রেডিও একমাত্র কমনরুমে। এত সকাল যে, পানবিড়ির দোকানও বন্ধ। পানবিড়ির দোকানে রেডিও আছে।

অলোক বললেন, চলো থানায়।

থানায় প্রসূনবাবু নেই। যে-কয়জন পুলিশ ডিউটিরত, আমাদের চেনা। একজন বললেন, ট্রানজিস্টর আনছি। শোনান বিবিসি'র ইংরেজি সংবাদ। সকাল সাতটা থেকে আকাশবাণীর খবর। একটিই মাত্র খবর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত।

পনেরই অগাস্ট ছুটির দিন। ভারতের স্বাধীনতা দিবস। লোকজন উঠবে ধীরে-ধীরে। আটটার আগে কেউ বাজার-সওদা করবে না। রাস্তা ফাঁকা। কিন্তু বাস চলাচল কম কেন? নগরী নিঃশব্দ। মৃতপ্রায়।

রুমে ফিরে আসি। অলোক চুপচাপ। আমার চোখে জল। শরীর এলিয়ে দিই বিছানায়। ঘুমিয়েও পড়ি। বেশিক্ষণ নয়।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার খবর হোস্টেলময় ছড়িয়ে পড়েছে। বলেছেন অলোকই। আমি যেন শেখ মুজিবের আত্মীয়। ঘরোয়া। ছাত্ররা আসেন। জড়িয়ে ধরেন আমাকে। তাঁদেরও চোখ ভেজা।

জামসেদপুরের অনির্বান বললেন, আমার বাবা ১৯৪৮ সালে ফরিদপুর থেকে চলে আসেন। তিনি শেখ মুজিবকে জানতেন।....বাংলাদেশ আজ থেকে পিতৃহীন হলো। আজ থেকেই বাংলাদেশের মৃত্যু। সুদীপদা বললেন, বাঙালিরও মৃত্যু।

মেইন হোস্টেল থেকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের যোধপুর পার্কের বাড়ির দূরত্ব, পায়ে হেঁটে পাঁচ মিনিটও নয়।

তিনি মুজিবভক্ত। বাংলাদেশ প্রেমিক। বারকয়েক গেছি তাঁর বাড়িতে। বাংলাদেশের কথা শোনেন। বলেনও। "বাকশাল করে ভুল করেছেন মুজিব" বললেন একদিন, "এর জন্যে হয়তো মাশুল দিতে হবে বঙ্গবন্ধুকে।"

ভাবলুম, তিনি খবরটি শোনেননি বোধহয়। গেলুম তাঁর বাড়িতে। পরিচারিকা পূর্ণিমা দরজা খুললেন বটে, কিন্তু চুপচাপ। অন্নদাশঙ্কর জড়িয়ে ধরেন আমাকে। চোখে জল। নির্বাক। কয়েক মিনিট কথা নেই কোনো।

দিদু, লীলা রায়, বললেন, সকাল সাতটায় খবর শুনেছেন। তখন থেকে চোখে জল। এখন পর্যন্ত ব্রেকফাস্ট করেননি। পায়চারি করছেন সারাক্ষণ। হাঁটতেও যাননি। দাদুকে বলো ব্রেকফাস্ট করতে।

দাদা শুধু চা আর বিস্কুট খেলেন। খেতে-খেতে একটিই কথা, কাঁদো, প্রিয়

দেশ। কাঁদো, প্রিয় দেশ। কাঁদো, প্রিয় দেশ। কাঁদো (বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে, "কাঁদো, প্রিয় দেশ" নামে একটি বড় প্রবন্ধ লেখেন। বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর "কাঁদো প্রিয় দেশ" বইও আছে।) সেইদিন রাত্রেই লেখেন: "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে।" সনেট।

নরহত্যা মহাপাপ, তার চেয়ে পাপ আরো বড়ো
করে যদি যারা তাঁর পুত্রসম বিশ্বাসভাজন
জাতির জনক যিনি অতর্কিতে তাঁরেই নিধন।
নিধন সবংশে হলে সেই পাপ আরো গুরুতর।

সারা দেশ ভাগী হয় পিতৃঘাতী সে ঘোর পাপের
যদি দেয় সাধুবাদ, যদি করে অপরাধ ক্ষমা।
কর্মফল দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে হয় এর জমা
একদা বর্ষণ হয় ব্রজরূপে সে অভিশাপের।

রক্ত ডেকে আনে রক্ত, হানাহানি হয়ে যায় রীত।
পাশবিক শক্তি দিয়ে রোধ করা মিথ্যা মরীচিকা।
পাপ দিয়ে শুরু যার নিজেই সে নিত্য বিভীষিকা।
ছিন্নমস্তা দেবী যেন পান করে আপন শোণিত।

বাংলাদেশ! বাংলাদেশ! থেকো নাকো নীরব দর্শক
ধিক্কারে মুখর হও। হাত ধুয়ে এড়াও নরক।

খাঁটি ও যথার্থ কবি সত্যদ্রষ্টা। ভাবছি, কী সত্যি কথাই না লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। দিব্যাদৃষ্টিতে দেখেছেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কী।

"কাঁদো, প্রিয় দেশ"–এর ভূমিকায় লিখেছেন: "শেখ মুজিবুর রহমান শত অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁর নিধন যেভাবে হলো, তা অমানুষিক। গভীরভাবে বিচলিত হয়ে আমি কাঁদতে কাঁদতে লিখি "কাঁদো, প্রিয় দেশ।"

গোটা কলকাতা স্তম্ভিত। পথের মোড়ে-মোড়ে জটলা। আরোচনা। প্রত্যেকের মুখে এক কথা, "এ-কী ঘটনা, এ-কী ঘটনা! অসম্ভব। অবিশ্বাস্য।" "না, হতে পারে না।" "হতে পারে না।" সিগারেট পানের দোকানে তারস্বরে আকাশবাণীর খবর প্রচারিত হচ্ছে। ফুল ভলিয়্যমে রেডিও বাজছে। মূর খবর একটিই। শুনছে পথচারী। দোকানের সামনেও লোকের ভিড়। নানাজনের নানা কথা।

বারোটা বাজার আগে, বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে যাই। গেটবন্ধ। কলিং বেল টিপলুম। কেউ খোলে না। মিনিট দশকে পরে অন্য ফুটপাত থেকে দারোয়ান

এসে বললেন, "আপনি অনেকক্ষণ ধরে বেল বাজাচ্ছেন। দেখেছি। সার (ডেপুটি হাইকমিশনার) বলেছেন, দরজা খুলবে না। কাউকে ঢুকতে দেবে না। সাংবাদিক এলে বলবে, স্যার বাড়িতে নেই।"

তিনি কী বাড়িতে আছেন?

"আছেন, কিন্তু নিষেধ করেছেন বলতে।"

বলুন, আমি এসেছি।

দারোয়ান মাথা চুলকে বললেন, "আপনি আমার চারিক খাবেন?"

পার্ক সার্কাসের মোড়ে ফার্স্ট সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখে, দুপুরবেলায়, জ্যান্ত মামদো ভূত দেখেছেন যেন, কেঁপে উঠলেন। চোখেমুখে ভয়। ভয়ার্ত কণ্ঠে জানান, দ্বিধা জড়িত নিচু গলায়, "আমরা কিচ্ছু জানি না। ঢাকার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। ফোন বন্ধ। রেডিওতে যা শুনেছি, শুনেছেন আপনিও, তার বেশি খবর নেই। স্যারের কাছে হয়তো খবর আছে। কিন্তু তিনি দেখা করবেন না কারোর সঙ্গে। টেলিফোনেও পাবেন না। আপনার মতো আমিও অন্ধকারে।"– লক্ষ্য করি, তাঁর দুইচোখে টলমল করে জল।

ফিরে এলুম হোস্টেলে। ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে। রুমের সামনে ভিড়। আমি ও আমার বাংলাদেশ যে পিতৃহারা, জেনেও ছাত্ররা সান্ত্বনা দেন আমাকে।

অলোক বললেন, তোমার জন্যে খাবার নিয়ে এসেছি।

বিকেলের আগেই, বাংলাদেশের ছাত্ররা আসেন। ধারণা ওঁদের, আমি হয়তো বাড়তি কিছু খবর জানি।

মানিক (শাহ মোহাম্মদ তৈজীহ) ও জহীর ঢাকায় ফোন করার চেষ্টা করেছিলেন কয়েকবার, সব লাইনই বন্ধ। রেডিও'র সংবাদ ছাড়া কেউই বিশদ কিছু জানি না। মানিক বললেন, "আনন্দবাজারে চলো, তুমি ভিতরে গিয়ে খবর নিয়ে এসো। আমরা গেটে অপেক্ষা করবো।"

গেলুম আনন্দবাজারে। গোটা নিউজ-ডিপার্টমেন্ট ব্যস্ত। কিন্তু অতিরিক্ত খবর নেই। কয়েকটি গ্যালি দেখলুম, রয়টার-এপি'র সংবাদ। রেডিওতে যা বলেছে, বলছে, প্রায়-একই সব।

বার্তা-সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী বললেন, সন্তোষদা (সন্তোষ কুমার ঘোষ) তোমাকে খুঁজছিলেন। চলো।

সন্তোষদা বললেন, শেখ মুজিবকে নিয়ে এখনি কিছু লিখে দাও।

বললুম, পারবো না।

পরদিন দেখি, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গল্প ফেঁদেছেন তুষার পণ্ডিত। ঢাকায় ছিলেন। আনন্দবাজারের ব্যুরো চীফ। ডালিম, জিয়াউর রহমান ওঁর বন্ধু। সখ্য সম্পর্ক। হত্যার মোটিভ নিয়েই শুধু নয়, এমন-এসব বর্ণনা দিচ্ছেন লেখায়, যেন প্রত্যক্ষদর্শী। হত্যাণ্ডের উপস্থিত। লিখছেন ধারাবাহিক। মিথ্যের পাহাড়, গল্পে।

এতটা মিথ্যে বোধহয় সহ্য করতে পারেননি সম্পাদক অশোক কুমার সরকার। হঠাৎ– ই ধারাবাহিক রচনার ইতি।

ওদিকে, যুগান্তরও কম যায় না। লিখছে বঙ্গবন্ধু হত্যার বানোয়াট- কাহিনী। প্রতিবাদ পত্র পাঠাই। তুষারকান্তি ঘোষ ডেকে পাঠান। দেখা করি। বলেন, "বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ধারাবাহিক লেখো, ছাপবো।" বলি, "বঙ্গবন্ধুর শোকে অন্ধ, কিছুই লিখতে পারবো না। শোক করে দূর হবে, অজানা।"

"আরে মশাই, দেশপিতাকেই হত্যা করলেন?" যাদবপুর বাজারের মাংসবিক্রেতার প্রশ্ন। "দেশটা কী আবার পাকিস্তান হয়ে যাবে?'– জানতে চান পানবিড়ি-সিগ্রেটের দোকানদার। "যাই বলুন মশাই, বঙ্গবন্ধু ছাড়া কী বাংলাদেশ?– না।" বলেন ওই প্রসূন পুলিশ।

পাঁড়েজি আসেন, রাত বারোটার পরে। দরজায় কড়া নাড়েন। ঘর খুলি। মাথা নিচু করে একটিই কথা বলেন, "দাদা বাবু, আপকো দেশ বাপ নেহি হ্যায়, আপ তো এতিম হো গিয়া"।

রাষ্ট্র গঠন ও জাতির জনক শেখ মুজিব

অধ্যাপক ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

এক

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্র গঠন একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সমস্যাটি হচ্ছে : রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রের নৈতিক অর্থনীতির মধ্যকার সম্পর্ক কি প্রক্রিয়ায় নিরসন হবে? রাজনৈতিক অর্থনীতির মধ্যে ক্রিয়াশীল উৎপাদন সম্পর্ক। নৈতিক অর্থনীতির মধ্যে ক্রিয়াশলি জনসমষ্টির অধিকারবোধ। এই দুই ক্ষেত্রের সম্পর্ক থেকে তৈরি হয়েছে সমাজ নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজ মধ্যকার সাঙ্গীকরণ সমন্বয়ের সমস্যা। রাষ্ট্র-পরিচালক ও প্রশাসক এবং জনসমষ্টির রাষ্ট্র ও সমাজ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের স্বরূপ কি হবে? সেজন্য সমাজ ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কর্তৃত্বের সমস্যা কেন্দ্রিক হয়ে দেখা দেয়। এই সম্পর্কে যুক্ত কাঠামোগত এবং ব্যাখ্যানমূলক উপাদানাবলি। রাষ্ট ও সমাজ-কাঠামোর ব্যাখ্যানের উপাদানাবলি কি কি। বিভিন্ন সম্পর্ক ও অধিকার ব্যাখ্যানের উপাদনাবলি কি কি। রাষ্ট্র, সেজন্য, নির্মিত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া থেকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলের বিভিন্ন সংঘাত এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে উৎসারিত বিভিন্ন অধিকারবোধ। এই দুই উপাদানের যুক্ততা থেকে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহ; রাষ্ট্র সিভিল সমাজ থেকে কতদূর পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন এবং কতদূর পর্যন্ত যুক্ত সেই সমস্যা। ঔপনিবেশিক আমলে রাজনৈতিক বিতর্ক এবং প্রতিগদ্বন্দ্বিতা বাঙালি সিভিল সমাজের পক্ষ থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ নির্ধারিত করেছে এবং ঔপনিবেশিকোত্তর সিভিল সামজে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের পরিসর নিরূপণ করেছে। রাষ্ট্রের স্বরূপ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে আধিপত্য নিয়ে। আবার জনসমষ্টির অধিকারবোধ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নিয়ে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র গঠনের আবহাওয়া তৈরি হয়েছে ঔপনিবেশিক পরিসর এবং বিতর্ক থেকে; অন্যপক্ষে বাংলাদেশের রাষ্ট্র-ক্ষমতার নির্দেশনা ঐতিহাসিকভাবে নির্মিত হয়েছে সমাজ ম্যানেজমেন্টের ঐতিহ্য থেকে, যে- ঐতিহ্য রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক সময়ের পরিসরে একটি কাঠামো পেয়েছে। সময়ের পরিসর এসেছে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক (এবং বৃটিশ) এবং ঔপনিবেশিকোত্তর বোধ থেকে। এই বোধ রাষ্ট্র ও সমাজের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এই দুই স্তর যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রের

আধিপত্যের স্তরে। এই দুই স্তর আবার ব্যাখ্যা করেছে রাষ্ট্রের নৈতিক অর্থনীতি : জনসমষ্টির অধিকারবোধ।

নৈতিক অর্থনীতি সামাজিক গ্রুপসমূহের সংস্কৃতি এবং রাজনীতি উদ্ভাসিত করে। এ সব গ্রুপের অবস্থান রাষ্ট্রের প্রান্তে, প্রায় ক্ষেত্রে এসব গ্রুপ রাষ্ট্রবিরোধী। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক পরিসরে রাষ্ট্রের দিক থেকে বাঙালি সমাজ কিংবা বাঙালি সমাজের বিভিন্ন গ্রুপগুলো (পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্র-যুবক, কৃষক-শ্রমিক) অবস্থান ছিল রাষ্ট্রের প্রান্তে, এবং এসব গ্রুপের অবস্থান ছিল রাষ্ট্রবিরোধী। এই পরিসরে নৈতিক অর্থনীতি তৈরি করেছে অধিকার বোধ, সম্পত্তির বোধ, কমিউনিটি বোধের সংজ্ঞা : পূর্ববাংলা নামক প্রধানত কৃষিজীবি কমিউনিটির রাজনৈতিক চাপ এবং সংঘাতের মুখে বেঁচে থাকবার স্ট্র্যাটেজী তৈরি করবার চেষ্টা। এই প্রক্রিয়ায় পূর্ববাংলার বাসিন্দারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের আইন এবং কৃষিজীবি সমাজের প্রাক্সিসের (প্রচলিত প্রথা) সম্মুখিন হয়ে আবিস্কার এবং উদ্ভাবন করেছে প্রথা, সমাজের বিধি, পিতৃপুরুষের কানুন। (১) এই আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনে ক্রিয়াশীল গোটা বাঙালি সমাজের ডিসকোর্সের ভাষা, নির্দিষ্ট অর্থে পৃথক সমাজের নিজস্ব বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা। আবার, নৈতিক অর্থনীতিতে পরস্পর প্রবিষ্ট উৎপাদনের সামাজিক এবং টেকনিক্যাল ব্যবস্থাবলি, যার মধ্যে উচ্চারিত সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং পারস্পরিক বিভিন্ন সম্পর্ক। (২) বাঙালি কৃষক সমাজের ধান পাট উৎপাদন, বাজারের সন্ধান, উৎপাদন বাজারের ওপর কর্তৃত্বহীনতা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং শোষণ, কৃষক সমাজের ঋণগ্রস্ততা এবং দুর্যোগ মোকাবিলার বিন্যাসের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং পারস্পরিক সহমর্মিতার অর্থ খোঁজার মধ্যে দিয়ে উপনিবেশে বিস্তৃত হয়েছে ধনতান্ত্রিক বাজার এবং এই বাজারের প্রচণ্ড অভিগাত পড়েছে কমিউনিটির মূল্যবোধ এবং প্রত্যাশার ক্ষেত্রে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের এজেন্টদের, আমলাদের ব্যবহারিবিধি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব সম্বন্ধে কৃষক সমাজে একটি ধারণা তৈরি করেছে, রাষ্ট্রীয়তা সম্বন্ধে তৈরি করেছে এক ধরনের লোকজ বোধ এবং প্রত্যাশা। রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় এ ধরনের লোকজ বোধের অবস্থান খুবই জরুরি একটি বিষয়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রান্তে অবস্থিত কৃষিজীবী জনসমষ্টি দরিদ্র, সামাজিক নিরাপত্তা এই কমিউনিটিতে একটি কেন্দ্রিক সমস্যা, সেজন্য রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়াসমূহে এই ঝুঁকির বোধ এবং যেসব প্রতিষ্ঠান এসব ঝুঁকির দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের বিবেচনা রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে দোলায়িত জাতীয় রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং কৃষক উৎপাদনের রাজনৈতিক অর্থনীতির নির্দেশনা; এর মধ্যে সোচ্চার উন্নয়নের জাতীয় ডিসকোর্স এবং স্থানিক সংগ্রাম: এই ডিসকোর্স এবং সংগ্রাম জনপ্রীতির সুযোগ-সুবিধার চাহিদা এবং সংজ্ঞা নিয়ে।

দুই

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্র। রাষ্ট্রকে ধরে নেয়া হয়েছে কতকগুলো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বৈধ যোগানদার এবং এই জন্যই রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায় করার বৈধ অধিকার আছে। রাষ্ট্রের এই যোগানদার এবং রাজস্ব আদায়ের ভূমিকা থেকে তৈরি হয়েছে একসার প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক এবং আইনানুগ সম্পর্কসমূহ; এসব সম্পর্ক রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে ক্রিয়াশীল, আবার এসব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যকার স্বতন্ত্রীকরণ : এই স্বতন্ত্রীকরণ বাঙালি সমাজে রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিচালনা ও বোঝার জন্য খুবই জরুরি। উন্নত দেশে, অর্থনৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে স্বতন্ত্রতা বিদ্যমান। সিভিল সমাজ উন্নত, বিভিন্ন এবং প্রতিষ্ঠানসম্পন্ন। ক্ষমতার সম্পর্কের মাধ্যম হচ্ছে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ ফর্ম, প্রক্রিয়া এবং প্রয়োজন, এসবের মধ্যে দিয়ে সামাজিক পুনরুৎপাদন ঘটে থাকে এবং তৈরি করে রাষ্ট্র, অর্থনীতি এবং সিভিল সমাজের মধ্যকার জটিল সম্পর্ক সূত্র। এভাবে তৈরি হতে থাকে সম্মতি-ভিত্তিকতার সামাজিক আবহাওয়া, যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক এবং প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক হয় না, বিতর্ক এবং মতান্তর হয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে : এই আবহাওয়ায় রাষ্ট্র হয়ে ওঠে সর্বজনীন সম্পন্ন এবং রাষ্ট্রের মধ্যে প্রকাশবহ একটি কর্তৃত্বের জন্ম হয়, যে কর্তৃত্ব সামাজিকভাবে গ্রাহ্য ও রাজনৈতিক এবং শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে স্বতন্ত্র। রাষ্ট্র কর্তৃত্বের এই ধারণাটি বিশেষ এবং এই প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতাকে প্রদান করে বৈধতা এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজের মধ্যকার স্বতন্ত্রতা করে সম্পন্ন। কিন্তু বাংলাদেশে বৃটিশ এবং পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে তৈরি হয়েছে দুধরনের সামাজিক এবং রাজনৈতিক পুনরুৎপাদন। এই পুনরুৎপাদনে রাষ্ট্র হচ্ছে : ক. সংরক্ষক এবং অভিভাবক (ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অধিকাংশ চিন্তার ভিত্তি এই রাজনৈতিক ঐতিহ্য) এবং রাষ্ট্র হচ্ছে, খ. জবরদস্তি এবং নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যবস্থা, যে-ব্যবস্থা সামাজিক সম্পর্কের মূল পর্যন্ত বিস্তৃত (এই ব্যবস্থার ভিত্তি এই রাজনৈতিক ঐতিহ্য)। এই পরিসরে রাষ্ট্রের লক্ষ্য বৈধতার সার্বিকতা অন্বেষণ করা, এবং এই অন্বেষণ রাজনীতি এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রে। এখানেই সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সমস্যা: সমাজের উপর সার্বিক কর্তৃত্ব কিংবা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। (৩) রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের অর্থ রাষ্ট্র-ক্ষমতা পরিচালনা। এই পরিচালনার অর্থ সিভিল সমাজের ওপর অণুপুভূ প্রভুত্ব বিস্তার নয়। এক্ষেত্রে একটি সমস্যা সক্রিয়। ঔপনিবেশিক আমলে, পূর্ববাংলার সমাজের নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছে, এ ভাবে নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছে, এভাবে সমাজের সার্বভৌমত্ব রাজনৈতিকতা পেয়েছে এবং সমাজের সার্বভৌমত্ব সম্মুখীন

হয়েছে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর, এ ক্ষেত্রে সমস্যার দুটি ফর্ম তৈরি হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে : বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা সমাজের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে : সমাজের সার্বভৌমত্বের মধ্যে ক্রিয়াশীল সিভিল সমাজের বোধ নিষ্ক্রিয় করা এবং রাষ্ট্রকে সর্বেশ্বর করা। অন্যপক্ষে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব-বিরোধী বিভিন্ন বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলো সিভিল সমাজকে রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হিসেবে ব্যবহার করার দরুন : ক. রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হয়েছে, খ. এই সংঘাতে সিভিল সমাজ দুর্বল এবং খণ্ডীকৃত হয়েছে, গ. রাষ্ট্রের "নির্যাতনকারী" কর্তৃত্ব শক্তিশালী হয়েছে এবং ঘ. রাষ্ট্রের মতাদর্শ বিতর্কিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে সমাজের ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তনের মৌল নির্ধারকগুলো বিবেচনা দরকার। গ্রামাঞ্চলে, কৃষক সমাজে সমাজের ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তনের একটি নির্ধারক হচ্ছে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম নিয়ন্ত্রণ এবং অন্য নির্ধারক হচ্ছে গ্রামীণ সমাজের ক্ষেত্রে জ্ঞাতগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ। এই দুই ক্ষেত্র, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর, কৃষি সংস্কারের প্রজেক্টের মাধ্যমে, ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি উৎপাদকদের কাজনা মাফ এবং ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণের কারণে রাষ্ট্রের সঙ্গে জনসমষ্টির সম্পর্ক ভিন্নভাবে নির্ধারিত হয়েছে। ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি উৎপাদকদের খাজনা মাফ করার ফলে একটি বিরাট কৃষক জনসমষ্টি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের আধিপত্য এবং রাষ্ট্রের রাজস্ব ভিত্তির আওতার বাইরে চলে গিয়েছে এবং সমাজের আধিপত্য, বিধি এবং পিতৃপুরুষের কানুনের মধ্যে এই জনসমষ্টি আবদ্ধ হয়েছে। মুজুরির দর, ভাগচাষের ফসল, শ্রমখে বেগার রাষ্ট্রের সংস্কারভিত্তিক এজেন্ডার বাইরে থেকে গেছে।

অন্যপক্ষে ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণের দরুন জ্ঞাতগোষ্ঠীর নামে জমির মালিকানা নামজারী করার মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের সংস্কারমূলক আইনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে কলাকৌশলমূলক সম্পর্ক তৈরির প্রয়াসও সোচ্চার হয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম সংস্কারমূলক প্রয়াস এভাবে নিষ্ক্রিয় হয়েছে : কৃষি উৎপাদকদের গরীব অংশ রাষ্ট্রের রাজস্ব কর্তৃত্বের বাইরে অবস্থান করেছে এবং কৃষি উৎপাদকদের ধনী অংশ রাষ্ট্রকে ব্যবহার করার কৌশল শিখেছে। দুদিক থেকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের মধ্যে সংস্কারের প্রবল তরঙ্গ নিস্তেজ হয়েছে।

বাংলাদেশে, ঔপনিবেশিক-যুদ্ধ উৎসারিত রাষ্ট্রের মতাদর্শিক ফর্ম এভাবে ক্ষীণ হয়েছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতার ভিত্তি সংকীর্ণ। সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ত পরিবর্তমান, এই পরিবর্তমানতায় মিশ্রিত প্রভুত্ব, পদবিন্যাস এবং নিয়ন্ত্রণের নতুন এবং পুরানো ফর্ম সকল। রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেই অভ্যন্তরীণ টেনশন এবং সংঘাতের বিষয়ে পরিণত, এই ক্ষমতা মতাদর্শিক প্রভূত্বের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এবং প্রতিযোগিতা পূর্ব-বিদ্যমান সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক

প্রক্রিয়া প্রধানত প্যাট্রনেজের বিছিন্ন এবং বিভিন্ন জালসূত্রেবদ্ধ, এই সম্পর্কে যুক্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক এলিট গ্রুপগুলো। সিভিল সমাজ অন্তরালবর্তী এবং খণ্ডিত। এর অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রটি দুর্বল। রাষ্ট্রটি রাজস্ব উৎসারণে সক্ষম, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক এলিটদের সেবা আদায়ে নিপুণ। সিভিল সমাজের ওপর সামগ্রিক দাবি বিস্তার না করেও সদ্যউদ্ভূত বাংলাদেশ রাষ্ট্র টিকে থাকতে সক্ষম।

তিন

সদ্যউদ্ভূত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সমস্যা অন্যত্র। প্রথম হচ্ছে : বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যত রচনার পরিকল্পনাবিদরা, প্রধানত জাতির জনক ভেবেছেন রাষ্ট্র রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং জাতি নির্মাণে প্রধান ম্যানেজারিয়াল ভূমিকা পালন করবে। (৪) রাষ্ট্র হচ্ছে জাতির প্রতীক, রাজনৈতিক ভূভাগ, নাগরিকদের আবাসভূমি। উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্র হচ্ছে পরিকল্পনার ক্ষেত্র, পাবলিক লগ্নীর স্থল, এবং সরকারী নির্দেশনার উপায়। এ সকল হচ্ছে উন্নয়নের কেন্দ্র ভিত্তি মূল। (৫) অন্যপক্ষে, বি-ঔপনিবেশিক ক্ষমতার দিক থেকে, স্বাধীনতাত্তোর প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্মাণ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় যুক্ত হওয়ার বোধ জনসমষ্টির মধ্যে নাগরিকত্বের ভিত্তি প্রসারিত করেছে। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বনাম সমাজের সার্বভৌমত্বের বৈপরীত্য কিছু পরিমাণ নিষ্ক্রিয় হয়েছে নাগরিকত্বের বোধ এবং অংশগ্রহণের বোধের ভিত্তি প্রসারিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে।

এক্ষেত্রে দুটি সমস্যা তৈরি হয়েছে। একটি হচ্ছে ঃ সমাজ থেকে রাষ্ট্রের বিছিন্নতা নির্মাণ। অপরটি হচ্ছে : রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশ সমাজের অন্যতম প্রধান প্যারাডক্স হচ্ছে রাষ্ট্র-কাঠামো আরোপিত, পাকিস্তানি (এবং বৃটিশ) উপনিবেশিকতাপ্রসূত। রাষ্ট্র একপক্ষে আরোপিত, অন্যপক্ষে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠান সম্পন্নতা অর্জন করতে পারেনি। রাষ্ট্র এবং সমাজের বিছিন্নতা রাষ্ট্র কর্তৃক অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু এই বিছিন্নতা প্রতিষ্ঠান সম্পন্নতা অর্জনের মধ্যে দিয়েই সম্ভব, যার ভিত্তিতে ক্রিয়াশীল সরকারের একটি মূল্যবোধসম্পন্ন তত্ত্ব, যে-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যে রাষ্ট্র হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থা এবং জননীতি প্রণয়নের চূড়ান্ত সত্তা। সেজন্য রাষ্ট্র ও সমাজের বিছিন্নতা রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যেকার যুক্ততা নির্মাণের ওপর নির্ভরশীল।

এক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা ও প্রয়োজনের দুটি সমস্যা তৈরি হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে রাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক এবং মতাদর্শিক ধারণা তৈরি করা। এ ক্ষেত্রে শেখ মুজিব একটি ব্যক্তিগত শাসনের মডেল নির্মাণ করেছেন। এই মডেলে যুক্ত জ্ঞাতির বোধ : শেখ সাব, মুজিব ভাই, বঙ্গবন্ধুর বোধ (কৃষকদের কাছে তিনি শেখ সাব, অনুসারিদের কাছে তিনি মুজিব ভাই, লোক সাধারণের কাছে তিনি বঙ্গবন্ধু)। এই বোধ আশ্রয় করে রাষ্ট্র পরিচালকদের কাছে পৌঁছানো যায় এবং এই

বোধকে রাষ্ট্রপরিচালক নিজেও মর্যাদা দিয়েছেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে রাষ্ট্রকে একটি সংঘাতের ক্ষেত্র হিসেবে উপস্থাপিত করা, যেখানে বিভিন্ন বিরোধী স্বার্থবহ গ্রুপগুলো নিজেদের সমস্যা মীমাংসা করবে। এক্ষেত্রে শেখ মুজিব আবার একটি প্লুরালিস্ট এবং একটি কর্পোরেটিস্ট মডেল তৈরি করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোকে সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করতে দিয়ে তিনি একটি প্লুরালিস্ট মডেল তৈরি করতে চেয়েছেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি করে তিনি কর্পোরেটিস্ট মডেল তৈরি করতে চেয়েছেন। এ সব মডেলে অন্তরিত রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং রাষ্ট্র প্র্যাকটিসের মধ্যকার টেনশন, এবং এসবে যুক্ত সমাজ নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজ অন্তরণের মধ্যকার টেনশন; সেজন্য এসব বিবিধ টেনশন থেকে তৈরি হয়েছে রাষ্ট্র-যন্ত্র এবং সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক উদ্ভূত বৈপরীত্যমূলক বিভিন্ন ঝোঁক।

শেখ মুজিব ঠিকই বুঝেছিলেন যে, পাবলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের মধ্যে প্রোথিত সমাজ ম্যানেজমেন্টের যুক্তি এবং সমাজ রাজনৈতিক প্রভুত্বের ক্ষেত্রে এলিটদের স্বার্থের মধ্যে মিল নেই, কিংবা প্রভুত্ব কখনোই নিরঙ্কুশ নয়। বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রের যুক্তি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে রাষ্ট্রের স্বরূপ তদন্ত করা দরকার। এই যুক্ততা থেকে নির্মিত হয় গণভুবন, যে-ভুবন হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে নাগরিকত্বের জায়গা। এই জায়গায় অন্তরিত পাবলিক প্রতিষ্ঠান এবং পাবলিক ডিসকোর্স: পাবলিক প্রতিষ্ঠান আরোপিত কিন্তু পাবলিক ডিসকোর্সের একটা প্রধান অংশ শেখ মুজিব এবং তার সঙ্গীরা নিজেরাই নির্মাণ করেছেন: গণতন্ত্র, ভোট, নির্বাচন, স্ব-শাসন, স্বাধীনতা, অংশগ্রহণ প্রত্যয়গুলোর ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে। সেজন্য বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্র তৈরি হয়েছে নির্দিষ্ট অর্থে রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে দিয়ে। রাজনৈতিক অর্থনীতি তৈরি করেছে সঞ্চয় এবং প্রভুত্বের মধ্যেকার কাঠামোগত সম্পর্ক। রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে প্রভূত্ব এবং পুনরুৎপাদনের মধ্যে লড়াই চলেছে অব্যাহতভাবে। (প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের মন্ত্রীপরিষদে বিভিন্ন পলিসি নিয়ে বিতর্ক এবং মেরুকরণ ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে।)

এর ফলে সুশীল শাসনের সমস্যা প্রধান রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে অগ্রাধিকার পেয়েছে। শেখ মুজিবের কাছে এই সুশীল শাসনের সমস্যা প্রতিভাত হয়েছে জনসমষ্টিকে কি করে নাগরিকে পরিণত করা যায়। সে জন্য রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় রাষ্ট্র ক্ষমতার নৈতিক হিসেব-নিকাশ দেখা দিয়েছে। কারণ, এই হিসেব-নিকাশই নাগরিকত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে থাকে। বাংলাদেশের ঐতিহাসিকতা দাবি করেছে সরকারের একটি তত্ত্ব প্রণয়নের, একটি মূল্যবোধভিত্তিক রাষ্ট্রক্ষমতার ভাষা নির্মাণ এবং একটি জাতীয়তা নির্ধারণের। তিনি, শেখ মুজিব, বঙ্গবন্ধু, জাতির জনক বৈধতার দুই আয়তনিক প্রজেক্টের সম্মুখীন হয়েছেন। একটি হচ্ছে : তাঁকে তাঁর রাজত্বকে বৈধ করতে হবে। এক ধরনের স্বীকৃতি পেতে হবে, এক ধরনের

জবাবদিহিতা তৈরি করতে হবে। সেজন্য সংবিধান প্রণয়ন করে তিনি এক ধরনের বৈধতার স্বীকৃতি আদায় করেছেন এবং প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠান করে এক ধরনের জবাবদিহিতা তৈরি করেছেন। অন্যটি হচ্ছে : তাঁকে রাষ্ট্রকে বৈধ করতে হবে সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে। তাঁকে, এক্ষেত্রে, বিভিন্ন, বিছিন্ন, বিরোধী জনসাধারণের মধ্যে নাগরিকত্বের বোধ তৈরি করার জন্য লড়াই করতে হয়েছে। এই সমস্যার তিনি জবাব খুঁজেছেন সরকারের একটি মূল্যবোধভিত্তিক ভাষা নির্মাণে ব্রতী হয়ে। এই ভাষার মধ্যে তিনি যুক্ত করেছেন একপক্ষে কৃষক সমাজের শেখ সাব, অনুসারীদের মুজিব ভাই, লোক সাধারণের বঙ্গবন্ধুর বোধ, অন্যপক্ষে যুক্ত করেছেন আধুনিক রাষ্ট্রের সরকারপ্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধানের বোধ। তিনি ভেবেছেন এই ভাষা সক্ষম হবে নিয়ন্ত্রণ এবং সম্মতির সামাজিক রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে এবং একই সঙ্গে দক্ষ হবে আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করতে। অসম্ভবকে যুক্ত করতে চেয়েছেন তিনি : ঐতিহ্যনির্ভর সমাজের ডিসকোর্সের সঙ্গে তিনি মেলাতে চেয়েছেন রাষ্ট্রের আধুনিক ভাষার জটিলতা। হয়তো অসম্ভবই তাঁর লক্ষ্য, এ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশে রাষ্ট্রের দূরস্পর্শী স্বপ্ন এবং নিরন্তর লড়াই।

মহান জাতির মহান পিতা : অবিস্মরণীয় বঙ্গবন্ধু

সরদার আমজাদ হোসেন

যুগে যুগে বিশ্বে মহামানবের জন্ম হয়েছে। তাঁদের জন্মের কারণেই একটি বিশেষ অঞ্চল, বিশেষ ভাষাভাষি মানুষ, বিশেষ বৈশিষ্ট্য, আদর্শ, নীতি, কৃষ্টি ও পথের সন্ধান পায়। তেমনি একজন মহান ব্যক্তির কারণেই অত্যাচার নিপীড়ন পরপদানত জাতি মুক্তি পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিতা জর্জ ওয়াশিংটন, গণতন্ত্রের মহান কারিগর আব্রাহাম লিঙ্কন, ভারতের জাতির পিতা মোহন দাস করমচাঁন গান্ধী, সোভিয়েত মুক্তিদূত লেনিন, চীনের মুক্তিকামী মানুষের নেতা চেয়ারম্যান মাও সেতুং, ভিয়েতনামের মহান নেতা হোচিমিন, নব্য তুরস্কের নেতা কামাল আতাতুর্ক, মিশরের মুক্তির দূত জামাল আবদুল নাসের, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা বিশ্ব-ইতিহাসের আধুনিক শতাব্দীর বর্ষগুলিতে আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে স্বদেশে-বিদেশে চিরঞ্জবী হয়ে আছেন। মরেও অমর হয়ে আছেন তাঁরা। ঠিক তেমনি রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণকারী মহান বাঙালি জাতির মুক্তিদূত, কোটি কোটি মানুষের হৃদয় জুড়ে যিনি চিরস্মরণীয়, চিরভাস্বর তিনিই আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পৃথিবীর মানচিত্রে কোন দিন এ অঞ্চলে স্বাধীন জাতি বা স্বাধীন দেশ ছিল না। বিংশ শতাব্দীতে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষ সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদের লৌহপ্রাচীর ভেঙ্গে নতুন নতুন স্বাধীন দেশ সৃষ্টি শুরু করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন হিটলারের নাৎসী বাহিনী ও ও মুসোলিনীর ফ্যাসিবাহিনী পরাজিত হয়, তখন বিশ্বের কলোনীগুলি স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে। পৃথিবীর সাদা মানুষের কবল থেকে কালো, বাদামী মানুষগুলি মুক্তির পথ খোঁজে। তখনই বৃটিশ কলোনী ভারতবর্ষ এক দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বৃটেনের এদেশীয় অনুচরদের হাত থেকে মুক্তির জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করে। এ সংগ্রমের ফলে ভারত-উপ-মহাদেশ বৃটিশের কলোনী থেকে মুক্তি লাভ করে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। ভারত ভাগ করে দুটি স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠা হয় ভারত ও পাকিস্তান। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ভৌগলিক সীমারেখা রাষ্ট্রের প্রধান-উপাদান একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের নীতি লঙ্ঘিত হয়ে ভারতের পূর্ব প্রান্তে পূর্ব পাকিস্তান। ও পশ্চিম প্রান্তে পশ্চিম পাকিস্তান, প্রায় দু'হাজার মাইল দূরত্বে দুটি ভিন্ন ভূখন্ডে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি ভিন্ন। বৃটিশ ভারত ভাগের নীতি হিসাবে তৎকালীন শেষ গভর্ণর-জেনারেল লর্ড মাউন্ট ব্যাটন মুসলিম

লীগ নেতা ও পাকিস্তানের দাবির প্রবর্তক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্ব মেনে নিয়ে এ ধরনের একটি দুই-মাথাবিশিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের বহুজাতিক রাষ্ট্রে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তার পরেই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতীয় ভূখন্ডে মুসলিম এবং হিন্দুদের দুটি পৃথক জাতি হিসেবে তার দ্বি-জাতি তত্ত্ব তুলে ধরেন। এতে ধর্মীয় ভাবে উভয় জাতির মধ্যে বিদ্বেষ, বিভেদ এবং পারস্পারিক ভিন্নতা, হিংসা, দ্বন্দ সৃষ্টি করে। ভারত অসংখ্য ধর্ম এবং জাতি সত্তা ও আন্দোলনের প্রচণ্ড ডামডোলে চাপা পড়ে। বৌদ্ধ, শিখ, খৃস্টান, জৈন, পার্শী, ইসলামিয়া, শিয়া ইত্যাদি ধর্ম এবং বর্ণের অধিবাসীরা আত্মপ্রকাশ করার পূর্বেই বৃটিশ সরকার খুবই তাড়াহুড়া করে ভারতের প্রচণ্ড সংঘাত এড়ানোর জন্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কারণ বৃটিশ সরকার তখন ভারতে কর্মরত দশ লক্ষ ইংরেজ নাগরিকের দেশে ফিরিয়ে নেবার জন্য প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন ছিল। ১৯৪৭ সালের বৃটিশ গভর্ণর নিরাপত্তা জনিত কারণে লর্ড মাউন্ট ব্যাটন কর্তৃক ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে লন্ডনে অবস্থিত তৎকালীন যুদ্ধ-পরবর্তী এটলি সরকারের নিকট প্রেরণের জন্য একটি স্বাধীনতা প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করেন। সেই খসড়া প্রস্তাবে বৃহত্তর বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব ছিল। লর্ড মাউন্টব্যটন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রচণ্ড আন্দোলনের মুখে সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বোস উত্থাপিত স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবের অনুচ্ছেদ ভারতের স্বাধীনতা প্রস্তাব থেকে কেটে বাদ দেন। এতে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন দেশের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এ ভাবেই বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন সাময়িক ভাবে থিতিয়ে পড়ে। এ কারণেই বাংলাদেশ পাকিস্তানের একটি অংশ হিসেবে ১৯৪৭ সালের ভারত-বিভাগে স্থান পায়।

বাংলাদেশের জনগণ, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান, ভারত বিভাগের যে নির্বাচন হয় সেখানে ব্যাপকভাবে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে পাকিস্তানের ধর্মীয় বিভাজনের আড়ালে বাঙালিদের গোলাম করে রাখার ষড়যন্ত্র হয়। সে ষড়যন্ত্র ভাষা, কৃষ্টি, সাহিত্য-ঐতিহ্য, অর্থনীতি ও সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। এ ষড়যন্ত্র এবং শোষণের বিরুদ্ধে একক ভাবে নেতৃত্ব দান করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি রুখে দাঁড়ায়। তেইশ বছর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে। তারপর তাঁর আহ্বানে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদান করেন। এ ভাবেই বাঙালির রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয় এবং তিনি ১৯৭১- এর ২৫ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর পরই মধ্যরাতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে তিনি জাতিকে সংগঠিত করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং জাতি সে নির্বাচনে তাঁর প্রণীত বাঙালির মুক্তি সনদ ৬ দফা কর্মসূচির লক্ষ্যে ভোট দান কর ও তৎকালীন পাক প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন না ঢাকায় ১৯৭১-এর সাতই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সমগ্র বাঙালি

জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতার দিকে, মুক্তিযুদ্ধের দিকে, সুদৃঢ় ভাবে এগিয়ে দেয়। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মহান পিতা। আর তাঁরই আহ্বানে বাঙালি জাতি নয়-মাসব্যাপী রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দখলদার নিষ্ঠুর পাক-বাহিনীর উপর বিজয়ী হয়। এই যুদ্ধে ৩০ লক্ষ বাঙালি পুরুষ মৃত্যুবরণ করেন এবং আড়াই লক্ষ মহিলা তাঁর সম্ভ্রম বিসর্জন দেন।

লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরার নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের যৌথ কমান্ড পাকিস্তানিদের বাংলাদেশের মাটিতে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। সে কারণেই বাঙালিও স্বাধীনতা-প্রেমিক জাতি হিসেবে এক মহান জাতি। ইতিহাসের যথাযথ মূল্যায়নের জন্যই একথা স্মরণ করতে হয় যে, প্রতিবেশী বন্ধু-রাষ্ট্র ভারতের সহায়তা, সহযোগিতা এবং যুদ্ধের শেষ দুই-সপ্তাহ বাংলাদেশ ভারতের যৌথ-বাহিনীর প্রত্যক্ষ সামরিক সহযোগিতায় পাকিস্তান-বাহিনী পরাস্ত হয়। ১১ হাজার ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেয়। এ সময় ভারত বাংলাদেশ যৌথ-কমান্ডের প্রধান ও ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার (G.O.C) লেফটেন্যান্ট জেনালের জগজিৎ সিংহ অরোরার বিচক্ষণ ও সাহসী যুদ্ধ-পরিচালনায় বাঙালির বিজয় পূর্ণতা পায়। তাই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ইতহিাসের চির-ভাস্বর হয়ে রইবেন। এ মহান যোদ্ধা, পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলে সই করেন। ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও সে দেশের জনগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্ভব ছিল না– একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট কৃতজ্ঞ জাতি হিসাবে ইতিহাসের এ অংশটুকু আমাদের কাছে চির-স্মরণীয় হয়ে রইবে। সুতরাং ১৯৪৭ সালে বাঙালির যে স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণ হয়নি, তা ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বমানচিত্রে এক নতুন জাতির অভ্যুদয়ের মাধ্যমে বাস্তবে পরিণত হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির স্বাধীনতা সাধ পূরণ হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সারা বিশ্বে বাঙালি জাতির পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছে। জাতিসংঘে বিশ্বের ১৮৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে সদস্যভুক্ত হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের একজন প্রয়াত পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিলেটের সুসন্তান হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতিত্ব করার সম্মান অর্জন করেছেন। এ সম্মান বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার পর পর জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত করানোর জন্যই। স্বাধীন বাংলার মানচিত্র, স্বাধীন দেশের পতাকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতির বাঙালির সংস্কৃতি, সাহিত্য, কৃষ্টি বিশ্ববাসির নিকট তুলে ধরা সম্ভব হয়েছিল শুধু বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ সংগ্রাম এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির স্বাধীনতা লাভের পর জাতির আত্মপরিচয় বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে; পাশাপাশি যাঁরা বাঙালি জাতিকে শাসন ও শোষণ করেছে তাঁদের এক কাতারে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক

ক্ষেত্রে যথা জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, জোট, নিরপেক্ষ, সার্ক, ও. আই. সি., ডব্লু টি. ও. প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান প্রতিনিয়ত দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করেছে। আর শিল্প-বাণিজ্য, বৈদেশিক-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি, বিনিয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশের সন্তানদের সম্মুখে বিশ্বের দ্বার উদঘাঠিত হয়েছে। দেশে দেশে বাঙালি সন্তানেরা ছড়িয়ে পড়েছে নিজেদের ভাগ্য-অন্বেষণে। তারা আজ কত দুঃসাহসী হয়েছে তা ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে নৌকায় স্পেন, ইতালি যাওয়ার পরিকল্পনা থেকে উপলব্ধি করি। প্রায় ৩০ লক্ষ বাঙালি আজ বৈদেশিক মুদ্রা যোগান দিয়ে দেশের অর্থনৈতিকে শক্তিশালী করছে। বাংলাদেশের পোশাক এখন ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকার বাজারে সুনামের সাথে রপ্তানি হচ্ছে।

বাঙালি জাতির যে মহান পিতার জন্য আজ বাঙালি মুক্ত, স্বাধীন সেই মহান পিতাকে–জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালো রাতে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকান্ড ছিল কোন ব্যক্তির হত্যাকন্ড নয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে জাতিকে হত্যা করার নীল-নক্সা বাস্তবায়িত করা হয়। যে আদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়, উদার গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল, ধর্ম-নিরপেক্ষ একটি জাতির জন্ম হয়, সেই সকল আদর্শের প্রতি জাতির আনুগত্য ও নিষ্ঠা মুছে ফেলার সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র অনুযায়ী জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়। একই বছর ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এম মনসুর আলী ও এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানকে বন্দী অবস্থায় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এসব হত্যাকান্ড ছিল গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার এক বিশাল পরিকল্পনা।

১৫ আগষ্ট থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতি, সমাজ ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, লক্ষ্য, চেতনার উপর ঘাতকের দল এবং ক্ষমতা-লিপ্সু ষড়যন্ত্রকারী ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী কলঙ্কের কালি লেপন করে। তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে এবং চার জাতীয় নেতাকে বাঙালি জাতি ও মুক্তিযোদ্ধা জনগণের স্মৃতি থেকে মুছে পেলার দীর্ঘমেয়াদি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সেই ধারাবাহিকতায় দেশে আজ স্বাধীনতা-বিরোধী জোটের খারেদ-নিজামী সরকার এদেশের ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাল্টানোর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। এমন কি মুক্তিযুদ্ধের প্রগতিশীল গোষ্ঠী, ব্যক্তি এবং স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী এবং সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনার উপর প্রকাশ্য সভার প্রাঙ্গনে গ্রেনেড হামলায় চালায় গত বছর ২১ আগস্ট। রাজনীতিক দলের জনসভায়, বিদেশি কুটনীতিক বৃটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর উপর সিলেটের শাহজালাল মসজিদে নামাজান্তে বের হয়ে আসার সময়, তার পূন্য মাজার জিয়ারতের সময়, গোপালগঞ্জের খৃস্টান ধর্মালম্বীদের গীর্জায়, পহেলা

বৈশাখের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, যশোরে উদিচি শিল্পী গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, ময়মনসিংহের চারটি সিনেমা হলে, বোমা হামলায় শত শত মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। সিলেটে জেলাওয়ারী সব থেকে বেশি বোমা হামলা হয়, আওয়ামী লীগ সভানত্রেী সংসদে বিরোধী দলের নেত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা জননেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, সিলেটের মেয়ের কামরান চৌধুরীর উপর বোমা হামলায় হয়। সর্বশেষ ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসের ২৭ তারিখে প্রখ্যাত কুটনীতিবিদ ও সাবেক অর্থমন্ত্রী এস. এ. এম. এস. কিবরিয়াকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে তাঁর নির্বাচনী এলাকায় গ্রেনেড-হামলা করে হত্যা করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এই হত্যাকান্ড প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কালো তালিকাভুক্ত দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এখন নতুন এক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সন্ত্রাস দমনে সন্ত্রাসীদের "ক্রস-ফায়ার"– এ হত্যা করে তাদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে যারা জীবিত সন্ত্রাসী তারা গা' ঢাকা দিয়েছে। স্বাধীনতা-বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে দেশে-বিদেশে। তাই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এ ধরনের অমানুষিক হত্যাকান্ড বন্ধ দেশের প্রতিষ্ঠিত আইন আদালতের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধান, দুর্নীতি পরায়নদের পাকড়াও করতে হবে।

জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন দেশের দরিদ্র মানুষের মুক্তি। তিনি চেয়েছিলেন এক শোষণহীন দেশ– যে দেশে শোষণ-বঞ্চনা, ক্ষুধা-জরা-ব্যাধি থেকে মুক্ত হবে। তিনি চেয়েছিলেন দুঃখী-দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ ছিল সোনার বাংলাদেশ, যে-দেশের মানুষ হবে সুখী সমৃদ্ধশালী স্বালম্বী। তাই ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে এ দেশকে বিশ্বের পিছিয়ে-পড়া, দরিদ্র, ঋণ-জর্জরিত দেশ হিসেবে পরিচিত করেছে। ধর্মের নামে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করে বাঙালি প্রতারিত হয়েছে। তাই নতুন কোন জঙ্গী ধর্ম-ব্যবসায়ী বা ধর্মের নামে ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের ষড়যন্ত্র থেকে বাঙালি সজাগ ও সচেতন। তা তারা মেনে নেবে না। আজো বঙ্গবন্ধুর সেই বজ্রকণ্ঠে ৭ মার্চ (১৯৭১)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ– এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম–তৎকালীন স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামীদের কানে বাজে। যতদিন পদ্মা মেঘানা যমুনা থাকবে, ততদিন বঙ্গবন্ধু বাঙালির হৃদয় জুড়ে থাকবেন। ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্মৃতি কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাতির মহান পিতা এবং তাঁর অবদান বাঙালি জাতির হৃদয়ে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লীডার

কামাল লোহানী

লীডার, আজ আপনি নেই। দেশটাকে খুবলে খাচ্ছে শিয়াল শকুনেরা। লুটেপুটে খাচ্ছে লোভী অর্থ-পিশাচ কিছু তাবেদার এই দুঃসময়ে। বঙ্গবন্ধু, রাজাকার-আলবদর যারা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরোধিতাই নয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং ইসরাইলী জায়নবাদের সহযোগিতায় জন্মকেই স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল, সেই যুদ্ধাপরাধী জামাত এই বাংলার সবুজ বুকে এখন শাসনের দন্ড ঘোরাচ্ছে ঐ তথাকথিত ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং জাতীয়তাবাদী বিশ্বাসঘাতক বিএনপি'র বদৌলতে। এরাই মুক্তিযুদ্ধের লাখকা শহীদের অমূল্য প্রাণ এবং বিপুল রক্তস্রোতে সৃষ্ট এই রক্তোৎপল বাংলাদেশের অবমাননা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছে না। প্রতিটি মুহূর্তে ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্যে মহীয়ান সংগ্রামের উজ্জ্বল দেদীপ্যমান অধ্যায়কে একেবারে মুছে ফেলতে ব্যাপক ষড়যন্ত্র করে চলেছে। আমরাও তখন যেন চোখ বন্ধ করে, যা চলছে তাকে মেনে নিয়ে নির্বিঘ্নে স্রোতের জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলেছি; বুক ঠুকে বলতে পারছি না, এই অবস্থা আমরা মানি না। লিডার, দুঃসহ যন্ত্রণায় কাতর কোটি কোটি বাঙালি আজ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী অপশক্তি সহিংস ধর্মবাজির উন্মত্ততার শিকারে পরিণত হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যা করছে নিরবধি। আমরা এই যুদ্ধাপরাধী জামাত-শিবির, রাজাকার, আলবদর, আল-শামস নামের ঘাতক-দালাল নরপিশাচগুলোর কোন বিচার করতে পারি নি।... ওরা বিশেষ একটি রাজনৈতিক মহলের আশ্রয-প্রশয় পেয়ে আজ এমনি 'সাহসে উদ্দীপ্ত' যে শুধু নিজেরাই সরব ও সক্রিয় হয়েছে তাই নয়, যুদ্ধাপরাধকে জায়েজ করে নেয়ার জন্য রাজনীতির দৈনন্দিন আন্দোলন উচ্চকিত। ধর্মকে আবরণ হিসেবে ব্যবহার করে ওরা দেশময় নিজেদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় সর্বস্ব ত্যাগ করে সক্রিয় হয়েছে। বিভিন্ন ইসলামী নাম ধারণ করে কত যে সংস্থা, সংগঠন, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, তার কোন হিসেবে নেই। লাখো কোটি ডলার তহবিলে মজুদ ওদের। ওরা সন্ত্রাসের ধর্মান্ধতা অথবা ধর্মান্ধতার সন্ত্রাস কায়েম করেছে। নিরপরাধ এবং রাজনীতিতে প্রগতিমনস্ক মানুষ হত্যা, অপহরণ করছে প্রথম পদ্ধতিতে। আর সরলপ্রাণ বাঙালি মানসকে ধর্মীয় বিভ্রান্তির বেড়াজালে ঘিরে নেশাগ্রস্ত করে নাস্তানাবুদ করে ফেলছে।

লীডার, আপনার সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম-নিরপেক্ষতার সোনার বাংলা যেন গড়ে উঠতে না পারে, তারই যে মহড়া দেখেছিলাম একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এবং পাকিস্তানের তেইশ বছরে, তারই প্রেতাত্মা চেপে বসেছে আজকের শাসক-গোষ্ঠীর কাঁধে–তারাই এখন বাংলাদেশী জাতিত্ববোধ এবং ধর্মান্ধতাকে পুঁজি করে দেশ ও জনগণকেই গ্রাস করতে চাইছে। ওরা বিপুল রক্তখরচে অর্জিত স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গোড়া কেটে 'ইসলামী জামহুরিয়াত' প্রতিষ্ঠার খোয়াব দেখছে। বাংলাদেশ যে সংবিধান প্রণয়ন করেছিল গণতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রের চার মূল স্তম্ভের উপর, তাকে জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল এইচ, এম, এরশাদ বর্জন করেছেন। প্রথমজন 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানের রাহিম'–পবিত্র গ্রন্থে সংযোজিত করে ধর্মনিরপেক্ষতার অবসান ঘটিয়েছে। দ্বিতীয় সামরিক কর্মকর্তা 'ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম' করে ছেড়েছেন। ফলে সমাজতন্ত্রও গোল্লায় গেছে, আর গণতন্ত্রের তো কোন বালাই নেই। এখন ওদেরই হাতে ক্ষমতা। জামাতের আমীর, একাত্তরের ঘাতক-প্রধান ছাত্রনেতা মতিউর রহমান নিজামী এবং জামায়াত সম্পাদক আলী আহসান আর মোজাহিদ মাত্র কটি আসনে জয়ী হয়ে দুটি পূর্ণমন্ত্রীর খায়েস পূরণ করেছেন। গোলাম আজমকে অপসারণ করেছে, কারণ তরুণদের মতই জয়ী হয়েছিল। আব্বাস আলী খানতো 'বেচারা', আফসোসেই দেহত্যাগ করলেন।.... নিজামী কৃষিকে খতম করে এখন শিল্পমন্ত্রী। তাই আদমজী থেকে শুরু করে আজ কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গরীব গতর-খাটানো শ্রমিকরা সব বেকার হচ্ছে। ভূখা-নাঙ্গা এই মানুষগুলোকে জানে মারার কী কুশলী চক্রান্তই না এটেছে! নিজেদের শিল্প- উদ্যোগকে অবহেলা করে বিদেশিদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

লীডার, যে দেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম আপনার নেতৃত্বে, সেই দেশের দুরবস্থা দেখে অস্থির চিত্তে কেন জানি না আজও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে আমরা পারিনি। অথচ, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ-শক্তি আজ মার্কিনী মদদে গোটা জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, শিক্ষা-শিল্প, অর্থনীতি-রাজনীতি সব কব্জা করতে চাইছে। বাঙালির শত সহস্র বছরের গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্য এবং ইতিহাসকে নির্মূল করতে চাইছে, বিলুপ্তির চক্রান্ত এটেছে। ক্রমশ বদলে ফেলছে বাংলার মানুষের চরিত্রকে। বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের উদয়কে ওরা কোনভাবেই মেনে নিতে চায়নি বলেইতো লীডার, অব্যাহত চক্রান্তের বেড়াজালে খোন্দকার মোশতাক আর রশীদ, ফারুক, ডালিম, নূর, শাহরিয়ার আর মহিউদ্দিনরা ঘৃণ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞে সপরিবারের আপনাকে হত্যা করেছিল। আপনাকে হথ্যা করে দেশকে বিপন্নাবস্থায় ফেলে দিয়ে ফায়দা লোটার যে ষড়যন্ত্র করেছিল, তারই বাস্তবায়ন করল। এই বিপন্নতায় ঠেলে দিতে চেয়েছিল বলেই তো একাত্তরে ডিসেম্বরের শেষ দিকে যখন ওরা বুঝতে পারল বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে ঠেকানো অসম্ভব, তখনই তারা মরিয়া হয়ে উঠল– বাংলাদেশ মুক্ত হলেও রাষ্ট্র

পরিচালনা ব্যবস্থা যেন গড়ে তুলতে না পারে, তার জন্য বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনক্সা তৈরি করেছিল। সেই ঘৃণ্য হত্যা-পরিকল্পনা সফল না হওয়ায় ওরা ওৎ পেতে ছিল কখন মিলবে সেই মোক্ষম মুহূর্ত? অবশেষে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সুযোগ পেয়ে গেল সেই মুশতাক। ১৯৪৯ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গটিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ সৃষ্টিকালে আপনাকে প্রথম যুগ্ম-সম্পাদক করায় সে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং মজলুম জননেতার সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু আপনার প্রতি মওলানার অপরিসীম বিশ্বাস ও আস্থা থাকায় মুশতাক শত তর্কেও তাঁকে সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারিনি।... ইতিহাসের জঘন্যতম ও নৃশংস রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার এই মর্মান্তিক ঘটনা নিকৃষ্টতম হত্যাকান্ড হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে এবং থাকবে এবং 'ইতিহাস' নামক শব্দটি যতদিন উচ্চারিত হবে, ততদিন এই পৈশাচিক ঘটনার উল্লেখ থাকবেই।

সত্যি কথা বলতে কি লীডার, ঐ যে রাজনীতির পট পরিবর্তন হয়ে গেল, ওটা মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত বাংলাদেশ এবং এ অঞ্চলের বাঙালি নাগরিকদের জন্যে বয়ে আনল এক নির্মম পরিহাস। বাঙালি জাতির কপালে কলঙ্ক লেপন করেও যেন হলো না, আরো কুৎসিত মীরজাফরদের বদৌলতে বাংলার প্রান্তরে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ ক্রমশ: উৎকীর্ণ হতে থাকলো। আমরা তো লীডার পাকিস্তানি সামরিক শাসকচক্রের রাজনৈতিক লিপ্সার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম, কিন্তু পাকিস্তানে প্রশিক্ষিত বাঙালি অফিসারদের মার্শাল ল'র কবলে পড়লাম নতুন করে। এই কালের সমর নায়করা– ক্যু' করতে লাগলেন, তারা প্রায়ই মুক্তিযুদ্ধ-ফেরত যেমন, খালেদ মোশাররফ, জিয়াউর রহমান, জেনারেল মঞ্জুর। এছাড়া এক জিয়ার আমলেই নাকি ছোট বড় ১৭টি ক্যু না হলেও বিদ্রোহ বা মতানৈক্যের ঘটনায় বহু মুক্তিযোদ্ধাই প্রাণ দিয়েছেন। যে জিয়া সেনা-বিদ্রোহের সময় ঐ ৭৫ নভেম্বর গ্রেফতার হয়েছিলেন, কর্ণিল (অব) তাহের তাঁকে মুক্ত করে এনেছিলেন সিপাহী-জনতার বিপ্লবের নায়ক হিসেবে এবং জিয়াকেই ক্ষমতায় বসালেন, সেই জিয়াউর রহমান ক্ষমতার দণ্ড হাতে পেয়ে তার ত্রাতা তাহেরকেই প্রথম শূলে চড়ালেন এবং মার্কিনী পুতুল খোন্দকার মুশতাকের '১৫ আগস্টের হিরোদের বিদেশ পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আর মুশতাকের কোন শাস্তিই হলো না।

সেই থেকেই, লীডার, কত যে মুক্তিযোদ্ধা সেনাসদস্য প্রাণ হারালেন অপঘাতে, তার হিসেব নেই। শেষ পর্যন্ত কিন্তু জিয়াউর রহমানকেও হত্যারই শিকার হতে হলো। যারা মারল জিয়াকে তারাই আবার জিয়া-হত্যার অপরাধে বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রতিভাদীপ্ত সমর নায়ক তৎকালীন চট্টগ্রাম সেনানিবাসের জিওসি জেনারেল মঞ্জুরসহ বহু মুক্তিসেনা অফিসারকে কোর্ট মার্শালে চড়ালো তৎকালীন সেনাধ্যক্ষ জেনালের এইচ. এম. এরশাদ। তারপর নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তারকে সরিয়ে তিনিই হলেন 'দন্ডমুন্ডের কর্তা'। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মতন প্রায় দশক জুড়ে যে সব কীর্তি-কাহিনী এবং কেলেঙ্কারী ঘটিয়েছেন, তাতে আপনার

স্বপ্নে দেখা বাংলাদেশকে বিশ্বে হতমান করেছে। জনগণ শিকার হয়েছে স্বেচ্ছাচারের এবং নূর হোসেনকে প্রাণ দিতে হয়েছে গণতন্ত্র বাঁচাতে। ছাত্রনেতা বসুনিয়া প্রাণ দিয়েছেন মিছিলে, ডা. মিলন চিরতরে হারিয়ে গেছেন স্বৈরাচারের চোরা-গোপ্তা গুলিতে। এমনই কত যে প্রাণ হয়েছে বলিদান– তারও হিসেব নেই।

দেশের জনগণ রাজপথে নেমে এসেছিল, লীডার, সেই অসহযোগ আন্দোলনের অগ্নিক্ষরা দিনে। দিনরাত পাহারা দিয়েছে সম্মিলিত রাজনৈতিক শক্তির হয়ে, স্বৈরাচারী-স্বেচ্ছাচারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল এরশাদ যেন কোন ফাঁক-ফোকর দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে না যায়।... সেই আপনার সোনার বাংলা প্রিয় জনগণই গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আত্মত্যাগ করলেন। কিন্তু লীডার, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাসদ, কমিউনিস্ট পার্টি, ওয়ার্কাস পার্টি এমনকি জামাতকেও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হলো তিন জোটের রূপরেখা হিসেবে। অথচ, যুদ্ধাপরাধী হিসেবে রাজনৈতিকভাবে আপনি ওদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। কিন্তু বিএনপি নির্বাচনে জিতে যে অনাচার করেছিল সেই দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনায় যাব না। তারপর জামাত কৌশলে পা ছড়িয়ে রাজনীতির আঙ্গিনায় বসে পানের ডিব্বা খুলে ক্রমেই নিজেদের ঠোঁট লাল করে ফেলল মানুষের লহুতে। আওয়ামী লীগ এলো নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে যেন সেই আতঙ্কই মানুষকে তাড়া করে ফিরতে লাগল। জামাত আর বিএনপি'র চোরাগোপ্তা হত্যার অভিযান আর প্রশাসনকে ক্রমশঃ জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলার সুকৌশল চক্রান্ত ফললাভ করলো এবং জামাত ও ছোট ছোট ইসলামী গ্রুপকে স্যাঙ্গাত কোরে বিএনপি মানুষের মনকে বিষিয়ে তুলল। আর চক্রান্তের সেই কৌশলে আঁতাত করে আওয়ামী লীগকে পরাজিত করল ২০০১ সালে জাতীয় নির্বাচনে, বিএনপি জামাত-ই- ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট এবং জাতীয় পার্টি (নাজিউর)– চার-দলীয় জোট নির্মাণ করে দুই-তৃতীয়াংশ আসনের অধিকারী হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করে দিল। কিন্তু যে জামাত সওয়ার হয়েছে ওদের কাঁধে, সে তো নাছোড়বান্দা। ঘাড় মটকাবে প্রথমেই বিএনপি'র তাই করছে। গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাই যদি গ্রাস করতে পারে তবে তো আর কোন বাধা থাকবে না। আর সেই লক্ষ্যেইতো জামাত কৌশলে কাজ করে যাচ্ছে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে বিএনপি-জামাত জোট। চারটি বছরে ওরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে বারবার। জামাত লেগেছে বিএনপি'র বিরুদ্ধে, বিএনপি মারপিট করেছে জামাতের সাথে। ছাত্র শিবির ও ছাত্রদলেরও একই দুরবস্থা। দল নেতারা ঐ সহিংসতার ঘটনাকে যাত তিক্তই হোক, মিলিয়ে দিয়েছেন। বিএনপি জানে জামাতের সাথে সখ্যতা না থাকলে জামাতী নিশ্চিত ভোটগুলো বিএনপি হারাবে, তাই তারা জামাতকে কোনভাবেই ঘাটাতে চায় না। আর এই সুযোগ হাতে পেয়ে জামাত তাদের পরিকল্পিত পথে চলেই উদ্দেশ্য হাসিল করতে তৎপর। লীডার, ওরা আজ আমাদের প্রাণের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে

ইসলামী প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরের জানকোরবান কোশেশ করছে। মন্‌জিলে মকসুদে পৌঁছার পুণ্যে ওরা যত কুৎসিত পন্থা অবলম্বন করতে হোক, করেই মতলব হাসিল করতে উদ্যত।

আজ ওরা– জামাত ও বিএনপি আর ক'টি ক্ষুদ্র উগ্রপন্থী ইসলামী গোষ্ঠী মিলে ধর্মকে অবলম্বন করে সরলপ্রাণ বাঙালি মানুষকে কেবল বিভ্রান্তই করছে না, তাদের বাধ্য করছে ধর্মীয় অনুশাসনের অজুহাতে নিজেদের খামখেয়ালী নির্দেশাবলি মেনে চলার জন্য। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যা খুশি তাই বলছে, ব্রুট মেজরিটির বদৌলতে যেমন খুশি আইন প্রণয়ন করছে। যে আইনের প্রয়োজন গোটা জাতি চাইছে, তার সৃষ্টিতে টালবাহানা দেখিয়ে, এমন কি বিচার বিভাগকে পর্যন্ত হতমান একপেশে করে ফেলেছে। এই পৈশাচিক শক্তির নির্মম আচরণ দেশকে পৃথিবীর সামনে 'খেলো' করে ছেড়েছে, জনগণকে শান্তি, স্বস্তি এবং শৃঙ্খলা থেকে বিপন্নতা, বিপর্যয় এবং দুঃসময়ের মহাসঙ্কটে ফেলে দিয়েছে। জনগণের কোন দাবিই আজ গ্রাহ্য নয় এই ক্ষমতাসীন লোভাতুর 'রাজনৈতিক' ধর্ম-শক্তির। বিগত চার বচরে লীডার, বোম।, গ্রেনেড নিক্ষেপের ভয়াবহ ইতিহাস তৈরি করেছে। ধর্ম-কর্মস্থানে বোমা, বিদেশি রাষ্ট্রদূতকে আক্রমণ সৎ ও দেশপ্রেমিক বাঙালি রাজনীতিক নেতাদের হত্যা, শেখ হাসিনাকে হত্যার নিরন্তর অপচেষ্টা, আদালত গৃহে হামলা, সিনেমা হলে বিস্ফোরণ, বাংলার ঐতিহাসিক যাত্রা মন্ডপে বোমা নিক্ষেপ' উদীচী, কমিউনিস্ট পার্টির পল্টন সমাবেশ, নববর্ষে রমনার বটমূলে মানুষ হত্যা, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত হত্যাকান্ড, এমনকি সারাদেশে একই সময়ে ৪৯৩টি বোমা বিস্ফোরণ করে তারা কতখানি মজবুত ভিতে দাঁড়িয়ে যখন খুশি তখনই যে এই বাংলায় যেকোন ধরনের তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে গোটা বিশ্বকে চমকে দিতে পারে, তাও বুঝিয়ে দিয়েছে।

কী দূর্বিসহ যন্ত্রণার মধ্যেই না কাটাচ্ছি দিন, আপনার সেই প্রিয়জন– বাঙালি জনসাধারণ, তা বলতে শরীর ঘৃণায় কুচকে ওঠে। লীডার, শুনে অবাক হবেন, আমাদের প্রত্যাশিত সেই একাত্তরের বাংলা আমরা গড়তে আজও পারিনি। আপনার নারকীয় হত্যার পর আমাদের গোটা লড়াকু জাতিটাই যেন কেমন স্তিমিত এবং ভীত হয়ে গিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, সাহস আমরা ফিরে পেয়েছি, না হলে এরশাদের স্বৈরশাসনকে উৎখাত করতাম কি করে? জেনারেল জিয়ার উত্তরাধিকারিনী তাঁরই 'লাজনম্র' স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতা হাতে পেলেন, তখন যে রুদ্রমূর্তিতে আর্বিভূত হলেন তাতে এতদিন তাঁর বিরুদ্ধেও এরশাদের মতনই 'জনতার মঞ্চ' তৈরি করতে হল। সেই যে মানুষের প্রত্যয় জীবনকে আবাহনের, তাও যখন সম্ভব হলো না তখন আবারো সেই 'খানে দজ্জাল' জামাতের দোস্তির বদৌলতে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে, ক্ষমতাসীন হয়েছিল। নাজেল হয়েছে এদেশের মানবজাতির উপর এক নির্মম 'অভিশাপ' হিসেবে। পিশাচ যারা, তারা বেশ আনন্দেই আছে। ক্ষমতার 'লোভ' ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছে

নিজেদের মধ্যে, কিন্তু জাতীয়তাবাদী তথাকথিত গণতন্ত্রমনা নির্বোধদের আচরণে এ দৃশ্য ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠছে: "তোমারে বধিবে যে গোকূলে বাড়িছে সে।" অর্থ্যাৎ যুদ্ধাপরাধী, বাংলাদেশের অভ্যুদয়বিরোধী ঘাতক-দালাল সেই জামাত-শিবির কৌশলে বিনএপি'র ক৭াধে চেপে বসেছে। কিছুতেই নামাতে আর পারছে না। ওরা যে সুযোগ পেলেই 'ঘাড় মটকাবে' সে কথা বুঝেই আমলে নিতে চাইছে না। আর জামাতই-ইসলামীর অবস্থা এমনি হয়েছে– বাঘের ঘাড়ে চেপেছে, নাবতে আর পারছে না। এই সুযোগে জামাতও মতলব এঁটেছে, রক্ত ওদের শুষে নিয়ে দেশে ইসলামী শাসন কায়েম করবেই। সেই পরিকল্পনা করেছে অনেক আগেই। কিন্তু ওরা ক্রমশঃ চর্তুদিকে নিজেদের ঘৃণ্য চক্রান্তের জাল বিছিয়ে চলেছে। ওরা কাউকে যে তোয়াক্কা করছে না এটা আমরা বুঝতেও পারছি না। ওদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে কিংবা সংগ্রাম চালাতে আমরাও ব্যর্থ হয়েছি। তাই ওরা কিন্তু মহা উৎসাহে সক্রিয়, সর্বত্র। এরই মধ্যে লীডার সামনেই জাতীয় নির্বাচন আসছে। ফলে যত ক্রেডিট নিজেদের কোচড়ে ভরা যায়, তার কৌশল এখন থেকেই আটতে শুরু করেছে বিএনপি-জামাত জোট-সরকার।

আর সেই উদ্দেশ্যে এ বছর (২০০৫) নভেম্বর মাসে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা "সার্ক"-এর ত্রয়োত্রশ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত "সার্ক"–এর দুই দশক পূর্ণ হওয়ার সুযোগ নিয়ে জোট-সরকার জাঁকজমকের সঙ্গে এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য গত এক বছর যাবৎ আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। "সুনামী" নামের এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এশিয়ায় যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার কারণে এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যোগ দিতে না পারার কারণে সম্মেলন অনুষ্ঠানের তারিখ দু'বার পিছিয়ে যায়। এ বছর সম্মেলন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার জন্য তারা মরিয়া হয়ে "লবী" করে। কিন্তু মুশকিলটা হলো আহসান উল্লাহ মাস্টার, শাহ এ. এম. এস. কিবরিয়া, আইভী রহমানসহ কত যে অমূল্য প্রাণ নিধন হয়েছে ঘাতক-বোমা আর গ্রেনেড্ বিস্ফোরণে, তার কে হিসেব করবে? বাংলাদেশ-বিরোধী ধর্মান্ধ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি গোষ্ঠী দেশে এমনই জাল বিছিয়েছে যে হত্যাকান্ড সংঘটিত হলেও কোনোটারই কোনো সুষ্ঠু বিচার আজ পর্যন্ত হয়নি। ২০০৪ সালের ২১ অগাস্ট যারা শেখ হাসিনাকে হত্যা করার নীল-নক্সা রচনা করেছিল তাদের সম্পর্কে সরকারি মহলে সাড়া-শব্দ নেই। এই হত্যা-প্রচষ্টোর কোনো কূল- কিনারা আজ পর্যন্ত হয়নি। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার জন্য কে বা কারা অপরাধী তা' চিহ্নিত করতে পারেনি জামাত-বিএনপি সরকার।

লীডার, বিদেশী অথিতিরা কিছুতেই আসতে চাইছিলেন না। কারণ, ১৭ অগাস্ট (২০০৫) বাংলাদেশে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটে গেছে। দেশ জুড়ে একই সঙ্গে একই সময়ে প্রায় ৫০০ বোমা ফাটিয়ে মৌলবাদীরা জানিয়ে দিয়েছে ওরা কতটা পারঙ্গম। কতখানি তাদের শক্তি। এর ফলে বাংলাদেশ ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল,

"সার্ক সম্মেলন" যদি অনুষ্ঠিত না হয়। তাহলে? নানানভাবে দুতিয়ালী করে অবশেষে সবাইকে রাজি করিয়ে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কেমন কোরে হলো, শুনে অবাক হবেন, লীডার। কোন বিদেশি অতিথি রাষ্ট্রীয় সফরে এলে কিংবা কোন উল্লেখযোগ্য দিনের কোন উৎসব আয়োজিত হলে আমরা দেখতাম রাস্তার দু'পাশে শিশু-কিশোররা সংশ্লিষ্ট দেশের পতাকা হাতে নিয়ে অভ্যাগত সম্মানীয় মেহমানকে সুস্বাগতম জানাতো। কিন্তু লীডার, কী তাজ্জব ব্যাপার, সার্ক দেশের নেতৃবন্দ দেখে গেলেন, ঢাকা জনমানব শূন্য। নিরাপত্তা বাহিনীর সশস্ত্র লোক ছাড়া কেউই নেই। এটা নাকি আধুনিকতম নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুকঠিন অর্গল।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারির কথা আমার স্মৃতিতে স্পষ্ট আজও। তেজগাঁ বিমানবন্দর থেকে আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত কী অকল্পনীয় জনসমুদ্রই না প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আপনার আমলেওতো কত বিদেশি অতিথি এসেছেন, তাঁদের এই সোনার বাংলায় স্বাগত জানান হতো রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কচি-কাঁচাদের আন্দোলিত হাতে সে দেশের জাতীয় পতাকায়। কিন্তু আজ জোট সরকারের আমলে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ছয় ছয়জন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এলেন, গেলেন অথচ রাজধানীর রাজপথ মহাশূন্য

লীডার অপনারাই তো বলতেন প্রচলিত কথকতা হিসেব, "ক্ষতের চিকিৎসা না করে ক্ষতস্থানটাকে কেটে ফেলে দেওয়ার কথা ভাবে একেশ্রেণীর নির্বোধ। সেই নির্বুদ্ধিতার প্রমাণই মিলল এবারের সার্ক সম্মেলনে। রাস্তা শূন্য, জনগণ হাটতেও পারবে না। এমনিই ছিল আরো ঝলমল, পুষ্পাঙ্গণ এই ঢাকা। ওরা বাংলাদেশের "পারসুয়েশনে" আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ এবারও খালেদা জিয়ার চেয়ারপাসন হবার কথা ছিল। এটা যে সামনে জাতীয় নির্বাচন রেখে একটা বড় প্রাপ্তি এবং নির্বাচনে প্রভাব ফেলার মতো ওরা মনে করেছে। তার উপর আরেক আবদার বাস্তবায়িত হবার কথা: জেনারেল জিয়াকে সার্কের স্বপ্ন দ্রষ্টা হিসেবে প্রথম 'সার্ক স্বর্ণপদক' দেয়ার প্রস্তাবকে গত জুলাইয়ে ইসলামাবাদের বৈঠকে অনুমোদন করিয়েছে। সুতরাং তাকে পদক দিতেই হবে। দিয়েছেনও। স্মিত হাসির ব্যাপার,এই সুযোগে খালেদা জিয়া পুত্র তারেক রহমানকেও সার্ক মঞ্চে উঠালেন।– এটা ঐ দুটোর সাথে উপরি পাওনা।... সার্ক শেষ। ২০ বছরে যা হয়নি, খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে নাকি তা করবে, এটা উদ্যোক্তাদের কামনা। কিন্তু অতিথিরা কি খবরের কাগজ বা টিভি রিপোর্ট শোনেন নি। যে দেশ চালাতে অক্ষম, তার পক্ষে সাতদেশীয় সংস্থা চালানো কি কোরে সম্ভব হবে? ওদের মনে যে সংকীর্ণতা কাজ করে রাজনীতি হীনতার কারণে তা দিয়ে কি আদৌ আঞ্চলিক সহযোগিতার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব?

বি. এন. পি একজন সেনা মেজরকে অনাকাঙ্খিত ভাবে বাংলাদেশের 'স্বাধীনতার ঘোষক' বলে দাবি করছে। যার কোন রাজনৈতিক অতীত নেই, যে

কেবলই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন বশংবদ সৈনিক হিসেবে ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন কালেও প্রমাণ দিয়েছেন, তাকে অযৌক্তিক অকারণে ইতিহাসের নায়ক হিসেবে জনগণের সামনে জোর করেই দাঁড় করাবার চেষ্টা করে কি কোন লাভ হচ্ছে? এতে যে সত্য, ঘটনা পরম্পরাকেই অস্বীকার করা হচ্ছে, তাও তারা বুঝতে চাইছে না। কারণ এ তো উদ্দেশ্যমুলক, জবরদস্তি 'ইতিহাসের খ্যাতি'কে ছিনতাই করবারই সামিল।

শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার অবিসম্বাদিত নেতা। তৃণমূল থেকে যাঁর গৌরবদৃপ্ত উত্থান। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের তেজস্বী ও বুদ্ধিদীপ্ত কিশোর পরিণত হয়েছিলেন সাহসী সংগঠকে। চারাগাছ যেমন মহীরুহের মাথা উঁচিয়ে আকাশ ফুঁড়ে ওঠে একদিন, তেমনি স্বভাবজাত সংগ্রাম-সংক্ষুব্ধ পথ পরিক্রমায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও গড়ে তুলেছিলেন তাঁর গৌরবময় রাজনৈতিক জীবন। চল্লিশের দশক থেকে সে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি, সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের যথার্থ বন্ধু, সৈনিক এবং ক্রমান্বয়ে নেতা এবং অবশেষে বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অবিস্বাদিত নায়কে পরিণত হয়েছিলেন। তাই তো সাধারণ মানুষের অফুরন্ত ভালবাসা পেয়েছিলেন শেখ মুজিব। আর সেই প্রগাঢ় স্নেহই তাঁকে দিয়েছিল অনন্য সাহস। সে সাহসে বলীয়ান তরুণ থেকে যুবক তারপর পরিণত বয়সের রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবুর রহমান সৃষ্টি হয়েছিলেন। তাঁর সাথে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে তুলনা করার ধৃষ্টতা যারা করে, তাদের বুদ্ধির বলিহারি যাই। জিয়াউর রহমানতো আর্মীর অর্ডার অনুযায়ী সেই "সোয়াত' জাহাজের মাল খালাস করতে চট্টগ্রাম বন্দরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ব্যারিকেড দেখে মেজর জিয়া অসহযোগ আন্দোলনকারীদের বাপমা তুলে গালমন্দ করতে ছাড়েনি। পরে যখন তাঁকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্রে, তখন কিন্তু জিয়া স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের কর্মীদের গ্রেফতারই করেছিলেন। তিনি যখন প্রথমে 'কৃ্য' ভাবতে চেয়েছিলেন তখন নিজেকেই তো 'রাষ্ট্রপ্রধান' ভাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের যৌক্তিক পারসুয়েশনে জিয়া আন্তরিকভাবে 'ক্ষমতার লোভ' ত্যাগ করেছিলেন কিনা জানি না লীডার, তবে আপনার নামে 'স্বাধীনতার ঘোষণা' পাঠ করেছিলেন বাধ্য হয়ে। সেটা তো ২৭ মার্চ ১৯৭১- এ। অস্বীকার করি না যে, বেতারে এই ঘোষণা সেদিন অনেকেরই কাছে পৌঁছেছিল এবং সমস্ত পৃথিবী জেনেছিল বাংলাদেশে গণহত্যা এবং মুক্তির প্রয়াসে নিরস্ত্র মানুষের যুদ্ধের কথা। কিন্তু প্রশ্ন একটিই, কোন রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া উপনিবেশিক সেনাবাহিনীর একজন মেজর হঠাৎ কর্মক্ষেত্র থেকে সিদ্ধান্ত পাল্টে বাঁশিতে ফু দিলেই কি 'স্বাধীনতার যুদ্ধ' শুরু হয় এবং 'স্বাধীনতা' এসে যায়? পাকিস্তানি দুশাসনের বিরুদ্ধে তেইশটি বছর ধরে যে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং অভ্যুত্থান জনগণ ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তি ঘটালো, তার কি কোন মূল্যই

নেই?... 'ক্ষমতা দখলের মানসিকতা থেকেই ঐ দাবি উঠতে পারে এবং জিয়ার দল সেই উদ্ভট ঘৃণ্য কৌশল এঁটেছে। তাও আবার মুক্তিযুদ্ধকালে অর্থাৎ একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে নৃশংসভাবে প্রতিহত করতে জানপ্রাণ নিবেদন করে যারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সমর্থন শুধু নয়– তাদের ঘাতক-দালাল হিসেবে নিয়োজিত ছিল, সেই জামাত-ই-ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্র শিবিরের (তখন ছাত্র সংঘ) সহযোগিতার করুণায়।

লীডার, ওরা যে মতলব একাত্তরে হাসিল করতে পারেনি, তাই আজ বি. এন. এন. পি'র রাজনীতি ও সাংগঠনিক দুর্বলতার সুযোগে ভালভাবে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ওরা বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বানাতে সহিংসতার হিংস্রতায় মেতেছে।

বিএনপি আজও বুঝতে পারছে না, 'তারে যে বধ করবে গোকূলে সে বেড়ে উঠছে'। জামাত চায় এদেশ ও দেশবাসীকে তারা কব্জা করবে। কিন্তু মানুষ ক্রমশঃ ওদের পাতা ফাঁদে পা ফেলে আটকে যাচ্ছে। সে চায় এমনই একজনকে, যিনি এই দূর্যোগ-দুর্বিপাক থেকে আমাদের বাঁচাবেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেখানে ভূলুণ্ঠিত, সেখানে তো মানুষকে নবপ্রাণে উদ্দীপ্ত হয়ে দেশকে রক্ষা করতে হবে।... কে দেবে সেই উদাত্ত আহ্বান– "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" কে বলবেন, "আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যাও।" কিংবা হুকুম কে দেবে, "ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।"

১৯৬২ সাল। আইয়ুব-শাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর হায়েনার পৈশাচিকতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। গ্রেফতার হলাম আমিও। আমি তখন দৈনিক আজাদ-এ কর্মরত। গভীর রাতে বাড়ি ফেরার পথে পলাশী থেকে গ্রেফতার হলাম আমি। ইন্টাররোগেশন শেষে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ২৬ নং সেলে। গিয়ে লীডার আপনাকে পেলাম। আরও ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ, কফিলউদ্দিন চৌধুরী (বি. চৌধুরীর বাবা প্রবীন আওয়ামী লীগ নেতা) তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, তাজউদ্দিন আহমদ, গাজী গোলাম মোস্তফা। ছিরেন সাংবাদিক-সাহিত্যিক রণেশ দাশগুপ্ত, তরুণ ছাত্রনেতা হায়দার আকবর খান রণো, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ ফজলুল হক মনি।... আমি সবে পিতা হয়েছি, কী পরম আনন্দ আমার, অথচ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে মাত্র দু'সপ্তাহের বাচ্চাটাকে ছেড়ে। এ কথা শুনে আপনি কী প্রচণ্ড স্নেহমমত্বে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, তা সেদিনকার মনঃকষ্ট ভুলে থাকা থেকেই প্রতীয়মান হয়। জেল-জীবনে আপনার এবং রণেশদা'র সান্ত্বনা কী অদ্ভূত প্রভাবই না ফেলেছিল। আপনি আমাকে ভলিবল টিমের ক্যাপ্টেন বানিয়েছিলেন।

একবার মনে আছে, কোরবান আলী সাহেবের সাথে আমার প্রচন্ড বাক-বিতন্ডা বেধে গিয়েছিল; আপনি ছুটে এসে আমাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, আচ্ছা বোকা তো তুই, কোরবান যদি তোর উপর পড়ে যায়, তবে তো

তুই চ্যাপ্টা হয়ে যাবি। কোরবান আলী ছিলেন মোটা আর আমি তখন টিং টিং-এ। আপনি বলতেন, তালপাতার সেপাই।

এমনই জেলখানার স্মৃতি। আরো কত যে স্মৃতি আছে, বলে শেষ করা যাবে না।... মনে পড়ছে, যেদিন আমি ছাড়া পেলাম, সেদিন আপনি কেঁদে ফেলেছিলেন স্নেহভরে। এমন দৃশ্য কি আমার কেন কারো পক্ষে ভোলা সম্ভব? আপনি বলেছিলেন, ভেবেছিলাম রণেশ দা, তুই আর আমি থাকবো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তুইও চলে যাচ্ছিস।.... যাবার সময় একটা বিপদের আশঙ্কায় আমি ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে গেলাম, কারণ বাড়ি থেকে মোটা যে খাতা 'সেন্সরড এ্যান্ড পাশড' ছাপ মেরে আমার হাতে এসেছিল, তাতে কত পাতা বা পৃষ্ঠা আছে তা উল্লেখ করে কার খাতা তা লিখে শীল মেরে দেয়। একটি পাতা যদি খোয়া বা ছেঁড়া থাকে তবে তার জন্য পানিস্মেন্ট পেতে হয়। আমার যখন রিলিজ অর্ডার এলো, দেখি সেই খাতার বেশ কিছু পাতা নেই।....দূর্ভাবনায় পড়লাম। মুখ গোমড়া দেখে আপনি বললেন, কি রে সমস্যা কি? বললাম– নূরুল ইসলাম মঞ্জু নতুন বিয়ে করেই জেলে চলে এসেছে। ও আমার খাতার পাতা ছিঁড়ে ডাক্তার বৌকে নিয়মিত চিঠি লিখেছে। এখন আমি কি করি?

লীডার, আপনি সেদিন আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন এবং বলে দিয়েছিলেন জমাদারকে, ওর বিছানাপত্র চেক করবেন না। আমাকে বল্লেন, তোর কোন ভয় নেই।.... হলোও তাই। কোন ঝামেলা ছাড়াই আমি বেরিয়ে এলাম।

এই জেল জীবনে আপনার অপত্য স্নেহ আমাকে কারাবাসে দারুণ সাহায্য করেছে। মনে আছে লীডার, যেদিন আপনাকে প্রথম 'লীডার' সম্বোধন করি, সেদিনই আপনি বলেছিলেন, "লীডার লীডার করিস্ নারে, তোর লীডার কে তা তো আমার জানাই আছে।" কিন্তু সেই যে 'লীডার' বলতে শুরু করেছিলাম, আজও বলি। কারণ রাজনৈতিক মত-পার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু মহান ঐ নেতাকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলাম বলেই একাত্তরে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, আর সে কারণেই বোধহয়, সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাচনে এ্যান্টি-এসটাবলিশমেন্ট প্যানেলে আমি যখন প্রায় পুরো প্যানেলেই জিতে গেলাম, তখন আপনার প্রতিক্রিয়া ছিল: 'ও তো আমরাই লোক'।

অদ্বিতীয়

বিরুপাক্ষ পাল

দুটো সম্ভাবনা বাঙালির একই চরিত্র প্রকাশ করছে। বাঙালি সঠিক বিচারবুদ্ধির জাতি নয়। সম্ভাবনা দুটো কি? **এক.** বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার আরো বেশ কিছু বছর পর হতে পারে। **দুই.** এ বিচার একেবারে নাও হতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, দুটো সম্ভাবনা দু'রকম। কী করে তা বাঙালির একই চরিত্র প্রকাশ করে? চরিত্রের কিছু দিক যথাসময়ে প্রমাণ দিতে হয়। সময় গেলে সাধন হবে না। বিচার এমন একটা বিষয় যা সময় নির্ভর। বিচার বিলম্বিত, মানেই বিচার প্রত্যাখ্যাত বা অস্বীকৃত। গায়ের ঘাম শুকোবার আগে মজুরকে যেমন পাওনা দিতে হয়, রক্তের দাগ শুকোবার আগেই হত্যা বা আঘাতের তেমন বিচার সম্পন্ন করতে হয়। ত্রিশ বছর মুজিব-হত্যার বিচার না করে যে জাতি ইতোমধ্যেই অবিচারী প্রমাণিত হয়েছে, চল্লিশ বছরের মধ্যে বিচার শেষ করলেও সে জাতি আর "সুবিচারী" আখ্যায়িত হবে না। আবার বিচার না করলেও বাঙালির একই অবিচারীই থেকে যাবে। সে জন্যেই বলেছি, দুটো সম্ভাবনা বাঙালির একই চরিত্র প্রকাশ করছে।

মানুষের চরিত্র যদি পাল্টায় তাহলে জাতীয় চরিত্র না পাল্টাবার কোনো কারণ নেই। কারণ জাতীয় চরিত্র হচ্ছে মানুষের চরিত্রের সমষ্টিগত ফল। গত তেত্রিশ বছরে বাঙালির সামষ্টিক চরিত্র অনেকটাই অধঃপতিত হয়েছে। আধুনিকতার চেয়ে তার ধর্মান্ধতা বেড়েছে। সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনায় পরকাল-লালসা বেড়েছে দশগুণ। উদার মানবতার তুলনায় ধর্মভীরুতা বেড়েছে বিশগুণ। তেত্রিশ বছর পর আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রের সতর্কবাণী : মৌলবাদী বাংলাদেশ থেকে সাবধান হও। আর যাই হোক, অন্ধত্ব, লালসা আর ভীরুতা বীরের অনুষঙ্গ নয়। বিশ্বমানের কোনো মাপকাঠিতেই এখন আর আমরা বীরের জাতি নই। খুব স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন, একমাত্র বঙ্গবন্ধু, একমাত্র একাত্তরে বাঙালি জাতিকে বিশ্বমাপের বীরের জাতি করতে পেরেছিলেন। একটা জাতির মুক্তিযুদ্ধ শেষতক দুই পরাশক্তির বিশ্বযুদ্ধ প্রায় অনিবার্য করে তুলেছিল। সেখানেই বাঙালির অত্যুচ্ছ আত্মপরিচয় ঘটেছিল। তারপর শুধু হারাবার পালা।

স্বাধীনতা বা বিজয় দিবসে বুদ্ধিজীবীদের লেখা পড়লে মনে হয়, আমরা এখনো বীরের জাতি এবং বিশ্ব অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বলবো না যে এ ধারণার পুরোটাই ভুল। পরের দাবিটা যথেষ্ট সত্য। অর্থাৎ বিশ্ব

মাঝে মাঝে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকায়। কিন্তু সেটা "বীরের জাতি" বলে নয়। মৌলবাদ, সন্ত্রাস আর দুর্নীতিতে আমরা মাঝে মাঝেই বিশ্বরেকর্ড করে ফেলি। তখন বিশ্বের দিকে না তাকিয়ে আর উপায় থাকে না। কিন্তু ওই তাকাবার সময় পৃথিবী মনে রাখে না একাত্তরে মুজিবের নেতৃত্বে আমরা বীরের জাতি হয়েছিলাম। পৃথিবী গতিশীল। সাম্প্রতিক বিষয়াবলিই বিশ্ববাসীকে বেশি প্রভাবিত করে। শুধু ইতিহাস আর স্মৃতি নিয়ে বসে থাকলে ভবিষ্যতের বিজ্ঞান ও অর্থনীতি নিথর হয়ে পড়বে। বাহান্ন আর একাত্তর নিয়ে আমাদের চর্বিতচর্বন একেবারেই বেপরোয়া।

দাদুর যশকীর্তি ঘরের নাতিরা শুনতে চায়। পাড়া তো দূরের কথা, পাশের বাড়ির লোকেই তা শুনতে চায় না। আমাদের বুদ্ধিজীবী দাদুগণ এ বিষয়টাই বুঝতে পারেন না। তাদের কথায় বা লেখনীতে গতিবিদ্যার ন্যূনতম ছাপ নেই। শুধু অতীত ব্যাখ্যান আর ঘরকুনো আত্মপ্রসাদ। গত তেত্রিশ বছরে বাঙালি সম্বন্ধে মানুষের ধারণা পাল্টিয়েছে– সে খবর তারা রাখেন না। কারণ তারা মনে করেন, জাতীয় চারিত্র্য একটা স্থায়ী পরিচয়। তাই একাত্তরের বীরত্ব সারাজীবন ধুয়ে খাওয়া যাবে। বিশ্বযুদ্ধে জাপানী জাতির পরিচয় যুদ্ধবাজ হিসাবে। কিন্তু পয়তাল্লিশের পর জাপান ধ্বংসস্তুপ থেকে ওঠে এলো। অর্থনীতিতে হয়ে উঠলো দ্বিতীয় পরাশক্তি। সমরাস্ত্রের আয়োজন নিরুৎসাহিত করে এককালের যুদ্ধবাজ হয়ে ওঠলো শান্তিপ্রেমী কিংবা শিক্ষা ও প্রযুক্তির ঈর্ষনীয় দৃষ্টান্ত। কে বলে জাতির চারিত্রিক পরিচয় পাল্টায় না? হিটলারের জার্মানি এবার দাঁড়িয়েছিল ইরাকের পাশে, মার্কিনী যুদ্ধবিরোধী শিবিরে। অথচ ধর্মীয় পরিচয়ে ওরা ইরাকীদের চেয়ে মার্কিনীদের বেশি কাছাকাছি। এভাবে জাতির চারিত্র্য একটি গতিশীল বিষয়। তাই একাত্তরের ভাবমূর্তি দিয়ে বহির্বিশ্ব বাঙালিকে আজীবন মূল্যায়ন করবে না। বর্তমান সময়েও করছে না।

এখন বীরের জাতি পরিচয়টা আপাততঃ সিন্দুকেই থাকুক। এককালের প্রগতিশীল আলজেরিয়রা এখন মৌলবাদী। এককালের উদারনৈতিক সংস্কৃতিবাদী আফগানীরা এখন বহুলাংশেই তালেবানী। বলা যায় না, হয়তো আফগানিস্তান একদিন হয়ে উঠবে তুরস্কের মত আধুনিক রাষ্ট্র। কিন্তু বাংলাদেশের কী হবে? এর উত্তর ঠিক করবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের মনোবৃত্তি ও শাসকের চরিত্র। অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকার যে তরুণ শিক্ষার্থীরা মানচিত্র খুব একটা ঘাটে না, কিংবা ঘাটলেও বাংলাদেশ নিয়ে আগ্রহ নেই, তাদের ধারণায় বাংলাদেশ হচ্ছে আফগানিস্থান ও পাকিস্তানের মাঝামাঝি কোথাও অর্ধনিমজ্জিত, দুর্নীতিগ্রস্থ এক মিনমিনে মৌলবাদী জনপদ। স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন, একমাত্র বঙ্গবন্ধু এই জাতিকে একবারের মত চিন্তা-চেতনায় আধুনিক করতে পেরেছিলেন। ধর্মব্যবসায়ী অশিক্ষিত পাকিস্তানের গহ্বর থেকে একটা সেক্যুলার বাংলাদেশ তুলে এনেছিলেন শুধু দূরদৃষ্টির গুণে। কিন্তু সেক্যুলারিজম থাকলে ধর্মব্যবসা ঠিক দানা বাঁধে না। তাই পাকি কায়দায় মুজিবহত্যার পর তা নির্বাসিত হল। আরেক শাসক "রাষ্ট্রধর্মের টোপর পরিয়ে দিলেন। জবরদস্তি করে জাতিকে এতটা "পরহেজগার" বানানোর

পরও কী করে এটি দুর্নীতিতে "এক নাম্বার" হয়? কী করে বিচারপতিরা "দুই নাম্বার" হয়? ধর্মভীরুতা কী করে এতটা সন্ত্রাস বাড়ায়!

এর উত্তর খুঁজতে হলে বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টির দিকে তাকাতে হবে। জাতীয় চরিত্রে আধুনিকতার ছাপ না থাকলে কোনো জাতি বেশিদূর এগুতে পারে না। পৃথিবীর সভ্য ও ধনী দেশগুলোর দিকে তাকিয়েই তিনি সংবিধানকে সেক্যুলার করেছিলেন। ক্ষীণচেতা বাঙালির পেটে তা সইল না। পঞ্চাশ বছর আগে মুজিব যা উপলব্ধি করেছিলেন, আরো পঞ্চাশ বচর পর যদি বাঙালি তা অনুধাবন করতে পারে, তাহলে বিশ্বমানে তারা "আধুনিক জাতি" হবার সম্মান অর্জন করবে। নেতার গুণে জাতি এগোয়। বঙ্গবন্ধুর পর এই অকৃতজ্ঞ জাতির ভাগ্যে সেরকম নেতা জুটবে কি? এর উত্তর যাই হোক, বঙ্গবন্ধু "অদ্বিতীয়'ই থেকে যাবেন হতভাগ্য জাতির স্মৃতি পটে। যতই অস্বীকার করবো, তিনি হয়ে উঠবেন ততই অবিনশ্বর।

সাধারণ জীবন ও অসাধারণ পিতা

ইয়াফেস ওসমান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বিষয়ে লিখতে হুকুম হয়েছে নবীন প্রজন্মের উত্তরসূরীদের কাছ থেকে, তাই আজ কিছু কথা প্রকাশ না করে পারছি না। তা না হলে এগুলো চিরকাল নিজের মাঝেই নিভৃতে ধারণ করতে চেয়েছিলাম। কারণ, এ সমাজে কারো কাছে প্রকাশ করার মানসিকতা অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছি। ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট সারারাত জেগে বস্ত্রশিল্প সংস্থার প্যাভেলিয়নের মডেল করার কাজে আমি আর বন্ধু মাসুদ ব্যস্ত ছিলাম, যেটা করা হচ্ছিলো সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিল্পমেলায় নির্মিত হবে। আমি তখন স্থপতি হিসেবে গৃহায়ণ অধিদপ্তরে চাকরি নিয়ে সংস্থার লালমাটিয়াস্থ কোয়ার্টারের দোতলায় থাকি।

রাত কেটে ১৫ আগস্ট ভোর হয় হয়, ফজরের আযান হচ্ছে, হঠাৎ বিকট আওয়াজ; সাথে থেমে থেমে গুলির মতো শব্দ শোনা গেলো। মাসুদ বললো, বঙ্গবন্ধু আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন, ছাত্ররা বোধহয় আনন্দ করছে। এ কথা বলতে না বলতেই আমাদের কোয়ার্টার পেরিয়ে মোহাম্মদপুর বরাবর কামানের গোলা পড়ার শব্দ। দুজনে কি শুনলাম না শুনলাম, এটা বাস্তব না স্বপ্ন, বুঝতে অনেকক্ষণ সময় লাগলো। দুজনে রিক্সা হারানোর অবস্থা এমনিতেই সারারাত ঘুম সেরে রাত্র-জাগা। কোথায় খবর পাই, অবশেষে রেডিও খুলে অবস্থা বোঝায় চেষ্টা করলাম। একটু পরেই ঘাতক মেজর ডালিমের কণ্ঠ শোনা গেল। তারপর দুজনে ছুটে বের হলাম, মাসুদের বাসা কলাবাগান মেইন রোডের খুব করছে! মরিপুর রোড ধরে দুজনে সোবহানবাগ হয়ে ওর বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলাম। লেকের পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে তাকিয়ে ধীর পায়ে চলেছ। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সম্মুখে বেশ কিছু কালো পোশাক-পরা সেনা পাহারারত। লেকের পাড়ে মীরপুর সড়কেও কালো পোশাকে একটু দূরে দূরে সেনারা দাঁড়িয়ে। কলাবাগান বাসস্ট্যান্ডে কাছাকাছি লেকের পাড়ে বঙ্গবন্ধু ভবনের দিকে তাক-করা দুটি কামানের অবস্থান। লোকজনকে দ্রুত হেঁটে যাওয়ার জন্য উর্দু উচ্চারণে ধমক দিচ্ছে রাস্তায় টহলরত সেনারা। মাসুদের বাসার গলি মুখে দুজনে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকলাম, দুজনেরই চোখে জল। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম আজ আর হিসেব করে বলতে পারবো না। পরে ওর বাসায় ড্রইংরুমে দুজনে নীরবে অনেকটা সময় কাটালাম, স্মৃতিরা ভিড় করে এলো।

জনক বঙ্গবন্ধুর কথা মনে হচ্ছিলো। এই দুর্বিষহ দুঃখজনক ঘটনার কয়েক মাস আগে আমাদের ডিজাইন করা গৃহায়ণ অধিদপ্তরের অধীনে মোহাম্মদপুরে আধুনিক মার্কেট কমপ্লেক্সের একটা ডিজাইন বঙ্গবন্ধুকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রস্তাবিত মার্কেট-প্রকল্পের সকল স্থাপত্যনক্সা কয়েকমাস পরিশ্রম করে একটানা ২১ ফুট কেন্ট পেপারের রোলের ওপর এঁকে, জল রং-এর ওয়াশ দিয়ে দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছিল। এটা বঙ্গবন্ধুকে দেখানো হবে সেই শিহরণ থেকে করা। তৎকালীন গৃহায়ণ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী কে. টি. হোসেন সাহেবও সেদিন ওখানে উপস্থিত ছিলেন। গণভবনে কনফারেন্স রুমের বিশাল টেবিলটা একটানা নক্সায় ভরে গিয়েছিল। কনফারেন্স রুমে ঢুকে আকর্ণ হাসির সাথে বঙ্গবন্ধু আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "কিরে আমার দেশ গড়ার কারিগররা কেমন আছিস; দেখে মস্ত কিছু করা হয়েছে মনে হয়।" তারপর টেবিলের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পুরোটা নক্সা দেখলেন। আমরা মাঝেমধ্যে ডিজাইনের মূল বিষয়গুলো বর্ণনা করছিলাম। দেখা শেষ করে কে. টি. হোসেন সাহেবকে উদ্দেশ্য করে, পাহাড়ের মতো উচ্চশির, বাংলার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু বলে উঠলেন, "হোসেন সাহেব, আমার এদেশ গড়ার জন্য বিদেশিদের প্রয়োজন নাই, এরাই আমার দেশ পড়ার কারিগর, এদের দেখে রাখবেন।" বঙ্গবন্ধু প্রস্থান করলেন অন্য জরুরি কাজে। পিতার সেই হাসি, পর্বত-প্রমাণ বাঙালিত্বের গর্ব, সবকিছুর স্মৃতি ভাস্বর হয়ে উঠছিলো।

শিল্পী রশীদ চৌধুরীকে বঙ্গবন্ধুর খুব স্নেহ করতেন। আর তাই গণভবনের অফিসসজ্জা ওঁকেই করতে হয়েছিল। মরহুম শিল্পী রশীদ চৌধুরী স্থাপত্য অনুষদে আমাদের পেইন্টিং-এর শিক্ষক ছিলেন, তা ছাড়া আমার সঙ্গে ওঁর একটা বিশেষ স্নেহের সম্পর্ক ছিলো। স্যারকে একদিন গনভবনে অফিস সজ্জার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওঁর কাজ বঙ্গবন্ধু পছন্দ করেছেন তো? উত্তরে রশীদ স্যার একটা ঘটনার কথা বলেছিলেন– বঙ্গবন্ধুর অফিসকক্ষের এক কোণে তিনি একটা বড়ো মাটির জালার ঠিক মাঝখানে কৃষিজমি চাষ করা লাঙ্গলের পুরনো ক্ষয়ে যাওয়া চকচকে ফলা বসিয়ে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু রশীদ চৌধুরীকে নিয়ে সাজানো কক্ষটি দেখতে-দেখতে ঠিক ওইখানটাতে এসে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর উদাস হয়ে বলেছিলেন, "রশীদ এ তুই কি করেছিস"? রশীদ স্যার জানালেন, তখন বঙ্গবন্ধুর দুচোখে জল। সেদিন অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু স্বগত উক্তি করেছিলেন, "এরাই দেশের খাঁটি মানুষ। দুঃখী মানুষ। দেখি এদের জন্য কিছু করতে পারি কিনা।" কথাগুলো কানে বাজছিল।

আমাদের কোয়াটার্স-এর নিচতলায় অফিসের বড়োবাবু তসিকুল ইসলাম থাকতেন। তিনি একদিন গল্প করেছিলেন, ওঁর আপন ছোট ভাই চাপাইনবাবগঞ্জের গম্ভীরা গানের নানা চরিত্রে গান করেন। গম্ভীরা গানের দলটিও ওঁর ছোট ভায়ের। নাটোর উত্তরা গণভবনে প্রথম যেদিন বঙ্গবন্ধু গিয়েছিলেন, সেদিন বঙ্গবন্ধুর জন্মানে,

৩০ ছোট ডায়ের দলই গম্ভীরা গান গিয়েছিল। ছোট ভাই ওঁকে জানিয়েছিলেন, সেদিন গম্ভীর গানের শেষে, বঙ্গবন্ধু তাঁর লাঠিটা নিজের হাতে নিয়ে বলেছিলেন, "সব কিছু ছেড়ে দিয়ে, তোর মতো যদি সারাটা বাংলায় গান গেয়ে বেড়াতে পারতাম।" সবকিছুই দৃশ্য হয়ে ভাসছিলো।

বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের মুখটাও ভেসে উঠছিলো। লেক সার্কাস বালিকা বিদ্যালয়ে একসময় ছায়ানটের গানের ক্লাশ হতো। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতে আসতাম। কামালও ওস্তাদ খুরশীদ খানের কাছে সেতার শিখতো। ক্লাশ শুরুর আগে রিক্সায় চড়ে সেতার হাতে, সদা হাস্যমুখ সুদর্শন যুবক কামালের সাথে দেখা হলেই সারাম জানাতো, কুশল জিজ্ঞাসা করতো। মুখে খুবই মানানসই গোঁফ, চশমা চোখে, প্রায়শই ফুলহাতা হাওয়াই শার্ট পরতো কামাল। কোনদিন ওর আত্মম্ভরিতা চোখে পড়েনি, সহজ সরল বিনয়ী যুবক। ১৯৭১ সালের ২৮ বা ২৯ মার্চ ইউকুসুর সহ-সভাপতি থাকার কারণে মাথার উপর ঝুলে থাকা হুলিয়া, আর সাথে ওপার ভারতে গিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে উন্মন। ঢাকা ছেড়ে জিঞ্জিরা পার হয়ে রোহিতপুর রওয়ানা দিলাম। ধলেশ্বরীর ঘাটে লাগানো একটা লঞ্চে কামালের সাথে দেখা। কাছে গিয়ে কুশল বিনিময় করলাম। সেদিন ওকে বলেছিলাম, "কামাল তোমার গোঁফটা কিছু দিনের জন্য কেটে ফেলো, তোমাকে চিনতে ওটাই যথেষ্ট।" বিনয়ী স্বরে উত্তরে কামাল বলেছিলো, "ঠিক আছে ভাই, তাই করবো।" আজ এ কি হলো। ও কেন স্মৃতি হয়ে যাবে? বিশ্বাস হচ্ছিলো না।

দুপুরের দিকে বাসায় ফিরলাম। কোনপথে এসেছিলাম বলতে পারবো না। সারাটা শরীর অবশেষের মতো, বিছানায় পড়ে রইলাম। কোয়ার্টারের সামনে বিকেলবেলা ছোট ছোট জটলা ছিলো, কিন্তু কারো মুখে কোন উচ্চবাচ্য নেই, সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে। এটাই ছিলো সেদিনের ঢাকা শহর। বেশ কয়েকদিন ঠিক এমনই অবস্থা বিরাজ করছিলো। আর এই অবস্থার পুরোটুকুর সদ্ব্যবহার করেছিলো ঘাতকচক্র। তাই তেমনটি করে বিদ্রোহ হলো না। এরপর বহুদিন প্রায়শই বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে হেঁটে যেতাম। আর বাইরে থেকে বাড়ির গায়ে গুলির দাগগুলো দেখে মনে হতো, বাঙালির সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল সোনালী অক্ষরে লেখা ইতিহাসের পাতা ঘাতকের গুলির আঘাতে ছিন্ন করে কলঙ্ক-কালিমা এঁকে দেয়া হয়েছে।

বাংলার মানুষের প্রিয় নেত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রবাসজীবন থেকে বাংলায় ফিরে এলেন দলের হাল ধরতে। সে বছরই বঙ্গবন্ধুর বন্ধু- বাড়ির তালা খোলা হলো। সেদিন নেত্রীর সাথে তৎকালীন পার্টির সেক্রেটারী আবদুর রাজ্জাক, মোনায়েম সরকার, স্থপতি আলমগীর কবীর, স্থপতি মাজাহারুল ইসলামের সাথে আমিও উপস্থিত ছিলাম। তালা খুলে বাসার ভিতরে ঢুকে ধূলায় ধুসর, লণ্ডভন্ড শোকাবহ অনেক কিছুর মাঝে যেটা আমাকে সবচেয়ে বিস্মিত করেছিলো, সেটা শোবার ঘরে একটা আলনার সবচেয়ে নিচের কাঠের র‍্যাকের ওপর অনেকগুলো

জীর্ণ স্যান্ডেল ও জুতার অবস্থান। একটা মধ্যবিত্ত সাধারণ জীবনযাপনকারী পরিবার, কোন কিছু ফেলে দেয়ার স্বভাব ছিলো না। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনযাপন করতেন, পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। আর এটা করতেন বলেই সাধারণ কোটি কোটি বাঙালির দুঃখ-বেদনা, বঞ্চনা, বিদ্রোহ সবকিছুই আপন বিশাল হৃদয়ে ধারণ করে জাতির শ্রেষ্ঠ প্রতীক, বঙ্গবন্ধু হতে পেরেছিলেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন, একটা পতাকা দিয়ে গেছেন, জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে গেছেন, দেশকে সংবিধান দিয়ে গেছেন, সর্বোপরি জাতি হিসেবে বাঙালিকে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অধিকারী করে গেছেন। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাতির চরমতম দুর্ভাগ্য, এ জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনা হত্যাকারী-ঘাতকের হাতে জীবন দিযে, সাধারণ জীবনের অধিকারী অসাধারণ পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আবহমানকাল ধরে কোটি বাঙালির হৃদয়ে চিরস্থায়ী স্থান করে নিয়ে, সবচেয়ে প্রিয় দেশের মাটি, টুঙ্গিপাড়ায় চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে, অমরত্ব লাভ করে গেছেন। টুঙ্গিপাড়া আজ বাঙালির কাছে পবিত্র তীর্থভূমি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি যেভাবে দেখেছি

মে. জে. (অবঃ) সি. আর. দত্ত বীর উত্তম

শুরু করার আগে আমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। কারণ শেখ মুজিবুর রহমানের মতন এমন বিশেষ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে হঠাৎ করে সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি বলেই নিজের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

সিলেটের হবিগঞ্জে আমি পড়াশুনা করি এবং গভর্নমেন্ট হাইস্কুল হবিগঞ্জ থেকে ম্যাট্রিক পাশ করি। খুলনার দৌলতপুর কলেজ থেকে কলেজ-জীবন সমাপ্ত করে পাকিস্তান আর্মির কমিশন র‍্যাঙ্কে যোগদান করি। ১৯৫২ সালে পাকিস্তান আর্মিতে কমিশন লাভ করি এবং পাকিস্তান আর্মির (৬. এ. এ. ৈঅএ.) ছয় ফ্রন্টইয়ার ফোরস্ রাইফেলে যোগদান করি।

আমার চাকরি জীবনের বেশির ভাগ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে কাটিয়েছি। তাই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব ছিল না। তবে পূর্ব পাস্তিানের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নাম প্রতিটি বাঙালির মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। শেখ মুজিবুর রহমানের এই যে উত্তরণ তার পেছনে রয়েছে একটি অন্যন্য ইতিহাস।

এটা স্বীকার করতেই হবে ভারতীয়দের আন্দোলন আর সংগ্রামের ফলেই ১৯৪৭ সালের মধ্য-আগস্টে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছে পরাধীনই রয়ে গেল।

এটা ছিল একটা নির্মম পরিহাস। পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়করা বাঙালিকে ব্যবহার করেছে কৌশল হিসাবে। ধর্ম ও ইসলামকে সম্বল করেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আবিষ্কার করেন দ্বি-জাতি তত্ত্ব। আর দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিতিতেই প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসনকর্তারা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ঘৃণার চোখে দেখেছে।

১৯৫৮ সালে ফিল্ড মার্শাল মোঃ আইয়ুব খান সামরিক একনায়ক হিসাবে প্রকাশ্য ক্ষমতার মঞ্চে উঠে এলেন। আইয়ুব কান পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের খুবই

অপছন্দ করতেন। কারণ, তিনি বলতেন এরা হচ্ছে নীচু জাতের মানুষ।
তারপর পূর্ব পাকিস্তানের মঞ্চে আসলেন ইয়াহিয়া খান। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সবগুলো সিদ্ধান্তই এসেছে ইয়াহিয়ার কাছ থেকে। পরের রঙ্গমঞ্চে আর এক জেনারেলের নাম যুক্ত হলো। নাম হলো লেঃ জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালের মার্চে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে এলেন কালো রং-এর চশমা এবং বৃটিশদের কায়দায় হাতে সেই ছড়ি। তিনিই সিদ্ধান্ত নিলেন পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিক কায়দায় শায়েস্তা করতে হবে।
পূর্ব পাকিস্তানের হত্যযজ্ঞের আর এক সামরিক কর্মকর্থা হচ্ছে জেনারেল রাও ফরমান আলী। তিনি ছিলেন টিক্কা খানের ডান-হাত।
পাকিস্তান রাষ্ট্রে একটি বড় অসঙ্গতি ছিল। পাকিস্তানের প্রধান নেতাদের ব্যক্তিগত জীবন, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ইসলামী ভাবধারার সঙ্গে কোন মিলই ছিল না। পাকিস্তানি নেতারা ইসলামী প্রজাতন্ত্রের কথা মুখে বলতেন। কিন্তু নিজেদের জীবন ছিল অনৈসলামিক কর্মতৎপরতায় পরিপূর্ণ।
পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর প্রধান মাওলানা মওদুদী বলেছিলেন, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাদের কখনও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোন অভিপ্রায় ছিল না।
পূর্ব পাকিস্তান যখনই তার ন্যায্য হিস্যার প্রশ্ন তুলেছে তখনই তারা ইসলাম গেল, ইসলাম গেল চিৎকার জুড়ে দিয়েছেন এবং নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়েছেন।
মাওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, কমরেড মণি সিংসহ পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি নেতাদের ভারতের দালাল, ইসলাম-বিরোধী প্রভৃতি খেতাব এই ইসলামপন্থীরা দিয়েছিলেন।
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শাসকগোষ্ঠী সব সময়ই দুই অঞ্চলের জন্য দুই ধরনের নীতি অনুসরণ করে, যার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ সব দিক দিয়েই ব্যাপকভাবে লাভবান হয়েছেন। এতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা সবদিক দিয়েই উন্নতি করেছে।
পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণের দুঃখ-দুর্দশার অন্যতম কারণ ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য। কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার দরুন পূর্ব পাকিস্তানে কোনো শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেনি। কৃষি খাতে, বিদ্যুৎ খাতে পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা করা হয়েছে। চাকরির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিরা সীমাহীন অবিচার করেছে বাঙালিদের প্রতি। বিমান, নৌ এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলো ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।
পাকিস্তানিদের বৈষম্য সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিষদে একটি স্মরণীয় ভাষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হয় নি। তাহলেও তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্মের কিছুটা খবর পেতাম পশ্চিম পাকিস্তানে বসে।
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়া, ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক, ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করার পেছনে অনেক

কাজ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৬ সাল ছয়-দফা আন্দোনের প্রচার তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।
আসলো ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ : "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। যার যা কিছু আছে তা দিয়েই আমরা শত্রুর মোকাবিলা করবো।"
২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান জাতীয় দিবস। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ২৩ মার্চ পালিত হয় প্রতিরোধ দিবস। ঢাকা পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের উদ্যোগে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি" গানটি গেয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই অনুষ্ঠানেই রবীন্দ্রনাথের এই গানটি আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় সঙ্গীত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তিনি নিজ বাসভবনের সামনে আনুষ্ঠানিক ভাবে ছাত্রলীগের অভিবাদন গ্রহণ করেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "যতদিন পর্যন্ত সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সার্বিখ মুক্তি অর্জিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবেই।" এ ভাবেই ২৩ মার্চ পূর্ব বাংলায় আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্রের, আর জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এরপর আর নতুন করে স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কী? আসলো ১৯৭২ সাল। বৃটিশ রয়েল এয়ার ফোর্সের বিমান যোগে ১০ জানুয়ারী ১৯৭২ সাল বিকেল তিনটায় ঢাকা বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অবতরণ করেন। আমরা সেক্টর কমান্ডাররা ও উচ্চপদস্থ নেতারা এক লাইন করে দাড়িয়ে ছিলাম অভ্যর্থনা জানাতে। তিনি আমাদের সকলের সঙ্গে হাত মিলালেন; এই প্রথম স্বশরীরে আমার আকাঙ্ক্ষিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে হাত মিলাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওনা আজ পেলাম। তিনি পরে সমবেত জনসমুদ্রে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন এবং বলেন, "আপনাদের ভালবাসাই আমাকে অনিবার্য্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। আপনাদের মধ্যে অনেকের মা, বাবা, ভাইবোন পাক-সেনাবাহিনীর অত্যাচারে শহীদ হয়েছেন। এ দুঃখজনক পৈশাচিক ঘটনার জন্য সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই। তবে এটা বলতে পারি, এ সব শহীদদের রক্ত বৃথা যাবে না।"
১৯৭২ সালে আমাকে রংপুর বিগ্রেডের ব্রিগেড-কমান্ডার করে পাঠানো হয়। রংপুরের ৭২ নং ব্রিগেড আমি প্রথম চালু করি।
বাংলাদেশ রাইফেল্‌সে তখন গন্ডগোল চলছিল। বাংলাদেশ রাইফেলস্‌কে নিয়ে টানা-হেচড়া চলছিল। পুলিশ চাইছিল বি. ডি. আর.-কে তাদের কমান্ডে আনতে। রক্ষীবাহিনী চাইছিল বি. ডি. আর কে তাদের কমান্ডে আনতে। এ নিয়ে বেশ গন্ডগোল চলছিল। এমনকি নিজেদের মধ্যে গোলাগুলি হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু রংপুর ব্রিগেড পরিদর্শন করতে আসলেন। পরিদর্শন করলেন, ব্রিগেডের প্রশংসা করলেন। পরিদর্শনের পর আমাকে আলাদা ভাবে ডেকে বললেন, আমাকে

বি. ডি. আর.–এর দায়িত্ব নিতে হবে। বি. ডি. আর.-এ গন্ডগোল চলছে ঔমবণ ধভর্ধ্বরহ-র সঙ্গে কথা বলতে বললেন। এবং বি. ডি.- আর. এর দায়িত্ব নিতে বললেন। তাঁর সঙ্গে এত নিকটে এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলা এই প্রথম। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স-এর দায়িত্ব নিলাম এবং বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে ১৯৭৩ সালে বিগ্রেডিয়ারু পদে প্রমোশন পেলাম। বাংলাদেশ সরকার ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে আমাকে "বীর উত্তম" খেতাবে ভূষিত করেন। বঙ্গবন্ধু সরকারের কাছ থেকে এত বড় খেতাব পাওয়া আমার জীবনের মহা-মূল্যবান পাওয়া।

১৯৭৪ সালে বি. ডি. আর. থেকে আর্মি হেড কোয়াটার্সে "চীফ অব লজিসটিক" পদে বদলি হই।

১৪ আগস্ট ১৯৭৫ সাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়। আমাদের ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায় শুরু হয়।

১৯৭৬ সালে আমাকে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট–এ বদলি করা হয় এবং মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হই। ১৯৮৪ সালে আমি অবসর গ্রহণ করি।

অবশেষে, আমি মনে করি, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বঙ্গবন্ধুর অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি হোক, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি।

"জয় বাংলা"

একটি ঐতিহাসিক বৈঠক

বজলুর রহমান

১৯৬১ সাল নভেম্বর মাসের শেষাশেষি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। হাওয়ায় মৃদু হিমেল পরশ আসন্ন, শীতের জানান দিচ্ছে। দুজন ভদ্রলোক অটোরিকশায় এসে নামলেন ঢাকার মগবাজার এরাকায়। বয়স পঞ্চাশোত্তর। ঢোলাঢালা প্যান্ট ও হাওয়াই-শার্ট পরা, ছিমছাম চেহারা। অটোরিকশা থেকে নেমে হাঁটতে লাগলেন গলিপথে। একটু এদিক-ওদিক ঘুরে ছোট্ট একটি একতলা বাড়ির সামনে এসে কড়া নাড়লেন।

বাড়ির মালিক নিজে এসে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে নিয়ে গেলেন ভেতরে। বেশ বোঝা যায়, অতিথি দুজনের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন তিনি সাগ্রহে। হয়তোবা কিছুটা উত্তেজনার সঙ্গেও। উত্তেজনা, কেননা অতিথি দুজন সাধারণ কেউ নন। সরকারের গুপ্ত পুলিশ এদের বছরের পর বছর ধরে হন্যে হয়ে খুঁজছে। মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করা আছে উভয়কে ধরার জন্য। এ-ধরনের মানুষ বাড়িতে এলে গর্ব ও আনন্দ যেমন হয়, তাদের নিরাপত্তার জন্য কিছুটা উদ্বেগ ও উত্তেজনাও দেখা দেয় বইকি।

অতিথি দুজন কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহ ও খোকা রায়। চেহারা তাঁদের অনেকেই দেখেনি—দেশভাগ, বিশেষত ১৯৫৮ সালের সামরিক আইন জারির পরে। কিন্তু রাজনীতির অঙ্গনে নাম দুটো সুপরিচিত। মণি সিংহ যৌবনে ছিলেন প্রবাদখ্যাত কৃষকনেতা। হাজং ও টঙ্ক আন্দোলনের নায়করূপে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে। খোকা রায়ের রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে। ব্রিটিশরাজ এই ভয়ংকর বিপ্লবীকে বন্দি করে আরও অনেকের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিল সুদূর আন্দামানে। সেখানে মার্কসবাদ পড়াশোনা করেন। যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। অবির্ভুক্ত বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের একজন হয়ে ওঠেন। মণি সিংহের বাগ্মিতা অসাধারণ। তাঁর তেজোদৃপ্ত ভাষণ কৃষকপ্রাণে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুলত। খোকা রায় তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষক, পার্টি সংগঠক। দুজনে মিলে চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির শিখাটিকে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ছাত্র- তরুণদের মধ্যে দিন দিন বাড়ছিল পার্টির প্রভাব ও সংগঠন। যে-সময়ের কথা বলছি তখন মণি সিংহ ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক। খোকা রায় কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

মগবাজারের ওই বাড়িটিতে যিনি থাকতেন তাঁর নাম আব্দুর রউফ। সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। তবে কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ সমর্থক, বিপদের দিনের বন্ধু। এককালে হালিমা টেক্সটাইল মিলের ম্যানেজার ছিলেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু তাঁকে টেক্সটাইল মিল কর্পোরেশনের পরিচালক পদে নিয়োগ করেন। সজ্জন হিসাবে সর্বমহলে সুপরিচিত। মণি সিংহ ও খোকা রায় তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে 'ভাই সাহেব' বলে ডাকতেন।

সেদিন সন্ধ্যার এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল না। কেউ জানত না মগবাজারের ওই ছোট্ট তিন কামরার ভাড়াটে বাড়িতে এমন এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে যার ফল হবে ঐতিহাসিক তাৎপর্যবহ। ঐতিহাসিকরা দিনক্ষণ টুকে রাখেননি, কিন্তু এ-বৈঠকেই রচিত হয়েছিল পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট ও জাতীয়তাবাদী শক্তির সংগ্রামী ঐক্যের ভিত্তি। এর প্রত্যক্ষ ফল আইয়ুবি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ১৯৬২'র বিপ্লবী ছাত্র-গণ-আন্দোলন, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল ১৯৬৯-র বিপ্লবী ছাত্র-গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের উপর—যা মূলত এই শক্তি সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল।

খোকা রায়ের 'সংগ্রামের তিন দশক' বইটি যাঁরা পড়েছেন তাদের নিশ্চয়ই জানা আছে এ-বৈঠকে পূর্ববাংলার বিকাশমান জাতীয়তাবাদী শক্তির সংগ্রামী প্রতিনিধি হিসাবে কারা উপস্থিত ছিলেন। মণি সিংহ ও খোকা রায় আসার কিছুক্ষণ পরে এসে পৌঁছলেন আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ও 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)। তাঁদেরকে সাথে করে নিয়ে এলেন 'সংবাদ' সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী। শেখ মুজিব তখনও বঙ্গবন্ধু বা জাতির পিতা হননি, কিন্তু পূর্ববাংলায় আওয়ামী লীগের তিনিই ছিলেন মুখ্য সংগঠক, বলতে গেলে প্রাণপুরুষ। শহীদ সোহরাওয়াদী তখনও আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা। শেখ মুজিব তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, মানতেন; তাঁর কথা ছিল তখনও আওয়ামী রাজনীতিতে শেষ কথা। তবু তরুণ প্রজন্মের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ছিল লক্ষণীয়। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখনও ছিলেন সারা পাকিস্তানভিত্তিক আন্দোলনের মারফত 'গণতান্ত্রিক পাকিস্তানে'র চিন্তায় মোহবিষ্ট। শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু তখনই বুঝে নিয়েছিলেন স্বাধীনতা ছাড়া বাঙালির মুক্তি নেই এবং সে-লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজনীতির ধারা স্থির করতে হবে। এমনকি ১৯৫৬-৫৭ সালেও তিনি পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দুর্বল ও অজনপ্রিয় ভূমিকায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ছিলেন দুয়ের মাঝামাঝি। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ছিল নিঃশর্ত ও প্রশ্নহীন; কিন্তু গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশনের জন্য বাঙালির সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার পথেই যেতে হবে, একথা শেখ মুজিবের মতো তিনিও মনে করতেন। তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল সময় হলে শহীদ সাহেবও স্বাধীনতার কথাই বলবেন।

জহুর হোসেন চৌধুরী ছিলেন এ-বৈঠকের আয়োজনকারী। ছাত্রজীবনে এম. এন. রায়ের র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট গোষ্ঠীর সদস্য জহুর হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে পঞ্চাশের দশক থেকেই বেআইনি ও গোপন কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। 'ইত্তেফাক' সম্পাদক মানিক মিয়ার সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর বন্ধুত্ব। তাই কমিউনিস্ট পার্টি যখন মার্শাল ল'র বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করে তখন দৌত্যকর্মের দায়িত্ব দেওয়া হয় জহুর হোসেন চৌধুরীকে। জহুর হোসেন চৌধুরী মানিক মিয়ার সহায়তায় শেখ সাহেবের সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করেন।

১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগের পরের বছর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। সাজ্জাদ জহির নির্বাচিত হন এর সাধারণ সম্পাদক। কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তানে তীব্র দমননীতির সম্মুখীন হয়। পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের গুন্ডাবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য কার্যকলাপ প্রায় অসম্ভব করে তোলে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সরকরি দমননীতি তো ছিলই। কমিউনিস্ট পার্টির হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্য ও সমর্থকরা দলে দলে দেশত্যাগ করে পশ্চিম বাংলায় পাড়ি জমান। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে পার্টির ভিত তখনও ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠেনি। ১৯৫৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের একত্রে বৈঠক করা অসম্ভব ছিল। এ-পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির অখণ্ডত্ব রেখেও পূর্ববাংলা অংশের জন্য পৃথক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। একে বলা হতো পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কমিটি (ইস্ট পাকিস্তান সেন্ট্রাল কমিটি অভ দ্যা কমিউনিস্ট পার্টি অব পাকিস্তান)। [ষাটের দশকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা হয় এবং এ-নামে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্বীকৃতি লাভ করে]।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য তৎপরতা খর্ব হলেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্টভাবাপন্ন প্রগতিশীল কর্মী বিভিন্ন অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক দলে কাজ করতে থাকেন। আওয়ামী লীগের তরুণতর নেতৃত্বেও কমিউনিস্ট ও বাম প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ১৯৫৭ সালে স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগের বাম অংশ বেরিয়ে এসে পূর্ববাংলার গণতন্ত্রী দল ও পশ্চিম পাকিস্তানের আজাদ পাকিস্তান পার্টি, গফফার খানের লাল কোর্তা দল প্রমুখের সঙ্গে একত্র হয়ে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করে। দল ভাঙাভাঙি ও ন্যাপ গঠনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তিক্ততার সৃষ্টি হয় প্রচুর। তখন পূর্ববাংলায় আওয়ামী লীগ ছিল ক্ষমতাসীন, ন্যাপ গ্রহণ করে বিরোধীদলের ভূমিকা। আইন পরিষদে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। ভোটাভুটিতে অকমিউনিস্টদের উদ্যোগে ন্যাপ একদিন নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করায় আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার পতন

ঘটে এবং তড়িঘড়ি করে গভীর রাতে আবু হোসেন সরকারকে মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করানো হয়। পরদিন কমিউনিস্ট পার্টির প্রচেষ্টায় ন্যাপ সদস্যরা আওয়ামী লীগের সঙ্গে একযোগে ভোট দেওয়ায় আবু হোসেন সরকারের 'একদিনের বাদশাহী'র ইতি ঘটে এবং আতাউর রহমান খান পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা ন্যাপের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এবং কমিউনিস্ট পার্টি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা ও সংবিধান মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আওয়ামী লীগের সঙ্গে একযোগে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায় উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। তা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ-নেতৃত্বের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি আত্মগোপনরত মূল নেতৃত্বের সরাসরি সংযোগ ছিল না। ১৯৬১ সালে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার স্বার্থে কমিউনিস্ট পার্টি সরাসরি যোগাযোগের উদ্যোগ নেয়।

পূর্ববাংলায় আইয়ুবি মার্শাল ল'র নির্যাতনের প্রধান শিকার হয় আওয়ামী লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ প্রমুখ বামপন্থিরা। আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হয়। কমিউনিস্ট ও অন্য বাম নেতৃবৃন্দও কারারুদ্ধ হন। ময়মনসিংহের ছাত্রনেতা কাজী আবদুল বারীকে বেআইনি রাজনৈতিক কাগপজপত্র রাখার অপরাধে সামরিক আইনে বেত্রদণ্ড দেওয়া হয় এবং তিনি সারা জীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যান। শুধু রাজনৈতিক নেতাকর্মী নন, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত যাঁরাই নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সোচ্চার হন তাঁদেরকেই নির্বিচার দমননীতি, জেল-জুলুমের শিকার হতে হয়। আইয়ুবসৃষ্ট 'মৌলিক গণতন্ত্রী'দের দুর্নীতি ও অত্যাচারে কৃষক ও গ্রামীণ জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। শ্রমিক অসন্তোষের প্রকাশ ঘটে সামরিক আইনের কড়াকড়ি সত্ত্বেও মজুরি বৃদ্ধি ও অন্যান্য দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন-ধর্মঘট প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের নামে নানা প্রতিক্রিয়াশীল ও শিক্ষা-সঙ্কোচনমূলক বিধিব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে। সামরিক শাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ এবং ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারের অস্বীকৃতি শিক্ষিত পেশাজীবী ও ছাত্র-যুবসমাজকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সর্বোপরি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে গভীর ও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য সকলশ্রেণীর মানষের মনে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগ-নেতৃত্ব নিজ নিজ অবস্থান থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে তোলার বাস্তব পরিস্থিতি বিদ্যমান।

কিন্তু আন্দোলনের বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেই আন্দোলন আপনা থেকে গড়ে ওঠে না। তার জন্য চাই সংগঠন ও সংগঠিত উদ্যোগ। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত, গণভিত্তিও ছিল দুর্বল। একক প্রচেষ্টায় আন্দোলন গড়ে তোলা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো সংগঠন ও শক্তি কমিউনিস্ট পার্টির ছিল না। কাজেই কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যের তাগিদ অনুভব করবে

এটা স্বাভাবিক। তা ছাড়া গণতন্ত্রের সংগ্রামে ব্যাপকতম ঐক্য ও শক্তিসমাবেশ গড়ে তোলা কমিউনিস্ট পার্টির নীতি-কৌশলের অন্তর্গত। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন কেন? কেন তাঁরা কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলেন? জহুর হোসেন চৌধুরীর সফল দৌত্য কেবল এর পেছনে ছিল না, ছিল ছাত্র ইউনিয়ন নামক সংগঠনটির শক্তি ও জনপ্রিয়তা। একথা সবার কাছেই পরিষ্কার ছিল যে মার্শাল ল'র চণ্ডনীতির সামনে দাঁড়িয়ে গণআন্দোলনের সূচনা করতে পারে একমাত্র ছাত্রসমাজ; কারণ তারা সবচেয়ে সচেতন ও সংগঠিত। এবং ছাত্রসমাজকে রাস্তায় নামাতে হলে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন এই শক্তিশালী ছাত্র-সংগঠনটিকে উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বিশেষত শেখ মুজিবুর রহমান ও মানিক মিয়া যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন। এবং এই উপলব্ধি থেকেই মনে হয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে হাত মেলাতে এগিয়ে এসেছিলেন সংগ্রাম গড়ে তোলার স্বার্থে।

ঐক্য ও সহযোগিতার প্রশ্নে মোটামুটি মনস্থির করেই উভয়পক্ষের নেতৃবৃন্দ বৈঠকে এসেছিলেন। তা সত্ত্বেও চার-চারটি দীর্ঘ বৈঠকের প্রয়োজন হয় কর্মসূচি চূড়ান্ত করতে। যে-দাবিটির অন্তর্ভুক্ত নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয় তা হলো পুর্ববাংলার স্বাধীনতার প্রশ্ন। কিন্তু সেকথা পরে।

শেখ মুজিব ও মানিক মিয়াকে জহুর হোসেন চৌধুরী পরিচয় করিয়ে দেন মণি সিংহ ও খোকা রায়ের সঙ্গে। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা দীর্ঘদেহী শেখ মুজিব। বাঙালির নতুন প্রজন্মের নেতা। চোখেমুখে যৌবনের দীপ্তি। আবেগপ্রবণ, সাহসী-আত্মপ্রত্যয়ী। মানিক মিয়া অপেক্ষাকৃত বয়স্ক। পরনে প্যান্ট-কোট। চেহারায় গাম্ভীর্যের ছাপ। সৌজন্য বিনিময়ের পর কথাবার্তা শুরু হলো। আন্তরিকতার উষ্ণতায় মুহূর্তে ঘুচে গেল অপরিচয়ের ব্যবধান। শেখ সাহেব বললেন স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে : দাদা, আপনারা বহু সংগ্রামের পোড়-খাওয়া নেতা। আপনারা পথনির্দেশ দিন কীভাবে আন্দোলন শুরু করা যায়। সামরিক শাসন দেশটাকে ছারখার করে ফেলল। প্রতিবাদের পথ বন্ধ করে দিয়ে পাঞ্জাবি 'বিগ বিজনেস' লুটে নিয়ে যাচ্ছে বাংলার সম্পদ। সোনার বাংলা আজ শ্মশান। এ-অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। দেশের মানুষও তৈরি। শুধু সাহস করে ডাক দেওয়ার অপেক্ষা।

মণি সিংহ বললেন : আপনারা যুবক। দেশের ভবিষ্যৎ আপনাদের হাতে। মানুষ আপনাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। তরুণসমাজকেই সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তবে বুড়ো বলে বাতিল করে দেবেন না। আমরাও আছি আপনাদের তরুণদের মিছিলে।

একটু থেমে পরিহাসতরল কণ্ঠে বললেন, জানেন তো, আমি কিন্তু বুড়োর দলে পড়তে রাজি নই। তা যতই কেননা চুল পাকুক আর টাক পড় ক।

সবাই হেসে উঠলেন। মণি সিংহের ছিল মাথাজোড়া চকচকে টাক।

সেদিন বৈঠক চলেছিল প্রায় দু-আড়াই ঘণ্টা। দেশের পরিস্থিতির সামগ্রিক পর্যালোচনা করে উভয়পক্ষ একমত হন, আইয়ুবশাহির বিরুদ্ধে অবলম্বে একটা ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। আলোচনা হয় অত্যন্ত খোলামেলা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে। উভয়পক্ষের মনে পরস্পরের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে সৃষ্টি হয় গভীর আস্থা। এই পাস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ ও আস্থা উত্তরকালে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এবং আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যের বুনিয়াদ গড়ে তোলে।

প্রথম বৈঠকে আইয়ুবশাহির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে মতৈক্য হলেও সময়ের অভাবে আন্দোলনের কর্মসূচি, দাবিদাওয়া বা সাংগঠনিক কৌশল সম্পর্কে কোনো আলোচনা হতে পারেনি। কথা হয়, পরবর্তী একটি বৈঠক এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। দ্বিতীয় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় সপ্তাহখানেক পর। এবার আর মগবাজারে আব্দুর রউফ সাহেবের বাসায় নয়, মতিঝিলের কাছে কোনো-একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে। এই ভদ্রলোকের নাম-পরিচয় আজ আর জানা যাচ্ছে না, তবে তিনি ছিলেন শহীদুল্লাহ কায়সার ও জহুর হোসেন চৌধুরীর বিশেষ পরিচিত। পরবর্তী তিনটি বৈঠক এ-বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে কমিউনিস্ট নেতারা কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লিখিত প্রস্তাব নিয়ে তৈরি হয়ে এসেছিলেন। খোকা রায় বললেন : গত বৈঠকে আমরা একমত হয়েছিলাম আইয়ুবশাহির প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং দেশ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত। আমাদের পাটি মনে করে, সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম, সকল রাজবন্দির মুক্তি, পূর্ববাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের জীবনধারণের মান উন্নয়নে চারটি জরুরি জনপ্রিয় দাবির ভিত্তিতে এরূপ একটি আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে।

এসব দাবি-দাওয়ার কোনোটির ব্যাপারেই আওয়ামী লীগের দ্বিমত ছিল না। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান তুললেন একটি মৌলিক প্রশ্ন। তিনি বললেন : এসব দাবিদাওয়া কর্মসূচিতে রাখুন, কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু, দাদা, একটা কথা আমি খোলাখুলি বলতে চাই। আমার বিশ্বাস গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন এসব কোনো দাবিই পাঞ্জাবিরা মানবে না। কাজেই স্বাধীনতা ছাড়া বাঙালির মুক্তি নেই। স্বাধীনতার দাবিটা আন্দোলনের কর্মসূচিতে রাখা দরকার।

শেখ মুজিব ভেবেছিলেন পূর্ববাংলার স্বাধীনতার প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন সহজেই মিলবে। কেননা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাতে সবচেয়ে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছে কমিউনিস্টরাই। কিন্তু কমিউনিস্ট নেতারা এ-প্রস্তাবে সায় দিতে পারলেন না। তাঁরা বললেন : কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনতার প্রস্তাব নীতিগতভাবে সমর্থন করে। কিন্তু এ-দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার সময় এখনও আসেনি।

জনমত সেভাবে তৈরি হয়নি। কাজেই এ দাবি তুললে সেটা হবে আগাম পদক্ষেপ। তাতে আন্দোলনের ক্ষতি হবে এবং শাসকগোষ্ঠী বিচ্ছিন্নতাবাদের অজুহাতে আন্দোলনকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। দীর্ঘ আলোচনা ও যুক্তি-তর্কের পরও এ-প্রশ্নের কোনো মীমাংসা হলো না।

তৃতীয় দিনের আলোচনায়ও বিতর্কের ফয়সালা হলো না। শেখ মুজিব তাঁর বক্তব্যে অটল ও অনমনীয়। বললেন : পাঞ্জাবিদের কাছে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি অরণ্যে রোদনের শামিল। চিন্তা করে দেখুন সাধারণ নির্বাচনের আগখানে মার্শাল ল কেন জারি করা হলো? না, বাঙালির প্রাধান্য অবধারিত। তার উপর বেলুচ, পাঠান, সিন্ধি কেউ খুশি নয় পাঞ্জাবিদের উপর। তারা যদি বাঙালিদের সঙ্গে হাত মেলায় তো পাঞ্জাবিদের অবস্থাটা কী হবে? তাই সংখ্যালঘিষ্ঠর শাসন বজায় রাখার জন্যই সামরিক আইন জারি, শাসনতন্ত্র বাতিল। এখন আবার গণতন্ত্র দিয়ে, স্বায়ত্তশাসন দিয়ে পাঞ্জাবি শোষকগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় নিজের পায়ে কুড়াল মারবে?

মানিক মিয়া আগের দিনের বৈঠকে উভয়পক্ষে যুক্তি-তর্ক মন দিয়ে শুনছিলেন, কিন্তু কোনো মন্তব্য করেননি। শেখ মুজিবের আবগেময় বক্তব্য শুনে মুখ খুললেন। যে-ঘরটাতে বসে আলোচনা হচ্ছি, তার একটা খোলা জানালার পাশে বসেছিলেন তিনি। জানালা দিয়ে রাস্তার পাশে একটা পেট্রোল পাম্প দেখা যাচ্ছিল। সেই পেট্রোল পাম্পটা দেখিয়ে বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানীরা শুধু পূর্ববাংলার পাটকল সুতা-কলগুলোরই মালিক হয়ে বসেনি, এখানকার সব পেট্রোল পাম্পও ওরা দখল করে নিয়েছে। নবাবপুরে যতগুলো বড় বড় দোকান আছে তার একটিও এখন আর বাঙালিদের হাতে নেই। সব পশ্চিমারা দখল করে নিয়েছে। পূর্ব বাংলা থেকে প্রতি বছর ওরা কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাঁচতে হলে ওদের তাড়াতে হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, আপনাদের যুক্তিটা আমি বুঝি, কিন্তু আজ হোক কাল হোক স্বাধীনতার জন্য লড়তেই হবে। তা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ বক্তব্য; তাঁর যুক্তি ও আবেগ মণি সিংহ ও খোকা রায়কে স্পর্শ করেনি তা নয়। কিন্তু সেদিনও তাঁরা পার্টির বক্তব্য বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। মণি সিংহ বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানি বৃহৎ পুঁজিপতিরা পূর্ববাংলার উপর এক ধরনের ঔপনিবেশিক শোষণ চালাচ্ছে এবং ওই শোষণ খতম করতে হবে, এটা আমাদের পার্টির একটা মৌলনীতি। সেজন্য জনগণকে সচেতন করে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সংগ্রাম করতে হবে। এখনই স্বাধীন পূর্ববাংলার দাবি তোলা হবে অপরিণত এবং রাজনৈতিকভাবে ভুল পদক্ষেপ। এতে দেশবাসীর মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা সহজ হবে, লাভবান হবে শাসকগোষ্ঠী। জানেন তো, যে-কোনো আন্দোলনকে সফল করতে হলে দাবিদাওয়া তুলতে হয় জনসাধারণের সচেতনতার মাত্রা অনুযায়ী। কাজেই বর্তমান পরিস্থিতি ২১-দফা কর্মসূচি মোতাবেক পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপনই হবে সঠিক ও বাস্তবসম্মত।

এইসব যুক্তি ও পালটা যুক্তির মধ্যে তৃতীয় দিনের বৈঠক শেষ হয়েছিল। কথা রইল উভয়পক্ষ পরস্পরের বক্তব্য আরও গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনা করবেন এবং পরবর্তী বৈঠকে চূড়ান্ত মতামত জানাবেন। এদিনের বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয় বন্ধুত্বমূলক পরিবেশে। মতপার্থক্য সত্ত্বেও কোনোরূপ তিক্ততা সৃষ্টি হয়নি বা পরস্পরের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দেয়নি।

চতুর্থ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় এর পাঁচ-ছয় দিন পর। বৈঠকের শুরুতেই শেখ মুজিবুর রহমান বললেন : দাদা, আপনাদেরই জিত হলো। এবারের মতো আপনাদের কথা মেনে নিলাম। 'লিডার'ও আপনাদের মতে সায় দিয়েছেন। তবে আমার কথা থাকল। মনে রাখবেন গরিবের কথা বাসি হলে ফলে।

'লীডার' বলতে শেখ সাহেব শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বুঝিয়েছিলেন; তিনি তখন ঢাকায় ছিলেন। শেখ মুজিব ও মানিক মিয়া এসব বৈঠকের ব্যাপারে নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আলাপ করে থাকবেন।

শেষ পর্যন্ত সামরিক শাসনের অবসান, বন্দিমুক্তি, স্বায়ত্তশাসন, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া প্রভৃতির ভিত্তিতেই আন্দোলনের কর্মসূচি স্থির করা হয়। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কথায় তখনকার মতো স্বাধীনতার দাবি মুলতবি রাখতে রাজি হলেও শেখ সাহেব ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিলেন। এর স্বীকৃতি রয়েছে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের স্মৃতিকথায়। স্বাধীন পূর্ববাংলার দাবিতে শেখ সাহেবের আরও একটি গোপন উদ্যোগ সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যা গবেষকদের অনুসন্ধানের দাবি রাখে।

আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ ও চূড়ান্ত বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি। স্থির হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্দোলন শুরু করার জন্য উভয় দল যৌথ উদ্যোগ নেবে। সামরিক আইনের কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যে ছাত্ররা ১৯৬১ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে মৌন মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদির আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয় ১৯৬২'র শহীদদিবস আরও ব্যাপক ভিত্তিতে পালনের উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং ঐদিন থেকেই সূচনা করা হবে সামরিক শাসনবিরোধী ছাত্র-গণআন্দোলনের।

আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির সমঝোতার কথা উভয় দলের ছাত্রফ্রন্টের নেতাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। এরই সূত্র ধরে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের মধ্যে গড়ে ওঠে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট গোপন সমন্বয় কমিটি। এর নেতৃত্বে ছিলেন মোহাম্মদ ফরহাদ ও শেখ মণি। আন্দোলনের প্রস্তুতি চলতে থাকে ছাত্রলীগ ছাত্র ইউনিয়নের গোপন কমিটির প্রথম বৈঠক বসে জানুয়ারির প্রথম দিকে শেখ মণির আরামবাগের বাসায়। উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগের তরফ থেকে শেখ মণি, আনিসুর রহমান (ফরিদপুর) ও আসমত আলী শিকদার। ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ ফরহাদ ও বজলুর রহমান।

ঘটনা সবসময় পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটে না। প্রস্তুতিপর্ব শেষ হওয়ার আগেই ঘাড়ের উপর এসে পড়ল আন্দোলন। ঢাকা থেকে করাচী ফিরে যাওয়ার পর ২৯ জানুয়ারি (১৯৬২) শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন। গণ-অসন্তোষের আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ স্থির করেন আন্দোলন শুরুর এখনই প্রকৃষ্ট সুযোগ। ৩১ জানুয়ারি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয় ধর্মঘট। সে-আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে গোটা পূর্ববাংলায়। সামরিক শাসনবিরোধী বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনের সে কাহিনী অন্যত্র বলা যাবে।

আগে যে-কথা বলছিলাম। ১৯৬২'র আন্দোলনের নেপথ্য প্রস্তুতি উপলক্ষে আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ-নেতৃত্বের মধ্যে যে-সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল, এদেশের রাজনীতিতে তার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সত্ত্বেও চারদিনের বৈঠকে পারস্পরের ভালোভাবে জানবার ও বুঝবার সুযোগ হয়। পরস্পরের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা সম্পর্কে দুতরফের মনেই গড়ে ওঠে গভীর আস্থা। সম্প্রতি কলকাতা থেকে লেখা দুটি চিঠিতে খোকা রায় জানান, শেখ মুজিবের খোলামেলা বক্তব্য আমাদের খুব ভালো লেগেছিল। মণিদার ও আমার দুজনেরই দৃঢ় আস্থা জন্মেছিল যে শেখ মুজিব ও মানিক মিয়া আমাদের সাথে খুব খোলাখুলি ও আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। কোথাও কোনো ফাঁকিঝুকি বা ঘোরপ্যাঁচ ছিল না। শেখ মুজিবের কথাবার্তায় সবসময় একটা মানসিক আবেগ ফুটে উঠত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শেখ মুজিব ছিলেন একটি খাঁটি বাঙালি দেশপ্রেমিক—সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্নে আত্মনিবেদিত।

শেখ মুজিবুর রহমানের মনে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে কোনো বিদ্বেষ বা সংস্কার ছিল না। স্বাধীনতার আগে শেখ মুজিবের সঙ্গে মণি সিংহ বা খোকা রায়ের আর কখনো দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। অনুমান করা যায় ১৯৬১'র নভেম্বর-ডিসেম্বরের চার-দফা বৈঠক শেখ মুজিবের মনেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। ১৯৬১ থেকে ১৯৭৫-এই দীর্ঘ চোদ্দ বছরের উত্তাল রাজনৈতিক কালপর্বে তিনি কখনো কমিউনিস্টবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এমন নজির নেই। মানিক মিয়াকে লোকে সাধারণভাবে পাশ্চাত্যঘেঁষা কমিউনিস্টবিরোধী বলে জানত। তাঁর মুখ থেকেও ১৯৬২ সালে মণি সিংহ ও খোকা রায় সম্পর্কে বহু সশ্রদ্ধ মন্তব্য শুনেছি। গোটা ষাটের দশক জুড়ে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল ইতিবাচক।

শুধু ১৯৬২'র ছাত্র আন্দোলন নয়, পরবর্তীকালে ছয়-দফা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন, ছাত্রদের এগারো দফা কর্মসূচি রচনা ও তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশ গড়ার কাজে দুই দলের সহযোগিতামূলক নীতি—এসবের পেছনে ওই বৈঠকের প্রভাব কিছু-না-কিছু বললে বাড়িয়ে বলা হবে না।*

প্রথম প্রকাশ : সাপ্তাহিক "একতা", ঢাকা, ১৯ অগস্ট, ১৯৮৮

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা

ড. মো. মাহবুবর রহমান

১. ভূমিকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র সাড়ে তিন বছর (১০.০১.১৯৭২ থেকে ১৪.০৮.১৯৭৫) বাংলাদেশের সরকারপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে তিনি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পুনর্গঠন করেন। এই ছোট প্রবন্ধে সেই অবদানের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২. যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের চিত্র

(ক) কৃষি : বঙ্গবন্ধু যখন সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন এই দেশটি নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তান-বাহিনীর জ্বালাও পোড়াও নীতির ফলে হয়ে পড়েছিল এক যুদ্ধবিধ্বস্ত ভূখণ্ড। দেশের ৮৫ ভাগ মানুষ যে-কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল তার পুনর্বাসন কাজ ছিল এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস খাদ্যশস্য উৎপাদন এমনিতেই বিঘ্নিত হয়েছিল; উপরন্তু পাকিস্তানি-বাহিনী পরাজয়ের পূর্বমুহূর্তে সরকারি খাদ্যগুদামে মজুদ খাদ্যশস্য, শস্যবীজ,সার ও কীটনাশক ওষুধ ধ্বংস করেছিল। তা ছাড়া, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি-বাহিনী ও রাজাকার-দালাল কর্তৃক কয়েক লক্ষ হালের বলদ ও গাভী জবাই করে মাংস খাওয়ায় হালচাষের জন্য গবাদি পশুর সংকট দেখা দেয়। কৃষি ধ্বংস হওয়ায় ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ৪০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি হয়। এমনই সংকটময় পরিস্থিতিতে সরকারকে ৯০ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি, আটককৃত ৩৭ হাজার রাজাকার ও দালাল এবং সোয়া লক্ষ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর খাদ্য সরবরাহের এক কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়

(খ) ধ্বংসপ্রাপ্ত বসতবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অফিসভবন : পাকিস্তানি-বাহিনী সারা বাংলাদেশে প্রায় ৪০ লক্ষ বসতবাড়ি, ১৯ হাজার গ্রাম্য হাটবাজার, ৩ হাজার অফিসভবন, ৬ হাজার প্রাইমারি স্কুল ও মাদ্রাসা এবং ৯০০ কলেজ পুড়িয়ে দেয়। সে সময় এসবের আসবাবপত্র, বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

(গ) অবকাঠামো ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি ও সংকট : মুক্তিযুদ্ধের সময় ৩০০টি রেলসেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রায় ২০০ মাইল দীর্ঘ রেললাইনের সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিসাধন হয়। সরকারি পরিবহণের শত শত বাস ও ট্রাক ধ্বংস করা হয়। প্রায় ৩ হাজার বড় বড় মালবাহী নৌকা পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হয়। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে 'মাইন' পোঁতার কারণে বন্দর দুটি অকার্যকর হয়ে পড়ে। দেশের বিমানবন্দরসমূহের রানওয়ের ক্ষতি সাধিত হয়। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল বিপর্যস্ত। সারাদেশে বিদ্যুৎপোলগুলো ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিদ্যুৎলাইন বিছিন্ন, সাব-স্টেশনগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত, গোডাউনে বিদ্যুৎ তার কিংবা খুঁটি কিছুই মজুদ ছিল না। বিদ্যুৎ খুঁটি ও তার সবকিছুই ছিল আমদানিযোগ্য পণ্য।

দেশের ব্যাংকি সেক্টরকে দাঁড় করানো নতুন সরকারের জন্য ছিল এক কঠিন কাজ। আত্মসমর্পণের পূর্বে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত কাগজের নোট, প্রয়োজনীয় দলিল ও ফাইল পুড়িয়ে দেয়। সে-সময় ব্যাংকগুলো হয়ে পড়ে তহবিলশূন্য। শিল্প কলকারখানাতে আমদানিযোগ্য কাঁচামালের সংকট দেখা দেয়।

(ঘ) বিপর্যস্ত শিক্ষা কার্যক্রম ও বেসামরিক প্রশাসনিক কাঠামো এবং দক্ষ জনবল সংকট : মুক্তিযুদ্ধের সময় কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অফিসভবনই পোড়ানো হয়নি, অসংখ্য শিক্ষক শহীদ হওয়ায় সে-পদগুলো পূরণের প্রয়োজন হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের উপযোগী পাঠ্যবই রচনা ও প্রকাশের এক গুরুদায়িত্বও সরকারকে পালন করতে হয়। তা ছাড়া দেশ গঠনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজন ছিল দক্ষ প্রকৌশলি, কৃষিবিদ, ব্যাংকার এবং এমনকি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যবসায়ীবর্গের। ডাক, তার, রেল প্রভৃতি সেক্টরেও অভিজ্ঞ কর্মীর প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তান আমলে অবাঙালিরা এসব অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করত। মুক্তিযুদ্ধের পর তারা আত্মগোপন করায় নতুন রাষ্ট্রে দক্ষ কর্মীর অভাব দেখা দেয়।

(ঙ) সংবিধান প্রণয়ন ও আইনের শূন্যতা পূরণ : নতুন সরকারকে একটি সংবিধান-প্রণয়ন ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয়। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতিলাভ, জাতিসংঘের সকল আন্তর্জাতিক সংস্কার সদস্যপদ অর্জন, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক অনুদান লাভ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি কাজগুলোও করতে হয় বঙ্গবন্ধু সরকারকে।

(চ) সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা : বঙ্গবন্ধুর সরকারকে তাৎক্ষণিকভাবে কতকগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়, যেমন :

১. দেশের জনগণের আকাশচুম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করা, ১১-দফায় উল্লেখিত দাবিগুলো, যেমন ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ, ব্যাংক-বীমা, পাটব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করা, কৃষকদের খাজনা কমানো, বকেয়া খাজনা মওকুফ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা।

২. মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পুনর্বাসন করা। শহীদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারর্গকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা।
৩. দালালদের আটক করে বিচারের সম্মুখীন করা।
৪. পাকিস্তানে আটক বাঙালিদেরকে ফিরিয়ে আনা।
৫. ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ভারতে ফেরত পাঠানো।
৬. সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ করা।
৭. আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে মূল্যবৃদ্ধিজনিত প্রভাব, বাংলাদেশকে ঘিরে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিনাশের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি মোকাবিলা করা বঙ্গবন্ধু সরকারের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়।
৮। সর্বোপরি বিরোধী রাজনীতি—যেমন জাসদ ও সর্বহারা পার্টির সরকারবিরোধী কার্যকলাপ নতুন সরকারের জন্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

৩. বঙ্গবন্ধুর অবদান :

(ক) সংবিধান প্রণয়ন ও আইনের শূন্যতা পূরণ : বঙ্গবন্ধুর সরকার মাত্র এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান জাতিকে উপহার দেন (১৬.১২.১৯৭২)। সংবিধানটি ছিল একটি ব্যাপক ও সুলিখিত দলিল এবং এই উপমহাদেশের অন্যান্য সংবিধানের তুলনায় উন্নতমানের। নতুন সংবিধানের ভিত্তিতে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আইনের শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সরকার ১৬.১২.১৯৭১ থেকে ১৫.১২.১৯৭২ পর্যন্ত এক বছরে প্রায় দেড়শত আইন প্রণয়ন করেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আইন, যেমন :

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলীকরণ আইন (৩.১.১৯৭২)।
২. পাট, বস্ত্র ও চিনিকলসমূহ, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণ করে আইন পাশ (২৫.৩.১৯৭২)।
৩. বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অধ্যাদেশ ১৯৭২ জারি (২৪.১.১৯৭২)। এই আইনের আওতায় সারা দেশে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। ২৪.১.১৯৭২ থেকে ৩০.১১.১৯৭৩ পর্যন্ত ৩৭,৪৭১ জন দালাল গ্রেফতার করা হয়। এ-সময় ৭৫২ জন দালাল দণ্ডিত হয়।

(খ) কৃষকদের কল্যাণ সাধন : কৃষকের কল্যাণার্থে বঙ্গবন্ধু কতকগুলো সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১. সকল বকেয়া খাজনা মওকুফসহ পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন (২৬.৩.১৯৭২)।
২. পরিবারপিছু সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা সিলিং নির্ধারণ করেন।

৩. প্রায় ৩০ কোটি টাকার কৃষিঋণ বিতরণ করেন।
৪. কৃষকদের মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার গাভী বিতরণ করেন।
৫. ১৯৭৩-৭৪ সেশনে কৃষকদের জন্য ৪০ হাজার পাম্পের ব্যবস্থা করেন।
৬. সফল, নিষ্ঠাবান ও উৎসাহী কৃষকদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার' নামে জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করেন।
৭. ফারাক্কা বিষয়ে আলোচনার জন্য বিশিষ্ট পানিবিজ্ঞানী বি. এম. আব্বাসকে দিল্লি পাঠান এবং শুকনো মৌসুমে পদ্মানদীতে ৫৪,০০০ কিউসেক পানির নিশ্চয়তা লাভ করেন।
৮. বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প পূর্ণোদ্যমে চালুর ব্যবস্থা করেন।

(গ) শিক্ষার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান :

১. বঙ্গবন্ধু দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেন। ফলে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি সরকারি হয়। আর্থিক সংকট থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু সরকার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করেন। তা ছাড়া তিনি দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ৫ মাসের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কিন্তু কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের পূর্বেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়।
২. বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়ন করেন।
৩. বঙ্গবন্ধু শিক্ষকদের ৯ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ এবং ৯০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাইস্কুল ভবন পুনর্নির্মাণ করেন।

(ঘ) অর্থনৈতিক পুনর্গঠন : বঙ্গবন্ধু সরকার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে যে-সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. বঙ্গবন্ধু সরকার পাঁচশালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) প্রণয়ন করেন।
২. বঙ্গবন্ধু চারটি নতুন করপোরেশন গঠন করেন, যেমন
   — বাংলাদেশে জুট করপোরেশন
   — বাংলাদেশ সুগার করপোরেশন
   — বাংলাদেশ টেক্সটাইল করপোরেশন
   — বাংলাদেশ গ্যাস অ্যান্ড অয়েল করপোরেশন
৩. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ শিল্পঋণ সংস্থা, বাংলাদেশ শিল্পব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি-ব্যাংক গঠন করেন।
৪. সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন কমিশন ও ১০ স্তরবিশিষ্ট নতুন বেতন-স্কেল বাস্তবায়ন করেন (জুলাই, ১৯৭৩)। শ্রমিকদের কল্যাণের

লক্ষ্যেই তিনি জাতীয়করণের নীতি গ্রহণ এবং শ্রমিকদের জন্য নতুন বেতন-কাঠামো ঘোষণা করেছিলেন।

৫. গ্রামবাংলার উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সমন্বিত পল্লী-উন্নয়ন কর্মসূচি (IRDP)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

৬. বঙ্গবন্ধু শাসনামলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বছরে শতকরা ৭ ভাগেও বেশি অর্জিত হয়েছিল।

(ঙ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন : যোগাযোগব্যবস্থার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেন। ১৯৭৪ সালের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল ব্রিজ-সেতু নির্মাণ সমাপ্ত করা ছাড়াও ৯৭টি সড়ক-সেতু নির্মাণ করেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত রেলসেতুগুলোর পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি যমুনানদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। এ-উদ্দেশ্যে গঠিত কমিশন ১৯৭৪ সালের ৪ নভেম্বর যমুনা সেতুর প্রাথমিক সম্ভাব্যতা রিপোর্ট প্রণয়ন করেন।

বঙ্গবন্ধুর বিশেষ প্রচেষ্টায় ১৯৭২ সালের ৭ মার্চের মধ্যেই ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-যশোর ও ঢাকা-কুমিল্লা রুটে বিমান চলাচল শুরু হয়। তিনি আন্তর্জাতিক রুটে একটি বোয়িং সংযোজন করেন। ১৯৭৩ সালের ১৮ জুন ঢাকা-লন্ডন রুটে বিমানের ফ্লাইট চালু হয়। কুর্মিটোলার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের কাজ শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে। বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পরিবহণ এবং নদীপথসমূহ সুষ্ঠু পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক জলযানের ব্যবস্থা করে নৌযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ৫৫,০০০ টেলিফোন চালুর ব্যবস্থা করেন। বহির্বিশ্বের সাথে টেলিযোগাযোগ স্থাপনের জন্য তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূ-উপগ্রহ স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করেন।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধু অবদান রাখেন। তিনি ৫,০০০ বিদ্যুৎ পোল আমদানি করেন। ১৯৭২-এর ডিসেম্বরের মধ্যে ১৫০০ কি. মি. দীর্ঘ নতুন বিদ্যুৎলাইন স্থাপন ও ৩০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৩ সালে দেশব্যাপী পল্লী-বিদ্যুৎ কর্মসূচি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়। এমনকি সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে পল্লী বিদ্যুতায়নের প্রতিশ্রুতি সন্নিবেশিত হয়।

(চ) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম : বঙ্গবন্ধুর সরকার ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী এক কোটি শরণার্থীদের তাদের স্ব স্ব বাসস্থানে পুনর্বাসন করেন। এ ছাড়া তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৩ লক্ষ বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

(ছ) আদমশুমারি : বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৪ সালের ৮ জুন বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি সম্পন্ন করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে এক অসাধারণ কাজ সম্পন্ন করেন।

(জ) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ : দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর শত আর্থিক সংকট থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী বাহিনীরূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। ১৯৭২ সালের ৬ মার্চ তিনি বি. ডি. আর. বাহিনী গঠনের নির্দেশ দেন। ৮.৪.১৯৭২ তারিখে পদাতিক, নৌ ও বিহানবাহিনী গঠনের লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। ১১.৩.১৯৭৪ তারিখে তিনি কুমিল্লায় বাংলাদেশের প্রথম সামরিক একাডেমী উদ্বোধন করেন। প্রতিরক্ষা বাহিনীকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু যুগোস্লাভিয়া থেকে ক্ষুদ্র অশস্ত্র ও সাঁজোয়া-বাহিনীর জন্য ভারী অস্ত্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মিগ বিমান, হেলিকপ্টার ও পরিবহণ বিমান, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য থেকে বিমানবাহিনীর জন্য হেলিকপ্টার, মিশর থেকে সাঁজোয়া গাড়ি বা ট্যাংক (যা পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে চক্রান্তকারীরা ব্যবহার করে) সংগ্রহ করেন। এ ছাড়া ভারতের অনুদানে ৩০ কোটি টাকায় সেনাবাহিনীর জন্য পোশাক ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ৩০ হাজারেরও অধিক সামরিক সদস্যকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসিত করেন। এভাবে বঙ্গবন্ধু প্রায় ৫০ হাজার সদস্যের একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেন।

(ঝ) পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে সফলতা : পররাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর বাংলাদেশের প্রত্যাবর্তনের মাত্র দুই মাস সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন (১২.৩.১৯৭২)। বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশে ৪.৪.১৯৭২ তারিখে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি, ১০.৫.১৯৭২ তারিখে আন্তর্জাতিক তহবিল সংস্থার সদস্যপদ এবং ১০.৯.১৯৭৪ তারিখে জাতিসংঘের সদস্যপদসহ ১২১টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করেন। বঙ্গবন্ধু ২৫.৯.১৯৭৪ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করে বাঙালির মাতৃভাষার মর্যাদাকে বিশ্বের দরবারে উন্নত করেন।

(ঞ) মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংরক্ষণ : বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের স্মরণে ৯.৩.১৯৭২ তারিখে সাভার ও মেহেরপুর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন করেন। ১৬১২.১৯৭২ তারিখে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের এবং ২২. ১২. ১৯৭২ তারিখে ঢাকার মীরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধুর সরকারের শাসনামলে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠিত হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত মূল্যায়ন, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের পুনর্বাসন প্রভৃতি কাজেও বঙ্গবন্ধু গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

(ট) সমাজসংস্কারমূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুর অবদান : বঙ্গবন্ধু ক্ষমতাগ্রহণের তিন দিনের মধ্যেই (১৫.১.১৯৭২) এক সরকারি আদেশের মাধ্যমে

মদ, জুয়া, হাউজি, ঘোড়দৌড় নিষিদ্ধ করেন এবং একই সাথে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানকে সোহরাওয়াদী উদ্যান হিসেবে ঘোষণা দেন। তিনি ২৪.৫.১৯৭২ তারিখে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে ঢাকায় আনেন এবং তাঁকে জাতীয় কবির মর্যাদা দান করেন। তিনি ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমী স্থাপন করেন এবং ঢাকার রামপুরায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্থায়ী নতুন ভবন উদ্বোধন করেন। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়— এই আদর্শে বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিশ্ব এজতেমার জন্য টঙ্গীতে জমি বরাদ্দ করেন।

৪. মূল্যায়ন : এভাবে আমরা দেখি বঙ্গবন্ধু মাত্র তিন বছর সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে একটি মর্যাদাসম্পন্ন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তিনি এগারো হাজার কোটি টাকার ধ্বংস্তূপের উপর আরও তেরো হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন স্তম্ভ দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সে-রাতে ৩২ নম্বরে সর্বশেষ হত্যাটি ছিল শিশু রাসেলের

আলহাজ আ. ফ. ম. মুহিতুল ইসলাম মুহিত

দেশ স্বাধীন হলো। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে ফিরে এলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমরা যশোহর জেলা থেকে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে অস্ত্র জমা দিতে এলাম। কাছে মুজিববাহিনীর চার আঞ্চলিক প্রধানের অস্ত্র সমর্পণ-এর মাধ্যমে অস্ত্র জমা দেয়া শুরু হলো। এই প্রথম বঙ্গবন্ধুকে দেখলাম। মনে হয়েছিল আজ আমি ধন্য। মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে আমার অতি প্রিয় ব্যক্তিত্ব, আমার সারা জীবনের স্বপ্নের মানুষকে স্বচক্ষে দেখলাম। আমি জমা দিয়েছিলাম একটি স্টেনগান।

অস্ত্র জমা দিয়ে এলাম সচিবালয়ে। বাংলাদেশ সরকারের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আমার এক আত্মীয়ের কাছে আমার মেজো ভাই-এর চাকরির তদবিরে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সেই আত্মীয় ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার পক্ষে সম্ভব না চাকরি দেওয়া।' প্রতিউত্তরে আমি বলেছিলাম, "আপনি যদি চাকুরি না দেন তা হলে আমি ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে সারা সচিবালয়ে বলে বেড়াব আপনি আমার আত্মীয়।' জানি না সেদিন ওনার কি মনে হয়েছিল। হঠাৎ করে উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি চাকারি করব কী না। আমি জানতে চাইলাম কোন ডিপার্টমেন্টে। উনি বললেন, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে, গণভবনে। আমার শরীরে এক অপূর্ব শিহরন জাগল। না চাইতেই বৃষ্টি। আমি আমার স্বপ্নের মানুষের কাছে চাকুরি করব। আমি আনন্দে আত্মহারা। অনেকক্ষণ বসেছিলাম। উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে আবারও জিজ্ঞাসা করলেন। আমি দ্বিতীয় বাক্যবিনিময় না করে রাজি হয়ে গেলাম। ১৩-১২-১৯৭২ ইং তারিখ আমি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে অফিস-সহকারী হিসাবে যোগদান করলাম।

অল্প দিনে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় সহকর্মীদের সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে গেলাম। ১৯৭৩ সালে বন্যাপীড়িতদের জন্য এক দিনের বেতন সংগ্রহ করে বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিতে গেলাম। আমরা যে-কয়জন গিয়েছিলাম ব্যক্তিগত পরিচয় নিয়ে, তাদের সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু বললেন, "তোরা এক দিনের বেতন দিলি? তোরা এক দিন খাবি কী? এমনিই তোদের পূর্ণ বেতন দিতে পারি না।" সেইদিন আমার মধ্যে আরও আকর্ষণ জাগল ওনার আরও কাছে যাওয়ার

জন্য। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত, সেই সুযোগ এনে দিলেন আল্লাহ্। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের অভ্যর্থনাকারী-কাম-ব্যক্তিগত সহকারী চারজন প্রমোশন নিয়ে চলে যাচ্ছে, সেখানে রাষ্ট্রপতির সচিবালয় গণভবন থেকে চারজন ছেলেকে নেওয়া হবে। যারা আগ্রহী তাদের আবেদন করতে বলা হল। আমরা অনেকে আবেদন করলাম।

ইন্টারভিউ শুরু হল। বোর্ডে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার মাজহারুল হক, উপ-সচিব (প্রশাসন) মকবুল আহমেদ, প্রধানমন্ত্রীর তৎকালীন সচিব মহিউদ্দিন খান আলমগীর সাহেবের শ্বশুর ও সেকশন অফিসার (প্রশাসন) ইয়াছিন সাহেব। মোঃ ইয়াকুব হোসেন খান, আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী, মিঃ ছাফদার ও আমাকে সিলেক্ট করা হল। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে রাষ্ট্রপতির বাসভবনের ৩২ নং বাড়ির অভ্যর্থনাকারী-কাম- ব্যক্তিগত সহকারী হিসাবে যোগদান করলাম, আমার স্বপ্ন সার্থক হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিলাম। বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত আপনজন রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের সেকশান অফিসার জনাব আলাউল হক সাহেব ঐ বাড়ির সবার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। যথারীতি আমরা আমাদের ডিউটি শুরু করে দিলাম। গাড়িবারান্দা দিয়ে উঠেই হাতের বাঁয়ে ছিল আমাদের অফিসরুম। আমাদের সামনের রুমে বসতেন পুলিশের সহকারী কমিশনার ডি. এস. পি।

একদিন দুপুর দুটা থেকে আমার ডিউটি, হঠাৎ দুটা ত্রিশ মিনিটে বঙ্গবন্ধুর গাড়ি বারিন্দায় এসে থামল। গাড়ি থেকে নামলেন তিনি। ভিতরে যাচ্ছিলেন, সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ালাম। হঠাৎ আমার দিকে ফিরলেন, কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, "এই শয়তান, তুই ছিলি গণভবনে, এখানে এলি কিভাবে?" বলেই আমার সামনের চেয়ারে বসে পড়লেন। আমি তখনও দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, দেশের রাষ্ট্রপতি আমার সামনের সাধারণ চেয়ারে বসে আছেন। উনি আমাকে ধমক দিলেন। আবার বলেন, "দাঁড়িয়ে কেন, বসে পড়।" আমি ইতস্তত করছিলাম। বসার জন্য আবারও নির্দেশ দিলেন। আমি বসলাম। 'মহিত এই বয়সে লেখাপড়া না করে চাকরিতে কেন এলি?" কয় ভাইবোন, বাবা-মা বেঁচে আছেন কি না আমার কাছে জানতে চাইলেন বঙ্গবন্ধু। সেই মুহূর্তে একটা টেলিফোন এল, সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার মাশহারুল হক বঙ্গবন্ধুকে চাইলেন। আমার সামনে বসেই কথা বললেন। তারপর আমার গালে ছোট্ট একটা টোকা দিয়ে উপরে উঠে গেলেন। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, ওনার কাছাকাছি ইতিপূর্বে মাত্র একদিন গিয়েছিলাম বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে এক দিনের বেতন স্থানান্তর করতে : একজন ব্যস্ত মানুষের পক্ষে এটা মনে রাখার মতো নয়। কীভাবে আমার নাম ওনার মনে থাকল! যতই ভাবছিলাম ততই অবাক হচ্ছিলাম।

আজ আরও কিছু যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি মনে পড়ে। কোনো-এক রোজার ঈদের আগে আমরা তিন সহকর্মী প্রোগ্রাম করলাম এবার ঈদে আমরা দেশে না যেয়ে ঢাকায় ঈদ করব। আমাদের ইচ্ছাটা বেগম মুজিবকে জানালাম। বেগম মুজিব

আমাদের ইচ্ছাটা জেনে খুশি হয়ে আমাদের ঈদের কাপড় কেনার জন্য টাকা দিলেন।

দিনটি ছিল ঈদের তিন দিন পূর্বে। সকাল আটটা থেকে দুপুর দুটা পর্যন্ত আমার ডিউটি। আমার সহকর্মী তখনও এসে পৌছায়নি। দুপুরে বঙ্গবন্ধুর গাড়ি বারান্দায় এসে থামল। তিনি গাড়ি থেমে নামলেন; সাথে সিকিউরিটি অফিসার ফারুক আহমেদ বাচ্চু। বারান্দা পার হয়ে উপরে উঠতে যাচ্ছিলেন।

সিঁড়ির কাছাকাছি গিয়ে আবারও তিনি এলেন আমার অফিসকক্ষে। তখন সিকিউরিটি অফিসার বাচ্চু ভাই আমার সামনে বসে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে দেখে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। উনি কোনো ভূমিকা না করেই প্রশ্ন করলেন, "এই ঈদের আর কতদিন বাকি রে?" আমি উত্তর দিলাম, "তিন দিন বাকি।" "ঈদের তিন দিন বাকি, কিন্তু তুই দেশে না যেয়ে এখানে কেন?" আমি কী জওয়ার দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ একটা মিথ্যার আশ্রয় নিলাম। বললাম, আম্মা (বেগম মুজিব) যেতে নিষেধ করেছেন। ভেবেছিলাম এই মিথ্যা দিয়ে পার পেয়ে যাব। কিন্তু বিধি বাম। উনি আমাদের অফিসকক্ষ থেকে উচ্চস্বরে বেগম মুজিবকে ডাকতে লাগলেন। বেগম মুজিবও হন্তদন্ত হয়ে আমাদের অফিসকক্ষে আসলেন। এসে আমার দিকে এক পলক তাকালেন। তারপর বঙ্গবন্ধুকে বললেন, "কী হয়েছে।" ততক্ষণে আমি ভয়ে বেড়ালটি হয়ে গেছি। আমার বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, 'ঈদে এদের বাড়ি যেতে নিষেধ করেছ কেন? জানো এই হতচ্ছাড়া ওর মায়ের শেষ সন্তান। ওর মা অসুস্থ। ঈদের দিনে সবাই আনন্দ করবে, আর ওর মা ওর জন্য চোখের পানি ফেলবে আর সারাক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। আমি যদি কালকে ওকে এখানে দেখি তাহলে ওকে আমি আছাড় দিয়ে মেরে ফেলব।" বেগম মুজিব আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন, আর মিট মিট করে হাসছিলেন। বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি বলেছিলাম থাকতে, ভুল হয়েছে; কালকে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব। তুমি উপরে যাও।" বঙ্গবন্ধু উপরে চলে গেলেন। বেগম মুজিব বললেন, "কী, শুনলি তো? খেয়েছিলি তো মার। আগামীকাল বাড়ি চলে যাবি" বলে উনিও চলে গেলেন। সমূহ বিপদ থেকে বাঁচার আনন্দে চোখ ফেটে পানি এল। নিজ সন্তানকে মায়েরা যেমন সমূহ বিপদ থেকে আগলে রাখার চেষ্টা করে বেগম মুজিবও তা-ই করলেন। সেদিন মনে হয়েছিল আমিও ওনার আর-এক সন্তান। বারবার মনে প্রশ্ন জাগছিল, সত্যি কি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির বাড়িতে চাকরি করছি!

১৯৭৫ সালের চৌঠা মার্চ। আমার রাতে ডিউটি। বাসা থেকে রাত আটটায় এলাম। রাত বারোটা পর্যন্ত চেয়ারে বসে ডিউটি করলাম। রাত এগারোটার পরে ঐ বাড়ি কেউ কোনোদিন কোনো টেলিফোন লাগাতে বলেনি। রাত একটার দিকে লুঙ্গি, গেঞ্জি আর টেলিফোন সেট মাথার নিচে দিয়ে ডিউটি টেবিলে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ একটা গম্ভীর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আছেন

স্বয়ং রাষ্ট্রপতি; ডি. এস. পি. সাহেবও দাঁড়িয়ে আছেন; ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম চাকরিটা আজ থাকবে না। উনি আবহাওয়া অফিসে টেলিফোন লাগাতে বললেন। কম্পিত হাতে টেলিফোন লাগালাম। চট্টগ্রামের অবস্থা জানতে চাইলেন। টেলিফোনে কথা শেষ করার পর ওনার মুখের অবস্থা বেশ স্বাভাবিক হয়ে এল। ঢাকার আকাশে তখনও প্রচুর মেঘ। ইতিপূর্বেও দেখেছি আকাশে মেঘ থাকলে উনি ঘুমাতেন না। বঙ্গবন্ধু সামনের চেয়ারে বসলেন। গণভবনের কন্ট্রোলারকে টেলিফোন লাগাতে বললেন। তখন আমি মোটামুটি শিওর আজ থেকে আমার চাকরি থাকবে না। টেলিফোন লাগালাম। কন্ট্রোলার সাহেব টেলিফোন ধরলেন। বললাম, "স্যার কথা বলবেন।" আমি বঙ্গবন্ধুর হাতে রিসিভার দিলাম। বঙ্গবন্ধু কন্ট্রোলার সাহেবকে আসতে বললেন সকালে। তারপর উনি উপরে উঠে গেলেন। সারা রাত আর ঘুম হল না। ভাবছিলাম সকালেই হয়তো এই বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে যেতে হবে। সকাল সাতটায় কন্ট্রোলার সাহেব এলেন। আমার সামনে বসলেন। বঙ্গবন্ধুকে খবর দিলাম। বঙ্গবন্ধু গেঞ্জি গায়ে নিচে এসেই কন্ট্রোলার সাহেবকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, "তোমার বাসায় খাট কয়টা; ওগুলো সরকারি কি না? একদিন আমি নিচে এসে দেখি একজন গ্রিলে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে, আর একজন টেবিলে ফোন মাথায় দিয়ে ঘুমায়। এই বৃদ্ধ ডি. এস. পি. সারারাত চেয়ারে বসে থাকে। ওরা কি দুই-গ্গএকটা খাট পেতে পারে না?" কন্ট্রোলার সাহেব বললেন, "স্যার ওনাদের তো নাইট ডিউটি।" বঙ্গবন্ধু তখন গর্জে উঠলেন, "গেটে পুলিশ পাহারা, আর্মি পাহারা থাকতে ঘরের মধ্যে সারারাত জেগে শেখ মুজিবকে পাহারা দিতে হবে? আজকের মধ্যে আমি ওদের শোবার ব্যবস্থা চাই।" সেদিনই দুটি খাট এসে গেল, যে-দুটি খাট ড্রইংরুমের পিছনে ছিল।

১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্টের রাত। রাত্রিতে ডিউটি ছিল আমার সহকর্মী ছাফদারেরগ্গ। কিন্তু ওর রাতে ব্যক্তিগত কাজ থাকায় আমাকে ডিউটি করতে অনুরোধ করল। আমার দুপুরের ডিউটি ছাফদার করল। রাত আটটায় বঙ্গবন্ধুর বাসভবন বত্রিশ নম্বরে পৌঁছলাম। ছাফদার চলে গেল। রাত বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত গেটে পাহারারত আর্মিদের সাথে গল্প করলাম। একটা দশে আমাদের জন্য নির্ধারিত বিছানায় শুতে এলাম লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ টেলিফোন মিস্ত্রি মতিন আমাকে ধাক্কা দিয়ে ওঠাল; বলল প্রেসিডেন্ট সাহেব আপনাকে টেলিফোনে ডাকছে। সম্ভবত তখন সময় ভোর চারটা ত্রিশ বা পাঁচটা। চারিদিকে বেশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। আমি তড়িঘড়ি করে এসে টেলিফোন ধরলাম। বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন, "সেরনিয়াবতের বাসায় দুষ্কৃতিকারীরা আক্রমণ করেছে, জলদি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে টেলিফোন লাগা।" আমি টেলিফোন লাগানোর চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু পাচ্ছিলাম না। তারপর গণভবন এক্সচেঞ্জে চেষ্টা করছি। সে-মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু আমার সামনে আসলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হলো পুলিশ কন্ট্রোল রুমের?" আমি বললাম, "স্যার,

পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ধরছে না।" আমি গণভবন এক্সচেঞ্জকে ধরেছি, আমি বলছিলাম হ্যালো আমি পি.এ. টু প্রেসিডেন্ট বলছি, অপর প্রান্ত থেকে আমার হ্যালোর প্রতিউত্তর দিচ্ছিল না, কিন্তু টেলিফোন রিসিভার সম্ভবত অপারেটরের হাতে ছিল। আমি হ্যালো, হ্যালো, বলে চিৎকার করছিলাম। তখন বঙ্গবন্ধু আমার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে বলেন, "আমি প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব বলছি", ঠিক তখনি এক ঝাঁক গুলি আমাদের অফিসকক্ষের জানালার গ্লাস ভেঙে অফিসকক্ষের দেয়ালে লাগল। অন্য টেলিফোনে চিফ সিকিউরিটি অফিসার মহিউদ্দিন সাহেব টেলিফোন করলেন। আমি ধরলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ভাঙা গ্লাস আমার ডান হাতের কনুয়ের কাছে এসে বিঁধল। কেটে রক্ত ঝরছে। দুই জানালা দিয়ে ভীষণ গুলি আসছে। বঙ্গবন্ধু আমার টেবিলের পাশে শুয়ে পড়লেন। আমি দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। কনুই দিয়ে বেশ রক্ত ঝরছে। বঙ্গবন্ধু আমার হাত ধরে টান দিলেন, বললেন শুয়ে পড়তে। আমিও বঙ্গবন্ধুর পাশে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর গুলি বন্ধ হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু উঠে দাঁড়ালেন। আমি উঠলাম। উপর থেকে কাজের ছেলে আব্দুল ওনার পাঞ্জাবী ও চশমা নিয়ে এল। আমার কক্ষে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবি পরলেন বঙ্গবন্ধু। বারান্দায় এসে ডাকলেন, "এই সেন্ট্রি, পুলিশ, সেন্ট্রি। এত গুলি চলছে, তোমরা কী করো?" বলে উপরে উঠে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর শেখ কামাল ভাই নিচে বারান্দায় এসে বললেন, "আর্মি আর পুলিশ ভাইরা আসুন আমার সাথে"', বলার সাথে সাথে তিন-চারজন কালো পোশাকধারী লোক সামনে এসে দাঁড়াল। আমি ও ডি. এস. পি. নূরুল ইসলাম সাহেব কামাল ভাইয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে। ডি. এস. পি. নূরুল ইসলাম সাহেব আমাকে পিছন দিক থেকে টান দিয়ে অফিসকক্ষের মধ্যে নিয়ে গেলেন। অফিসকক্ষের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের মাঝামাঝি হাত রেখে আমি বাইরে উঁকি দিয়ে দেখছিলাম ওখানে কী হচ্ছে। গুলির শব্দে কামাল ভাই হঠাৎ আমার উপর এসে পড়লেন। ওনার ধাক্কায় আমিও পড়ে গেলাম ওনার পিছনে। উনি আমাকে বললেন, "ভাই আপনি বলুন, আমি শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল।' কালো পোশাকধারীদের সাথে খাকি পোশাকধারীও দেখলাম। আমার ধারণা হলো দুষ্কৃতকারীরা আক্রমণ করেছে। খাকি পোশাকধারীরা আমাদের 'সেভ' করতে এসেছে, হয়তো আমাদেরও দৃষ্কৃতকারী ভাবছে। তাই, আমি বললাম, "ভাই, উনি শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল।" শুনেই ওরা ব্রাশফায়ার করল। শেখ কামাল আমার উরুর উপরে বুক রেখে নীরব হয়ে গেলেন। ওনার বুক ফুঁড়ে একটা গুলি লাগল আমার হাঁটুর মাঝে। কামাল ভাই-এর রক্ত ও আমার রক্তে প্রায় রক্তস্নাত হয়ে গেছি। এ-সময় কোনার পুলিশবক্স থেকে ওদের লক্ষ্য করে গুলি এল। ওরা ঐদিকে পজিশন নিল। ডি. এস. পি. সাহেব কামাল ভাই-এর লাশ ধাক্কা দিয়ে আমাকে বের করে ওনার কক্ষে নিয়ে এলন। ডি. এস. পি. সাহেবের পা দিয়েও প্রচুর রক্ত ঝরছে। ওখানে দেখি এস. বি'র সাব-ইন্সপেক্টর-এর রিভলবার পায়ের

কাছে পড়ে আছে। উনি হতভম্ব দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। ডি. এস. পি. সাহেব আমাদের পিছন-গেট দিয়ে জোর করে বের করে আনলেন। গেটের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে একজন আর্মি আমার চুল ধরে টেনে দাঁড় করাল। ডি. এস. পি. সাহেব অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "স্যার, আমরা সরকারি কর্মচারী। রাতে আমাদের ডিউটি ছিল তাই এসেছি।" আর্মি বলল, 'ঠিক আছে আপনাদের কিছু বলব না। ওখানে লাইনে দাঁড়ান।" দেখি মেইন গেটের সামনে কয়েকজন পুলিশসহ টেলিফোন মিস্ত্রি লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমরাও লাইনে দাঁড়ালাম। টেলিফোন মিস্ত্রি মতিনের পাশে ডি. এস. পি. সাহেব এবং আমি, আমার পরে এসবির সাব-ইন্সপেক্টর দাঁড়াল। হঠাৎ একজন আর্মি এসে এসবি'র সাব-ইন্সপেক্টরকে গুলি করল। গুলি বাম দিকের বুকে লাগে। বুকের রক্ত আমার ও ডি. এস. পি. সাহেবের মুখে লাগে। সাব-ইন্সপেক্টর পড়ে যায়। মুখ দিয়ে এক পশলা রক্ত উঠে এল এবং একটা কাঁপুনি দিয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করল। সাব-ইন্সপেক্টরকে মেরে রাইফেল আমার দিকে তাক করল। সেই মুহূর্তে আর -একজন আর্মি এসে ধমক দিয়ে রাইফেল ছিনিয়ে নিল। বলল, "তোমাকে এদের মারতে কে বলেছে?" ঐ আর্মির আচরণ দেখে মনে হল উনি একজন অফিসার, যদিও তাদের কোনো ব্যাজ ছিল না। ঐ আর্মির জন্য আমার জীবন রক্ষা হল। দেখলাম রাইফেলবিহীন ব্যক্তিকে বারান্দায় নিয়ে রাইফেলটা দিয়ে দিল।

তারপর চার-পাঁচজন আর্মিকে আমাদের পাহারায় রেখে ব্রাশফায়ার করতে করতে উপরে উঠে গেল। কিছুক্ষণ পর বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ শুনতে পেলাম । "আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস....?" পরপরই গুলির শব্দ। মহিলাদের আর্তচিৎকার। এর ভিতর নিচের রান্নাঘর ও গোয়ালঘর থেকে রান্নার বুড়ি ও রাখাল আজিজকে আমাদের লাইনে এনে দাঁড় করাল। উপর থেকে নাসের কাকাকেও নামিয়ে আমাদের লাইনে দাঁড় করাল। নাসের কাকার হাতের আঙুলগুলি গুলিতে উড়ে গেছে। নাসের কাকা বললেন, "স্যার আমি তো রাজনীতি করি না, কোনো রকমে ব্যবসা-বাণিজ্য করে খাই।" পাশে দাঁড়ানো একজন ঘাতক বলল, "শেখ মুজিব বেটার দ্যান নাসের।" যে-ঘাতক গান-পয়েন্টে নাসের কাকাকে নিয়ে এসেছিল সে-ই বলল, "ঠিক আছে, আপনাকে কিছু বলব না, আপনি ঐ কক্ষে গিয়ে বসুন।" বলে আমাদের লাইন থেকে তাঁকে বের করে আবারও গান-পয়েন্টে আমাদের অফিসকক্ষের সাথে অ্যটাস্ট বাথরুমে নিয়ে গুলি করল। তারপর ঘাতক ফিরে এল গেটের সামনে। নাসের কাকা হঠাৎ পানি পানি বলে চিৎকার করে উঠলেন। এক ঘাতক বলল, "যা পানি দিয়ে আয়।" সেই ঘাতক পানির পরিবর্তে আবার গুলি করল। নাসের কাকার কণ্ঠস্বর আর শোনা গেল না।

কিছুক্ষণ পর এক ঘাতক শিশু রাসেলকে নামিয়ে নিয়ে এল। শিশু রাসেল আমাকে দেখে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে বলল, "ভাইয়া আমাকে মারবে না তো?" আমার ধারণা ছিল ঘাতকরা অন্তত শিশু রাসেলকে মারবে না। সেই ধারণাতেই

আমি বললাম, "না ভাইয়া তোমাকে মারবে না। "এক ঘাতক আমার কাছ থেকে রাসেলকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেটের কাছে পুলিশবক্সে নিয়ে গেল। রাসেল মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য ঘাতকের কাছে কেঁদে কেঁদে আবেদন জানাচ্ছিল। ঘাতকটি ওখানে একজনের পাহারায় রেখে ভিতরে গেল। অল্প কিছুক্ষণ পর এসে বলল, 'চলো তোমাকে তোমার মায়ের কাছে দিয়ে আসি", বলে ভিতরে নিয়ে গেল। গুলির শব্দ শুনলাম। নীরব হয়ে গেল ঐ বাড়ির সমস্ত কণ্ঠস্বর। সর্বশেষ হত্যাটি ছিল শিশু রাসেলের।

বাইরে থেকে তখন কর্নেল জামিল সাহেবের ডেড-বডি তারই গাড়িতে করে ৩২ নম্বরে নিয়ে আসা হলো। চোখের সামনে এক আর্মি তার হাত থেকে ঘড়ি, পকেট থেকে মানিব্যাগ খুলে নিল। আমার প্রিয় হাতঘড়িটাও দেখলাম অন্য এক আর্মির হাতে শোভা পাচ্ছে।

আমি যন্ত্রণায় দাঁড়াতে পারছিলাম না। ওদের অনুমতি ছাড়াই বসে পড়লাম। প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। লুঙ্গিটা পায়ের সাথে লেগে গেছে। এক ঘাতক ভিতর থেকে একটা ছোট ময়লা লুঙ্গি এনে দিয়ে পরনের লুঙ্গি পালটাতে বলল। আমি বহু কষ্টে লুঙ্গি পালটিয়ে নিলাম। ঘাতক আমার গায়ের রক্তমাখা গেঞ্জিটিও খুলে নিল। আমাদের অফিস কক্ষে চেয়ারের হাতলে রাখা আমার হাফশার্টটি এনে দিল এক ঘাতক (যে-শার্টটা কামাল ভাইয়ের রক্ত বহন করছে)। উপর থেকে কাজের ছেলে আব্দুল ও রমাকে আমাদের লাইনে নিয়ে এল। দেখলাম আব্দুলের পেটে ও হাতে গুলি লেগেছে, রক্ত ঝরছে। লাইনে দাঁড়ানো বুড়ি আমাকে ও আব্দুলকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য ঘাতকদের বার বার অনুরোধ করছিল। সম্ভবত সকাল আটটার দিকে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে গেল।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে পায়ের এবং বিবেকের যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়েও জাতি জনকসহ তাঁর পরিবার, এমনকি আমার অত্যন্ত আদরের শিশু রাসেলকেও ঘৃণ্যতম ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারলাম না। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সৃষ্টিকর্তা যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখে এই জঘন্যতম নির্মম হত্যার বিচার অবশ্যই আমি চাইব।

চার দিন পর হাসপাতালের পিছনের জানালার শিক বাঁকিয়ে রাতের বেলায় পালিয়ে দেশের বাড়িতে যেয়ে উঠলাম। ১৫/২০ দিন পর কাজে যোগদানের জন্য বঙ্গভবন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আমার বাড়িরগ্ন ঠিকানায় চিঠি পেলাম। খুশি হয়ে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। সেপ্টেম্বর মাসের ৮ তারিখে অত্যন্ত সাহস ও মনোবল নিয়ে ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর এপিএস শাহরিয়ার জেড. আর. ইকবালের বাসায় উঠলাম। ওনাদের আদর ও আপ্যায়নে অল্প দিনে মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠলাম। নিজস্ব উদ্যোগে সেপ্টেম্বর মাসের ২৬ তারিখে লালবাগ থানায় (ধানমন্ডি তখন লালবাগ থানার অধীনে ছিল) লিখিত এজাহার দিতে গেলাম। তখন

যে সাব-ইন্সপেক্টর ডিউটিতে ছিল, সে আমার গলা ধরে থানা থেকে বের করে দিয়ে বলেছিল, "হারামজাদা তুইও মরবি, আমাদেরকেও মারবি।" ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম ইকবাল সাহেবের বাসায়। ওই দিনে ওই সময় ওনার বাসায় ডঃ সালাউদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। ওনারা সব শুনে আমাকে বলেছিলেন, "হতাশ হয়ো না, সময় একদিন তোমার অবশ্যই আসবে।" পরের দিন বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সহকারী হিসাবে যোগদান করলাম।

বঙ্গভবনে 'মীরজাফর' খোন্দকার মোস্তাক ও ১৫ আগস্টের ঘাতকদের দম্ভভরা চলাফেরা দেখতাম, আর মনে-মনে ভাবতাম, ওদের এই দাম্ভিকতার অবসান কি কোনোদিন হবে না?

খোন্দকার মোস্তাকের দাম্ভিক কর্তৃত্বের অবসান ঘটল। এলেন প্রধান বিচারপতি সায়েম সাহেব। বিচারপতি সায়েমকে সরিয়ে রাষ্ট্রপতি হলেন জিয়াউর রহমান। মনো মনে প্রমাদ গুনলাম। হলোও তা-ই। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে চাকরি করার অপরাধে ১৯৭৮ সালের অক্টোবর মাসে বঙ্গভবন থেকে আমাকে বের করে দেওয়া হলো। এলাম ব্যবসা ও বাণিজ্য অধিদপ্তরে। নীরবে চাকুরি করতে থাকলাম, আর নিরাপদ দিনের অপেক্ষায় থাকলাম।

আওয়ামী লীগ ক্ষতায় এল। নিজেকে নিরাপদে ভেবেই ২/১০/১৯৯৬ তারিখে ধানমন্ডি থানায় ১৫ আগস্টের সেই নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে লিখিত এজাহার দায়ের করি।

এজাহার

প্রতি ঃ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ধানমণ্ডি থানা
ঢাকা।

বিষয় ঃ এজাহার।

আমি, আ. ফ. ম. মহিতুল ইসলাম, পিতা-মৃত এ. ওয়াই. এন. নূরুল ইসলাম, সাং-ইসলাম কুটির, হাসপাতাল রোড, ঝিকরগাছা, থানা-ঝিকরগাছা, জেলা-যশোর। বর্তমানে-ফ্ল্যাট নং-২৬, বিল্ডিং নং-গ্ন০১, সেকশান-১৪, মিরপুর, ঢাকা এই মর্মে জানাচ্ছি যে, ১৯৭৫ ইং সালে তৎকালীণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি নং-৩৭৭, রোড নং-৩২ ধানমন্ডি, ঢাকার বাড়ির রিসিপশনিস্ট-কাম প্রেসিডেন্ট-এর পি. এ. হিসেবে কর্মরত ছিলাম।

১৪ আগস্ট, ১৯৭৫ ইং তারিখে রাত ০৮টা থেকে ১৫ আগস্ট সকাল ৮টা পর্যন্ত আমার ঐ বাড়িতে ডিউটি ছিল। যথারীতি আমি রাত্র ৮টার সময় প্রেসিডেন্টের বাসভবনে ডিউটিতে আসি। ঐ সময় ঐ বাড়ির নিচতলায় টেলিফোন-মিস্ত্রী আব্দুল মতিন, বাড়ির রাখাল আব্দুল আজিজ, একজন ইলেকট্রিক-মিস্ত্রি এবং একজন

কাজের বেটি, উপরতলায় কাজের ছেলে মোঃ সেলিম ওরফে আব্দুল এবং আব্দুর রহমান ওরফে রমা ছিল। ঐ দিন ঐ বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর ৩ (তিন) ছেলে যথাক্রমে শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল, শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল, শেখ জামালের স্ত্রী রোজী জামাল, বেগম মুজিব ছিলেন। তা ছাড়া বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ নাসেরও বাড়িতে অবস্থান করছিলেন।

ঐ রাতে ঐ বাড়িতে নিরাপত্তা ডিউটিতে পুলিশের ডি. এস. পি. নুরুল ইসলাম খান, ইন্সপেক্টর খোরশেদ, এস.বি'র একজন অফিসার এবং পুলিশের আরও অন্যান্য পদের লোক ছিল। পুলিশ ছাড়া নিরাপত্তা ডিউটিতে সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্য ছিল। রাত আনুমানিক ৮.০০-৯.০০ টার সময় বঙ্গবন্ধু বাহির থেকে বাসায় আসেন। তাঁর সঙ্গে সিকিউরিটি এবং অন্যান্যরা তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চলে যান।

তাঁরা চলে যাবার পর আমি গেটে পাহারারত আর্মি ও পুলিশের সাথে গল্প করছিলাম। রাত্র ১ (এক)টার দিকে আমাদের জন্য নির্ধারিত বিছানায় শুতে গেলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা খেয়াল নেই। হঠাৎ টেলিফোন-মিস্ত্রি আব্দুল মতিন ধাক্কা দিয়ে আমাকে ওঠান এবং বলেন, "প্রেসিডেন্ট সাহেব আপনাকে টেলিফোনে ডাকছেন।" সম্ভবত তখন সময় হবে ৪.৩০ টা বা ৫.০০টা। চারিদিক বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। তখন ও-বাড়ির বিভিন্ন স্থানে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছিল। আমি তাড়াতাড়ি এসে টেলিফোন ধরলাম। বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেন, "সেরনিয়াবতের বাসায় দুষ্কৃতিকারীরা আক্রমণ করেছে। জলদি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে টেলিফোন লাগা।" আমি সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন লাগনোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু লাইন পাচ্ছিলাম না। তারপর গণভবন এক্সচেঞ্জে লাইন লাগানোর চেষ্টা করি। সে মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু উপর থেকে নীচে নেমে আমার রুমে আসেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "কী হলো, পুলিশ কন্ট্রোল-রুমে লাগাতে বললাম, লাগালি না?" আমি বললাম, "স্যার, পুলিশ কন্ট্রোল-রুম ধরছে না। আমি গণভবন এক্সচেঞ্জে ধরেছি। গণভবন থেকে টেলিফোন ধরেছে, কিন্তু কথার কোনোগ্ন উত্তর দিচ্ছে না।" আমি হ্যালো হ্যালো বলে চিৎকার করছিলাম। তখন বঙ্গবন্ধু আমার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে গিয়ে বলেন, "আমি প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব বলছি।" ঠিক তখুনি একঝাঁক গুলি আমাদের অফিসকক্ষের দক্ষিণ দিকের জানালার গ্লাস ভেঙে অফিসকক্ষের দেয়ালে লাগে। অন্য টেলিফোনে চিফ সিকিউরিটি অফিসার মহিউদ্দিন টেলিফোন করেন, আমি ধরি। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গ্লাস ভাঙা আমার ডান হাতের কনুইর কাছে এসে বিঁধে কেটে রক্ত ঝরতে থাকে। এই সময়ে জানালা দিয়ে অনর্গল গুলি আসতে থাকে। বঙ্গবন্ধু আমার টেবিলের পাশে শুয়ে পড়েন। এবং আমার হাত ধরে টেনে শুতে বলেন। আমি শুয়ে পড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যে গুলি বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু উঠে দাঁড়ালেন এবং আমিও উঠলাম। উপর থেকে কাজের ছেলে সেলিম ওরফে আব্দুল বঙ্গবন্ধুর পাঞ্জাবি ও চশমা নিয়ে এল। আমার অফিসকক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি পাঞ্জাবি পরলেন। বারান্দায় এসে তিনি বলেন, "আমি-সেন্ট্রি, পুলিশ-সেন্ট্রি এত

গুলি চলছে, তোমরা কী কর?" এই বলে তিনি উপরে উঠে গেলেন। সেই সময় শেখ কামাল নিচে বারান্দায় এসে বলেন, "আর্মি পুলিশ কই, সবাই আমার সাথে আসুন।" বলার সাথে সাথে ৩/৪ জন কালো ও কিছু খাকি পোশাকধারী লোক আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আমি ও ডি. এস. পি. নুরুল ইসলাম সাহেব কামাল ভাইয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন ডি. এস. পি. নুরুল ইসলাম সাহেব আমাকে পিছন দিকে টান দিয়ে অফিসকক্ষের মধ্যে নিয়ে গেলেন। এখান থেকে বাহিরে কী হচ্ছে দেখতে চেষ্টা করলাম। আবারও গুলির শব্দ শুনলাম। এই সময় কামাল ভাই গুলি খেয়ে লাফ দিয়ে আমার পায়ে কাছে এসে যান। কামাল ভাই চিৎকার করে বলেন, "আমি শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল, ভাই ওদেরকে বলেন।" আক্রমণকারীদের মধ্যে কালো পোশাকধারী ও খাগ্নিক পোশাকধারী ছিল। আমি তাদেরকে বললাম, "ভাই, উনি শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল।" ওরা সঙ্গে সঙ্গে কামালকে লক্ষ্য করে আবার ফায়ার করল। আবার কামাল ভাই -এর শরীরে গুলি লাগে; একটি গুলি আমার হাঁটুতে লাগে। একই সঙ্গে ডি. এস. পি. নুরুল ইসলাম সাহেবের পায়েও গুলি লাগে। তখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম তারা সবাই আর্মির লোক, তারা এই বাড়িতে একটি হত্যাকাণ্ড ঘটানোর লক্ষ্যেই এসেছে। ডি. এস. পি. সাহেব আমাকে টেনে ওনার কক্ষে নিয়ে যান; ওখানে দেখি এসবি'র একজন অফিসার। রিভলবার তার পায়ের কাছে পড়ে আছে এবং সে.... সম্ভবত। ডি. এস. পি. সাহেব আমাদের ২ (দুই) জনকে পিছনের দরজা ধাক্কা দিয়ে আমাদের নিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। তখন আর্মির মেজর বজলুল হুদা আমাদের মাথার চুল টেনে ধরে। তার সঙ্গে আরও অস্ত্রধারী আর্মির লোক ছিল। বজলুল হুদা আমদের নিয়ে গেইটের নিকট লাইন করে দাঁড় করায়। সেখানে তখন পুলিশের লোক এবং টেলিফোন-মিস্ত্রিকে লাইনে দাঁড় করে রেখেছিল। টেলিফোন-মিস্ত্রি আব্দুল মতিনের পাশে ডি. এস. পি. সাহেব ও আমাকে দাঁড় করায়। আমার পাশে এসবি'র পুলিশ অফিসার দাঁড়ানো ছিল। হঠাৎ একজন আর্মি এসে এসবি'র পুলিশ অফিসারকে গুলি করে, সাথে সাথে তিনি গুলি খেয়ে পড়ে যান। কয়েকজন আর্মিকে আমাদের পাহারায় রেখে বাকিরা ফায়ার করতে করতে দোতলায় যান। কিছুক্ষণ পর বঙ্গবন্ধুর উচ্চকণ্ঠ শুনতে পেলাম। সাথে সাথে মহিলাদের আহাজারি ও আর্তচিৎকার শুনলাম। এই সময় রান্নার ও গোয়ালঘর থেকে বুড়ি ও রাখাল আজিজকে আমাদের লাইনে এনে দাঁড় করল।... শেখ নাসেরকে এনে আমাদের লাইন দাঁড় করায়। তার হাত গুলিতে রক্তাক্ত...। শেখ নাসের বলেন, "স্যার, আমি তো রাজনীতি করি না, ব্যবসা-বাণিজ্য করে খাই।" তখন পাশে দাঁড়ানো একজন আর্মি বললেন, "শেখ মুজিব ইজ বেটার দ্যান নাসের।" যে-অস্ত্রধারী আর্মির লোকটি শেখ নাসেরকে নিয়ে এসেছিল সে বলে, "ঠিক আছে, আপনাকে কিছু বলব না, আপনি ঐ রুমে গিয়ে বসুন।" এই বলে আমাদের লাইন থেকে তাঁকে বের করে আমাদের অফিসরুমের সাথে অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথরুমের নিয়ে গিয়ে গুলি করে। তারপর ঐ অস্ত্রধারী আর্মির লোকটি আমাদের লাইনের কাছে ফিরে আসে। শেখ নাসের পানি পানি বলে চিৎকার করেন। তখন একজন আর্মির লোক অন্য একজন আর্মির লোককে বলে, "যা পানি দিয়ে আয়।"... এবং পানির পরিবর্তে তাঁকে আবার গুলি করে। ইতিমধ্যে শিশু রাসেল ও রমাকে নিচে নিয়ে আসে। শিশু রাসেল প্রথমে রমাকে ও পরে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, "ভাইয়া, আমাকে মারবে না তো?" আমার ধারণা ছিল শিশু রাসেলকে তারা মারবে না। সেই ধারণাতেই আমি বলি, "না ভাইয়া, তোমাকে মারবে না।" খাকি পোশাকধারী একজন আমার কাছ থেকে রাসেলকে জোর করে নিয়ে গেল। রাসেল তার মায়ের কাছে যেতে চাইলে তাকে মায়ের কাছে নেবার কথা বলে ভিতরে নিয়ে যায়। এর পরই গুলির শব্দ শুনি। এই সময়ে মেজর বজলুল হুদাকে গেইটের নিকট মেজর ফারুক কি যেন জিজ্ঞেস করে। তখন বজলুল হুদা বলে, "অল আর ফিনিশ্‌ড্‌।" আমরা যখন গেইটের নিকট লাইনে দাঁড়ানো ছিলাম তখন বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে ট্যাংক যাওয়া-আসা করতে দেখি। ট্যাংকের উপরে কালো পোষাকধারী আর্মির লোক দেখি। বেলা অনুমান ৮টার দিকে কর্নেল জামিল সাহেবের 'ডেডবডি' তাঁর গাড়িতে করে আর্মির একজন ড্রাইভার ড্রাইভ করে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভিতরে নিয়ে আসে। প্রায় এই সময় মেজর ডালিমকে খাগ্নিক-পোশাকপরা অবস্থায় ঘটনাস্থলে দেখি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত আর্মিদের সাথে তাকে কথা বলতে দেখি।

গত ১৫/৮/৭৫ ইং তারিখ ভোরে সংঘঠিত হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম মুজিব, ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল, শেখ জামালের স্ত্রী রোজী জামাল, শেখ নাসের ও এসবি'র একজন পুলিশ অফিসারকে হত্যা করা হয়।

সাবেক মেজর ফারুক, মেজর বজলুল হুদা, মেজর নূর ও মেজর ডালিমকে এই হত্যাযজ্ঞের সময় এবং পরপরই আমি ঘটনাস্থলে দেখেছি ও চিনতে পেরেছি। তারা ছাড়াও আমি ঘটনার পর বিভিন্ন লোকমুখে এবং দেশী-বিদেশী সংবাদপত্র, ম্যাগ্নগাজিন ও এইসংক্রান্ত লিখিত বইয়ের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে খোন্দকার মোস্তাক, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, মেজর রশিদ, মেজর শাহরিয়ার, মেজর পাশা, মেজর শরফুল হোসেন, মেজর রাশেদ চৌধুরী, মেজর মহিউদ্দিন, ক্যাপ্টেন কিশমত, রিসালদার মুসলেউদ্দিনসহ সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ বাহিনি সশস্ত্র ও সেনাবাহিনীর অন্যান্য ইউনিটের কিছু সদস্য উচ্চাভিলাস কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে নিজ নিজ স্বার্থে গত ইং ১০/৮/৭৫ তারিখে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, তাঁর পরিবারবর্গ ও আত্মীয়স্বজনকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে।

এজাহারে অভিযুক্ত আসামি ছাড়া অন্যান্য যারা এই হত্যাযজ্ঞেত জাড়িত ছিল তাদের নাম তদন্তে প্রকাশ পাবে।

আমার জীবনের নিরাপত্তা এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার কারণে এই ঘটনার এজাহার করতে বিলম্ব হলো।

স্বাক্ষর

(আ. ফ. ম. মুহিতুল ইসলাম)
পিতাঃ মৃত– এ. ওয়াই. এম. নুরুল ইসলাম,
সাং–ইসলাম কুটির হাসপাতাল রোড,
ঝিকরগছা,
থানা–ঝিকরগাছা,
থানা–জিকরগাছা,
জেলা-যশোর।

এই ঐতিহাসিক বিচারটি দীর্ঘ এক যুগ সুপ্রীম কোর্টের 'ডিপ ফ্রিজে' সুষ্ঠু বিচারের প্রত্যাশায় যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

১২ নভেম্বর, ২০০

যিনি না এলে বাংলাদেশ হতো না!

আনু মাহমুদ

পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক সালামত আলি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে লন্ডনে কয়েকজন সাংবাদিকের সাথে আলাপকালে বলেছিলেন, "ভুট্টো যখন পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন, তখন নাকি মন্তব্য করেছিলেন—শেখ মুজিব বাংলার মানুষকে খুব বেশি ভালবাসে। তাঁকে তাঁর স্বাধীন দেশে পাঠিয়ে দিলাম, বাংলার মানুষই তাঁকে হত্যা করবে। আমরা কেন তাঁকে ফাঁসি দিয়ে বিশ্বাবাসীর কাছে বদনাম কামাবো', ভুট্টোর কথাটি এমনভাবে বাস্তবায়িত হলো, আর তা করলো বাংলার মানুষ নয়, বরং বাংলার নব্য মীরজাফর মোশতাক-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিপথগামী অফিসার, যার ফলশ্রুতিতে বিশ্বাসঘাতক খুনী মোশতাক ক্রমান্বয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে, মৃত্যুবরণ করেছে জীবন্ত কঙ্কাল হয়ে কয়েক বছর ধরে জনবিচ্ছিন্নভাবে চার দেয়ালের অন্তরালে অবস্থান করে। তার সাঙ্গোপাঙ্গরা ক্রমান্বয়ে জনবিচ্ছিন্ন ও জনধিক্কার নিয়ে দেশদেশান্তরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এ-ধরনের কিছুসংখ্যক স্বাধীনতা-বিরোধী চক্র ও ইতিহাস বিকৃত করার সরকার ছাড়া বাংলার মানুষের মনের আসনে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির পিতা হিসেবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে আছেন।

প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী ১৯৭৫ সালকে ঘুরিয়ে ১৭৫৭ করে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে বঙ্গবন্ধুর তুলনা করেছেন এবং ১৭৫৭ সালে পলাশীর ঘটনার সাথে ১৯৭৫ সালের ঘটনাকে পুনরাভিনয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি। তাঁর এবারের মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়বল্লভ ও ক্লাইভের চেহারাও তো আমাদের কাছে স্পষ্ট।

আবদুল গাফফার চৌধুরী তাঁর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছিলেন— "১৯৬৯ সালে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মারা যান। সিদ্ধান্ত হলো হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হবে। সরকারি অনুমতির প্রয়োজন পড়বে এর জন্যে। মানিক মিয়ার তেইশ নম্বর ধানমন্ডির বাসায় মৃতদেহের পাশে বসেছিলেন বঙ্গবন্ধু, আমাকে (গাফফার) বললেন, সামরিক প্রশাসককে ফোনে ধরো। আমি ফোন ধরিয়ে দিলাম। মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সাথে বঙ্গবন্ধুর কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। বুঝতে পারলাম, পাকিস্তানি মেজর জেনারেল বঙ্গবন্ধু অনুরোধ রাখতেও গড়িমসি করছেন। মুজিব ফোনের মধ্যেই রেগে গেলেন এবং

বললেন, 'আমি আমার নিজের লাশের জন্য কবরের জায়গা চাচ্ছি না। চাচ্ছি বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানের জন্যে। আপনি অনুমতি দিতে পারছেন না। বেশ! বাংলার মাটিতে বাংলার মানুষের কবরের জন্যে আপনাদের কাছে ভিক্ষে চাইতে আমি রাজি নই। যেদিন পারবো সেদিন নিজেরাই মনুমেন্ট তৈরি করবো, ' মুজিব ফোন রেখে দিলেন।"

তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার জন্যে ভাবি না, বাংলার কোনো গ্রামের ধানক্ষেতের পাশে কিংবা বাঁশ বাগানে কবর হলেই চলবে। কবরে শুয়ে যেন বাংলার মাটির স্বাদ পাই, বাংলার পাখির গান শুনি, আর যেন ঘ্রাণ পাই বাংলার সোনালী ধানের!' ১৯৬৯ সালের ২ জুন মানিক মিয়ার লাশের পাশে বসে বঙ্গবন্ধু একথাগুলো বলেছিলেন। তার মাত্র ছ'বছরের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর এই কথাগুলো এমন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হবে, সেদনি কল্পনা করাও যায়নি! ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে তাঁকে হত্যা করে টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে কবর দেয়ার নামে কোনো রকম মাটিচাপা দেয়া হয়েছে। আর এর মধ্যে বাস্তবতা লাভ করেছে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাশা, নিজের গ্রামে মাটির কবরে তিনি শুয়ে আছেন। তাঁর কবরের ঘাস ধুয়ে দেয় ভোরের শিশির!

জাতির পিতা জাতির কাছে দেয়া সব প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন— বাঙালির মুক্তির জন্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন স্বাধীন বাংলাদেশ নামের একটি দেশ। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে— বাংলার এই শ্রেষ্ঠ সন্তানটিকে যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে লেগে গেছে দীর্ঘ একুশটি বছর। বাঙালির ইতিহাস যতো দীর্ঘদিনের হোক না কেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়ে জাতি হিসেবে বাঙালিকে পুনর্বায় জন্ম দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যার জন্যে তিনি বাঙালিদের হৃদয়ে জাতির পিতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

দেশে-বিদেশে নেতা অনেকেই জন্মেন। তাঁরা কেউ ইতিহাসের একটি মাত্র পঙ্‌ক্তি, কেউ একটি পাতা, কেউ বা একটি অধ্যায়। আবার কেউ-বা নিজেই সমগ্র ইতিহাস। আর বঙ্গবন্ধু সারা বাংলার এই সমগ্র ইতিহাস। বঙ্গবন্ধু মৃত্যুত্রাসকে উপেক্ষা করে একটি ভূখণ্ডকে বাঙালির চিন্তা-চেতনায় সত্য করে তুলেছেন, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের পত্তন করেছেন। এখানেই তাঁর নেতৃত্বের ঐতিহাসিকতা। ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে ঢাকার হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন, এই ভূখণ্ডটির নাম হবে— 'বাংলাদেশ'।

এই ঐতিহাসিকতা অর্জন ও স্বদেশকে প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেয়ার পথে দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বার্থবাদীদের কাছ থেকে পদে পদে বাধা পেয়েছেন। এই লড়াই করতে করতেই একদিন তাঁকে দিতে হয়েছে নিজের জীবনও!

নির্যাতিত মানবাত্মার ক্রন্দন বঙ্গবন্ধুকে অস্থির, অশান্ত করে তুলেছিলো। এজন্যে তিনি হুংকার তুলেছিলেন সকল প্রকার দুঃশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে, ভূমিকা নিয়েছিলেন অমিত এক অক্লান্ত যোদ্ধার। ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবি

'ল্যামারটিন' তাঁর কাব্যরসের ধারায় সারা ইউরোপকে সিক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর স্বদেশ ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে রাজনীতির মূল কথাটি ব্যক্ত করে উল্লেখ করেন– 'Affection, always affection for the people and the people in return will lend their herts.' বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এই কথাগুলো সর্বতোভাবে প্রযোজ্য।

ল্যামারটিন আর বঙ্গবন্ধুর মধ্যে এক শতাব্দী কালের ব্যবধান। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁদের দুজনের অভিজ্ঞতা প্রায় একরকম। তাঁদের দুজনকেই আকুল করে তুলেছিলো নিপীড়িত ও শোষিত মানবাত্মার আকুল ফরিয়াদ। উভয়েই জনগণকে ভালোবেসে তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। জালিমদের হাত থেকে অসহায় মানুষকে বাঁচাতে দুজনেই নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও প্রতিবাদমুখর হয়েছিলেন। তাঁরা প্রতিদানে পেয়েছিলেন জনগণের প্রাণঢালা ভালোবাসাও।

১৯৭৩ সালের ২১ ডিসেম্বর সংখ্যা লন্ডনের 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকায় মাইকেল বার্নস, এম. পি. তাঁর 'Prospect of Bangladesh' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে মন্তব্য করেন—For the moment Bangladesh's greatest asset remains Bangabandhu himself. Sheikh Mujib's extraordinary dynamism and charisma is still there, may be slightly dented by the sheer intractability of the problems, but still the forece that inspires and unites his people. With a dangerous and difficult few years ahead, bangladesh is going to need Mujib's brand of leadership more than ever.

বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ট্র্যাডিশন্যাল রাজনীতির বিরুদ্ধে ফুটে ওঠে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। রাজনীতিকে তিনি রাজনীতি হিসেবে দেখেছেন। নিজেকে একাত্ম করে দিয়েছেন জনগণের সাথে—তাই তাঁর কণ্ঠে ফুটে ওঠে সবার আগে—ভায়েরা আমার! এই নিখাদ সম্বোধন, তার জীবন ঘটনাবহুল ও বিচিত্র। কিন্তু সকল ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও তাঁর সদাজাগ্রত প্রাণবানী জাতির জীবনে যে-শিহরন জাগিয়েছে তা অবিস্মরণীয়, যা আজও অকেজো হয়ে পড়েনি। গভীর নিশিথে ভেসে-আসা দূরাগত বংশীধ্বনির মতো তা আজও আমাদের মনকে অশান্ত করে তোলে।

যে-গিরিমুখ থেকে একদিন অনলবর্ষী বক্তব্য নির্গত হয়েছিলো তা সতিই এক জ্বালাময় আগ্নেয়গিরি। শাসকরা-শোষকরা তার তাপ সইতে না পেরে বঙ্গবন্ধুকে বারবার সমাজকে দেশের স্বাধীনতার জন্যে সেদিন রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যার পর্যায়ক্রমিক আবর্তনে আমরা পেয়েছি—বাহান্নর ভাষা আন্দোলন এবং এর বন্ধুর পথ বেয়ে পরিণতি লাভ করেছে স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম— ফলশ্রুতিতে স্বাধীন বাংলাদেশ।

স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে বলা হতো 'বার্ক অব বেঙ্গল'। বঙ্গবন্ধুকে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও বিপিনচন্দ্র পালের মতো বক্তার সাথেই তুলনা করা যেতে

পারে। তিনি তেমন কিছু বেদবাক্য উচ্চারণ করতেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করার মতো যাদুকরি ক্ষমতা থাকত তাঁর ব্যবহৃত শব্দাবলির মধ্যে। সহজ কথা যায় না বলা সহজে; তিনি কিন্তু সহজ কথা সহজ করেই জনগণের সামনে তুলে ধরতেন। এই অসাধারণ ক্ষমতার জন্যেই তিনি বাংলার প্রাণপ্রিয় নেতা হিসেবে নন্দিত-বন্দিত হয়েছিলেন।

সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার মানসে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেন তাঁদের মৃত্যু নেই। বরং হয়ে থাকেন অমর। তাঁদের আত্মোৎসর্গের ভূমিতে জন্ম নেয় এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ, যেখানে একদিন ওই ভূমিতে দাঁড়িয়ে আদর্শবান মহাজীবনের যাত্রা শুরু হবে।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন দেশের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গকারী। তাই বুঝি মৃত্যুই তাঁর প্রাপ্য। বহু শতাব্দী পূর্বে, ঘনিষ্ঠ সহচর ব্রুটাসের শাণিত তরবারির আঘাতে রক্তাক্ত জুলিয়াস সিজার আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, ব্রুটাস তুমিও! তিনি কুলে কেউ নেই এমন এতিমকে লালন-পালন করেছিলেন সিরাজউদ্দৌলার মা আমিনা বেগম একান্ত অনুগৃহীত সেই মোহাম্মদী বেগের ছুরিকাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত সিরাজ বিস্ময়ে বেদনায় চিৎকার করে উঠেছিলেন—তুমিও মোহাম্মদী বেগ! আমেরিকার মহান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন বুথের গুলিতে নিহত হয়েও মনে হয় তেমনি বিস্ময়াহত হয়েছিলেন। এমনিভাবেই যোগ্য ব্যক্তিরা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সত্য-ন্যায়ের দারুণ মূল্য শোধ করে যান। সাধারণ ব্যক্তির মৃত্যু তাই জীবনের ওপর যবনিকাপাত। কিন্তু মহামানবের মৃত্যু— যোগ্যতমের মৃত্যু।

ঢাকায় নিজের অরক্ষিত বাড়িটির দোতলায় ঘাতকেরা নির্মম বুলেটের আঘাতে যখন বঙ্গবন্ধুর প্রশস্ত বক্ষ ঝাঁজরা করছিলো, তখন তিনি কি চিনতে পেরেছিলেন মারণাস্ত্রধারী ঘাতকদের পশ্চাতে সক্রিয় সেই নাটের গুরুটিকে?

বঙ্গবন্ধু ইতিহাস হলেও তিনি অতীত নন, জাতির পিতার আসনে অধিষ্ঠিত তিনি। তাঁর প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি কথা আমাদের বর্তমানকে জড়িয়ে। কোহিমায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকের সমাধিস্থলে একটি ফলকের উপর উৎকীর্ণ মর্মস্পর্শী বাণী— When you go home, tell them of us, tell them we gave our today for their tomorrow-এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবন বির্সজন দিয়ে কামনা করে গেছেন আমাদের জন্যে একটি সুন্দর আগামীকালের।

আজ যেন বারবার কানে বাজে প্রতিটি বাঙালির সেই ভয়ানক দিনের সন্ধ্যায় শোনা বিবিসি'র ভাষ্যকারের মন্তব্য– বাংলাদেশে যা-কিছুই ঘটুক না কেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সেই মানুষটি হিসেবে যিনি না হলে বাংলাদেশের জন্মই হতো না!

স্বাধীনতা ঘোষণার বিতর্ক ও ইতিহাসের রায়

মুসা সাদিক

২৬ মার্চ ভোর রাত চারটায় দৈনিক আজাদী পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ আমাকে তাঁর সিরাজদ্দৌলা রোডের বাসায় আসতে বলেন। তাঁর বাড়ি এবং আমাদের কাজেম আলী রোডের বাড়ি পাঁচ মিনিটের দূরত্ব ছিল। আমি তাঁর পত্রিকার রিপোর্টার হিসেব চাকরি করতাম। তাঁর বাসায় গেলে তিনি একটি গাড়িতে আমাকে ও আওয়ামী লীগে নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরীর বড় ছেলেকে পাঠালেন আসকার দিঘীর পাড়ে চট্টগ্রাম রেডিও'র আঞ্চলিক পরিচালক নাজমুল আলমকে নিয়ে আক্তারুজ্জামান বাবুর পাথরঘাটার জুপিটার হাউজে আনতে। আমরা গিয়ে তাঁকে পেলাম না। শেষ রাতে তিনি বাসা ছেড়ে গেছেন। খালেদ মোহাম্মদ সাহেবের নির্দেশ মতো ওখান থেকে আমরা গেলাম চট্টগ্রাম রেডিও'র বার্তা-সম্পাদক সুলতান আহমদের আগ্রাবাদ কলোনীর বাসায়। সেখানে গিয়ে তাঁকে পেলাম না। সেখান থেকে আমরা আগ্রাবাদে অবস্থিত চট্টগ্রাম রেডিও অফিসে গেলাম। সেখানে গিয়ে জানলাম ঢাকা রেডিও থেকে যেসব সামরিক নির্দেশাবলি জারি হচ্ছিল, সেগুলো চট্টগ্রাম রেডিও'র দেশপ্রেমিক অফিসাররা প্রচার করতে না দিয়ে রেডিও বন্ধ করে চলে গেছেন। ঢাকার সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে যারা এই বিদ্রোহের কাজ করেছেন, সেই মুক্তিযোদ্ধারা হলেন, চট্টগ্রাম রেডিও'র ইঞ্জিনিয়ার আবদুর শাকুর, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার আনোয়ার, টেকনিক্যল এসিসটেন্ট রাশেদুল হাসান, টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট শরফুজ্জামান, টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট আমিনুর রহমান প্রমুখরা। সেখানে অবস্থানরত গার্ডদের কাছে জানা গেল যে, আওয়ামী লীগের চট্টগ্রামের অন্যতম শীর্ষ নেতা এম এ হান্নান, এমএনএ সকালে সেখানে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত স্বাধীনতার বাণী প্রচার করতে। কিন্তু রেডিও বন্ধ থাকায় তিনি আগ্রাবাদ কলোনীতে অবস্থিত রেডিও ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সোবহানের বাসায় গেছেন। সেখানে গিয়ে জানলাম এম এ হান্নান, এমএনএ জনাব সোবহানকে নিয়ে কালুরঘাটে গেছেন বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার প্রচার করতে। আগ্রাবাদ কলোনীতে রেডিও ইঞ্জিনিয়ার আবদুর শাকুর এর সাথে আমাদের দেখা হলো। তিনি বললেন যে, তাঁর অন্যান্য সহকর্মী শরফুজ্জামান, রাশেদুল হাসান এবং আমিনুর রহমানদের নিয়ে তাঁরা কালুঘাটে যাচ্ছেন এবং সেখানে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রচার শুরু করবেন।

আমরা সেখান থেকে ফিরে আন্দরকিল্লায় দৈনিক আজাদী অফিসে আসি এবং সম্পাদক সাহেবকে জানাই যে, এম এ হান্নান সাহেব, রেডিও ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সোবহানকে নিয়ে কালুরঘাটে গেছেন বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার প্রচার করতে। যথার্থই দুপুর পৌণে দুইটায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের ভিপি ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপের নেতা আবুল কাশেম সন্দ্বীপ সন্দ্বীপ-এর কণ্ঠস্বরে চট্টগ্রামবাসী প্রথম শুনতে পেলেন "স্বাধীন বাংলা বিপ্লব। বেতার কেন্দ্র", "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র", "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র"। ("বিপ্লবী" শব্দটি স্বাধীন বাংলা বেতারের নাম থেকে ২৯ মার্চ বর্জন করা হয় আওয়ামী লীগ নেতাদের নির্দেশে। কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতারসহ সমগ্র চট্টগ্রাম এবং যেমন সমগ্র বাংলাদেশে তখন আওয়ামী লীগ নেতাদের আদেশ-নির্দেশ অনুযায়ী চলছিল। স্বাধীন বাংলা বেতারে সেই মুক্তিযুদ্ধের মুহূর্তে কোন ক্যাপ্টেন, মেজর বা কর্ণেল তার ইচ্ছামতো কোন কিছু উচ্চারণ বা প্রচার করার ক্ষমতা রাখতেন না। আমার বন্ধু ও সহকর্মী সন্দ্বীপ আজন্ম বিপ্লবী চেতনার ধারক-বাহক হয়েও আওয়ামী লীগ নেতাদের ধমকে তার বিপ্লবী" চেতনা বিসর্জন দিয়েছিলেন।) সন্দ্বীপের কণ্ঠে বেতারের নাম তিনবার ঘোষণার পর চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা এম এ হান্নান এমএনএ-এর নাম ঘোষণা করে বলা হলো, তিনি এখন একটি "বিশেষ ঘোষণা" দেবেন। জনাব হান্নান তাঁর জলদ গম্ভীর কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর উক্ত স্বাধীনতা ঘোষণা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রচার করে শোনালেন। তিনি বললেন, "গতকাল ২৫ মার্চ রাতে খুনি টিক্কা খান ও হানাদার পাক বাহিনীর ঢাকার পিলখানায় ইপিআরদের ওপর এবং রাজারবাগে বাঙালি পুলিশদের ওপর কামান-বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা এবং সমগ্র বাঙালি জাতির একমাত্র নেতা। বাংলাদেশকে তিনি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ঘোষণা করেছেন এবং বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন দেশ। প্রতিটি বাঙালি ভাই-বোন যে যেখানে আছেন, হানাদার পাক বাহিনীকে খতম করুন। বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করুন। ঢাকা থেকে প্রেরিত বঙ্গবন্ধুর এটাই শেষ বার্তা ও ঘোষণা। ঢাকার সাথে আমাদের আর কোন যোগাযোগ নেই। ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে। বাঙালি বীরের জাতি। এই যুদ্ধে জয় আমাদের হবেই। বঙ্গবন্ধু আমাদের সঙ্গে আছেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন খুনি টিক্কা খান ঢাকায় বাঙালি কমান্ডোদের হামলায় নিহত হয়েছে। পৃথিবীর যে যেখানে আছেন, সবাই আমাদের সাথে থাকুন। বাংলাদেশ সকল দেশের সাহায্য চায়। সকল জাতির সমর্থন চায়। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।"

২৬ মার্চ দুপুর পৌণে দুইটায় এম এ হান্নানের কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর উক্ত স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের পর থেকে আবুল কাশেম সন্দ্বীপের কণ্ঠস্বরে থেমে থেমে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে সারা বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উক্ত স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার হতে থাকে।

বিকেলে দৈনিক আজাদীয় সম্পাদক অধ্যাপক খালেদ মোহাম্মদ-এর বাড়িতে আমি গেলাম। তিনি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে যাবেন কিনা, গেলে কখন যাবেন তা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, তিনি জুপিটার হাউজে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতারা সেখানে আছেন। তাঁর সাথে সেখানে গেলাম। সেখানে আমি কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতারে যাবার জন্যে কেউ আগ্রহী কিনা এবং একটি গাড়ির ব্যবস্থা করা যায় কিনা, সে বিষয়ে অনেককে বললাম। চট্টগ্রাম ছাত্রলীগের অন্যতম শীর্ষ-নেতা এস এম ইউসুফ এবং আরো কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী আমার অনুরোধে সাড়া দিলেন। এস এম ইউসুফসহ আমরা বিকাল চারটার দিকে জুপিটার হাউজ থেকে একটি জীপে করে কালুরঘাট রওয়ানা হলাম। জীপটি সম্ভবতঃ আক্তারুজ্জামান বাবুর ছিল। সেখান থেকে বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে আমরা যখন কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে পৌঁছালাম তখন সেখানে বেতারের ঘোষক আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, রেডিও ইঞ্জিনিয়ার মুসলিম খান, রেডিও ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সোবহান এবং মেকানিক শুকুর আলীর সাথে আমাদের দেখা হলো। আবুল কাশেম সন্দ্বীপের কাছে জানলাম এস এম ইউসুফ অনেক বড় নেতা। সন্দ্বীপ বললেন, "ইউসুফ ভাই, আপনি কিছু স্বাধীন বাংলা বেতারে বলুন।" এস এম ইউসুফ তাঁকে প্রায় ধমকই দিলো। তিনি তাঁকে বললেন যে, "বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা অব্যাহতভাবে প্রচার করতে থাকেন। হান্নান ভাইসহ আমাদের বড় নেতারা আবার আসবেন। তবে সেনাবাহিনীর কোন অফিসারকে দিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতারে কিছু বলানো দরকার। যাতে করে দেশবাসী বুঝতে পারে যে, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে বাঙালি সেনা অফিসাররাও আছেন। আমাদের নেতা এম আর সিদ্দিকী ইপিআর-এর মেজর রফিককে পাঠানোর চেষ্টা করছেন, তাঁকে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচারের জন্যে।" আমরা কালুরঘাট থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় চট্টগ্রাম ফিরে আসি। তখন থেকে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতারা সশস্ত্র বাহিনীর কোন অফিসারকে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচারের নির্দেশ দেয়। সেই মুহূর্তে ইপিআর-এর মেজর রফিক তাঁর ফোর্স ও পুলিশ বাহিনী নিয়ে চট্টগ্রাম শহর তাঁর কব্জায় রেখেছিলেন এবং কালুরঘাট থেকে দূরে ছিলেন। অপরদিকে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়া কালুরঘাটের সন্নিকটে ছিলেন।

২৭ মার্চ বিকেলে রেডিও-চট্টগ্রাম রেডিও'র রেডিও ইঞ্জিনিয়ার আবদুর শাকের, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার আনোয়ার, টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট রাশেদুল হাসান, টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট শরফুজ্জামান স্ক্রীপ রাইটার বেলাল মোহাম্মদ কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতারে গিয়ে যোগদান করেন। ২৭ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বেলাল মোহাম্মদ আওয়ামী লীগ নেতাদের নির্দেশে মেজর জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আওয়ামী লীগ নেতারাও মেজর জিয়ার কাছে তাদের নির্দেশ প্রেরণ করেন। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় মেজর জিয়া কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আসেন। বেলাল মোহাম্মদ, ইঞ্জিনিয়ার আবদুর শাকুর প্রমুখরা মেজর

জিয়াকে হাসতে হাসতে বলেন, "মেজর সাহেব, আমরা এখানে সবাই মাইনর। আপনি একমাত্র মেজর। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণায় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রের একজন মেজর হিসেবে আপনি স্বাধীন বাংলা বেতারের বঙ্গবন্ধু ঘোষণাটা প্রচার করে দিন। আপনার ঘোষণায় যে সমস্ত পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনীর বাঙালি সৈনিকরা এখনো বুঝতে পারছে না, তারা বুঝে যাবে যে, সকল বাঙালি সৈনিক, পুলিশ ও ইপিআর-রা এই স্বাধীনতা যুদ্ধ যোগদান করেছেন...।"

৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়া ২৭ মার্চ সন্ধ্যা সাতটায় স্বাধীন বাংলা বেতারে বঙ্গবন্ধুর নামে ও পক্ষে স্বাধীনতার যে ঘোষণা দেন, এই তার পটভূমি। উক্ত ঘোষণার অনুষ্ঠানের সামরিক ও বেসামরিক চাক্ষুস সাক্ষীরা অধিকাংশ জীবিত আছেন। যাঁদের অন্যতম বেলাল মোহাম্মদ। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতারে মেজর জিয়াউর রহমানকে অনুরোধ করে নিয়ে এসে কিভাবে তাঁকে দিয়ে উক্ত ঘোষণা পাঠ করান তার বিস্তারিত বিবরণসহ স্বাধীন বাংলা বেতারের ওপর একটি বই লিখেছেন। ১৯৯৪ সালে আমার লেখা বই "মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম" (বাংলা একাডেমী প্রকাশিত) এবং ২০০০ সালে প্রকাশিত "Bangladesh Wins Freedom" (বাংলা একাডেমী প্রকাশিত) বই দুটিতেও এই ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি ছিল মিডিয়াম ওয়েভ ১০ কিলোওয়াটের এবং তার কভারেজ এরিয়া ছিল ৫০/৬০ কিলোমিটার এরিয়া। এই কালুরঘাটে ৩০ মার্চ দুপুর দুইটার সময় পাকিস্তান বিমান বাহিনী এয়ার স্ট্যাপিং করে। সেই মুহূর্তে আমি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি আবদুর রব এবং চট্টগ্রাম ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতা এস এম ইউসুফ একটি জীপে করে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে যাচ্ছিলাম। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ২/৩ মাইল দূরে থাকতে স্বাধীন বাংলা বেতারের ওপর পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর তিনটি বিমানের চক্রাকারে এয়ার স্ট্রাপিং দেখতে পাই। ইউসুফ ভাইয়ের সংগ্রহ করা উক্ত গাড়ির ড্রাইভার সর্বাগ্রে তা দেখতে পায় এবং রাস্তার পাশে একটি ঝোপের মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে দেয়। আমরা তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতরে নিজেদের আড়াল করি। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর আক্রমণ মুহূর্তে বেতারে অবস্থিত সবাই দৌড়ে আশেপাশের গ্রামে আশ্রয় নেয়। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের পর স্বাধী বাংলা বেতার অচল হয়ে যায়। আমরা তীব্র গতিতে চট্টগ্রাম শহরের দিকে বিকাল সাড়ে তিনটায় ফিরে আসি। পরদিন ৩১ মার্চ চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা ও এমপি-রা সহ আমরা কালুরঘাটে ফিরে এসে দেখি যে, কালুরঘাট বেতারের এন্টেনার ম্যাচিং পয়েন্ট সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সেটা খুলে নিয়ে মদনঘাটে নিয়ে মেরামতের চেষ্টা করা হলো। কিন্তু মেরামত সম্ভব না হওয়ায় কালুরঘাটে ফিরে

এসে ১ কিলোওয়াটের একটি মিডিয়াম ওয়েভ-এর ট্রান্সমিটার ছিল, সেটা নিয়ে তারা পটিয়া গেলেন। সেখান থেকে স্বাধীন বাংলা বেতারের কর্মকর্তাদের সাথে ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার নিয়ে আমরা বেলুনিয়া পার হয়ে ভারত সীমান্তের ভিতরে চলে গেলাম এবং সেখান থেকে ৪ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রচারণা পুনরায় শুরু করলাম। যার প্রচার এলাকা ছিল ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার। এখান থেকে আমি স্বকণ্ঠে স্বাধীন বাংলা বেতারে অন্যান্যদের সাথে প্রচার-প্রচারণা শুরু করি। অপরদিকে, ত্রিপুরায় ভারতের বিএসএফ স্বাধীন বাংলা বেতারের কভারেজ এরিয়া বৃদ্ধির জন্য একটি ৬০ ওয়াট সর্ট ওয়েভ ট্রান্সমিটার দেয়। বাঘাফা থেকে ভারতের বিএসএফ-এর নিরাপত্তাধীনে স্বাধীন বাংলা বেতার পুনরায় জোরেশোরে তার কার্যক্রম শুরু করল। বিএসএফ-এর কর্ণেল মুর্খাজি এখানে স্বাধীন বাংলা বেতারের কর্মকর্তা, প্রকৌশলী ও কর্মচারীদের সকল সুবিধাদি নিশ্চিত করলেন। (কিন্তু এই বাঘাফা কেন্দ্রে একটি বিপর্যয় ঘটল। বাঘাফা কেন্দ্রের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল ভারতের পাঞ্জাবী বাহিনীর একটি উইং। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে "হানাদার পাঞ্জাবী" প্রচারিত হতে দেখে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সেখানে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তাদের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা বেতারের কর্মকর্তারা "হানাদার পাঞ্জাবী" শব্দ প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়।) মে মাসে খবর এলো যে, ভারত সরকার বাংলাদেশকে ৫০ কিলোওয়াটের মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার দিয়েছে। যা থেকে সমগ্র বাংলাদেশ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশ কভার হয়ে যায়। কলকাতার বালিগঞ্জে স্বাধীন বাংলা বেতারের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রচার কার্যক্রম অব্যাহতভাবে পরিচালনা করে।

গত ৩৪ বছরের স্বাধীনতার ইতিহাস উল্টে দিয়ে ক্যান্টনমেন্টে জন্মগ্রহণকারী বিএনপি'র অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিরাও বর্তমানে ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোট সরকার দাবি করছে, জে. জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে বললে চিরন্তন সত্য যেমন ডাহা মিথ্যা হয়ে যাবে এবং বিশ্ববাসীর হাসির খোরাকে পরিণত হবে, তেমনি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পার্লামেন্টের নির্বাচিত এমপি'দের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ও সমগ্র বাঙালি জাতির ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবর্তে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মেজর পদে চাকরিরত জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বললে একটি চিরন্তন সত্য ডাহা মিথ্যা হয়ে যাবে এবং বিশ্ববাসীর হাসির খোরাকে পরিণত হবে। এমনকি, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতাকারী আমেরিকার রিপাবলিকান পার্টির ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট নিকসনের কাছে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআই-এ যে অতি গোপনীয় রিপোর্ট ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রেরণ করে, যা গত ৩ জুলাই সিআইএ কর্তৃক প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে প্রথম বাক্যেই সিআইএ সুস্পষ্টভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে এই মর্মে অবহিত করেছে যে, "Pakistan was thrust into civil war today when

Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the East Wing of the two- part country to be "the sovereign independent people's republic of Bangladesh."

মুক্তিযুদ্ধকালে ও জেড ফোর্সের কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন থেকে ১৯৮১ সালের ৩০ মে পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পানকালে কখনো বিস্মরণেও উচ্চারণ করেননি যে, তিনি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার কোন ঘোষণা দিয়েছেন। বরং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি তাঁর চরম আনুগত্য ও সর্বোচ্চ আস্থা-শ্রদ্ধা প্রমাণ করে তিনি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ দৈনিক বাংলায় ও ১৯৭৪ সালের ২৬ মার্চ সাপ্তাহিক বিচিত্রায় স্বাধীনতা সংখ্যায় স্বনামে নিবন্ধ লিখে দেশবাসীকে অবহিত করেছেন যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে ও নামে তিনি ২৭ মার্চ কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। ১৯৭৪ সালে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ পদে চাকরিরত অবস্থায় স্বাধীনতার ঘোষণা বিষয়ে আমাকে জেনারেল জিয়াউর রহমান যে সাক্ষাৎকার দেন, তা দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় ইংরেজি ও বাংলায় বহুবার ছাপা হয়েছে। উক্ত সাক্ষাতকারে জেনারেল জিয়াউর রহমান বলেন, "আমি Father of the nation বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলাম এবং দুইবার দিয়েছিলাম এবং দুইবারই তাঁর নামে দিয়েছিলাম। এই স্বাধীনতার ঘোষণার মুশাবিদা যাঁরা করেছিলেন, বেলাল মোহাম্মদ এখনও বেঁচে আছেন।... বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া ছাড়া আমার বা অন্যদের কারও কোন locuss slandi (বৈধ এখতিযার) ছিল না আমরা ১৯৭১ সালে যেখানে যে যা করেছি সবকিছুই তাঁর নামে, Father of nation বঙ্গবন্ধুর নামে করেছি। কারণ, He had the mandate and he was the symbol of our Independence."

১৯৮৮ সালে লাহোরে আমাকে দেয়া সাক্ষাতকারে বাংলাদেশে গণহত্যাযজ্ঞের প্রথম রক্তপিপাসু জেনারেল টিক্কা খান ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন ও তার গণহত্যাযজ্ঞের সাফাই গেয়েছেন। তিনি বলেন : "আমার কো-অর্ডিনেশন অফিসার একটি থ্রি-ব্যান্ড রেডিও এনে বললো স্যার শুনুন, শেখ সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা করছেন। আমি নিজে রেডিওতে শেখ সাহেবকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে শুনলাম, কারণ, শেখ সাহেবের কণ্ঠস্বর আমি ভাল করেই চিনতাম। যে ঘোষণা তখন দেশদ্রোহিতার শামিল ছিল। সেক্ষেত্রে শেখ সাহেবকে গ্রেফতার করা ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না।" (১)

তদান্তিন পাক সেনাবাহিনীর মেজর সিদ্দিক সালিক ১৯৭১ সালে ঢাকায় পাক সশস্ত্র বাহিনীর আইএসপিআর-এর পরিচালক ছিলেন । তিনি তাঁর "Wintess to surrender" বইতে ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি ঘটনা পরম্পরাসহ ঐতিহাসিকভাবে তুলে ধরে লিখেছেন ঃ "When the first shot had been fired, the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wave-length close to that of the official Pakistan Radio. In what must have been, and sounded like a prerecorded message, the Sheikh Proclaimed East Pakistan to be the Peoples Republic of Bangladesh." (২)

উক্ত স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত লন্ডন অবজারভার পত্রিকা ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ সংখ্যায় "When Sheikh Mujibur Rahman Proclaimed the Independent of Bangladesh last week" শিরোনামে বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ করে। বিশ্ববিখ্যাত টাইম পত্রিকায় ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল সংখ্যায় চট্টগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ করে ঢাকা থেকে শেখ মুজিবুর প্রেরিত স্বাধীনতা ঘোষণা যে চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে যে প্রচারিত হয়েছে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ করে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে এই রিপোর্ট প্রকাশ করে যে, "The army ordered a strict 24 hour curfew in Dacca, with violators shot on sight. But soon the free Bengal revolutionary radio center, probably somewhere in Chittagong cracked in life. Over the clandestine station, Mujib proclaimed the creation of the 'sovereign independent Bengali nation, and called on its people to' resist the enemy forces at all costs in every corner of Bangladesh....1:30 am the following soldiers seized the Sheikh in his home.

ঢাকা মগবাজার অয়ারলেস অফিস থেকে ২৫ মার্চ রাত ১২:১৫ মিনিটে প্রেরিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার Message চট্টগ্রামের নন্দনকানন অয়ারলেস অপারেটর মাহতাব উদ্দিন ধারণ করেন এবং তিনি এখনো বেঁচে আছেন। অনুরূপভাবে, ঢাকা মগবাজার অয়ারলেস অফিস থেকে উক্ত Message চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীর টেলিপ্রিন্টারেও ২৫ মার্চ রাত ১:১০ মিনিটে ঢাকা থেকে প্রেরণ করা হয়। যার সাক্ষীরা অনেকে আজও বেঁচে আছেন।

২৫ মার্চ আমি ও আমার বড় ভাই রাত একটার দিকে দৈনিক আজাদীর সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ এমপি সাহেবের কাছে গেলে তিনি ঢাকা থেকে তৎক্ষণাৎ টেলিপ্রিন্টারে আসা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বলিত ইংরেজি টেক্সট দেখালেন এবং বললেন : "জাফর সাহেব দেখেন ঢাকায় ম্যাসাকার (গণহত্যা) হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এখন আমাদের সামনে

আলজেরিয়া ভিয়েতনামের মতো দীর্ঘ স্বাধীনতার যুদ্ধ।" রাত তখন ১ টা ১০ মিনিট। অর্থাৎ সেটা তখন ২৬ মার্চের প্রথম প্রহর। সম্পাদক সাহেব ফোনে আওয়ামী লীগ নেতাদের সকলকে জানাচ্ছেন টেলেক্সের মেসেজ এবং যে যে তার কক্ষে আসছেন তাদের সকলকে সেই মেসেজ দেখাচ্ছেন। আমিও পড়লাম সেই টেলেক্স মেসেজ। টেলেক্স মেসেজটি আমিসহ অনেকে সঙ্গে সঙ্গে লিখে নিলেন। মেসেজটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"This may be my last message; from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved. Sheikh Mujibur Rahman.

দৈনিক "আজাদী" অফিস থেকে আধঘণ্টা পরে যখন আমরা বেরিয়ে আসলাম তখন চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির (বর্তমানে কর্পোরেশন) সামনে ও আন্দরকিল্লায় ঐ গভীর রাতেও দেখলাম বহু মানুষের জটলা। তারাও শুনেছে ঢাকায় পাক বাহিনীর আক্রমণ ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা। তারা অনেকেই বলাবলি করছিল যে, ঢাকার সাথে টেলিফোনে কানেকশন পাওয়া যায় যাচ্ছে না।

২৬ মার্চ রাত দুটোর দিকে বাসায় ফিরে এলাম। রাত তিনটায় মাইকের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমাদের কাজেম আলী রোডের বাড়ির তিনতলা থেকে আমার বড় ভাই, আমি আমার ছোট দুই ভাই মোহাম্মদ ইসা ও মোহাম্মদ মহীউদ্দিন নিচে নেমে এলাম মাইকে কি বলা হচ্ছে শোনার জন্য। আমি ও বড় ভাই দৈনিক আজাদী অফিসের দিকে পা বাড়ালাম, তখনো অন্ধকারের রেশ কাটেনি। সেখানে গিয়ে দেখলাম মিউনিসিপ্যালিটির সামনে আন্দরকিল্লায় মাইকিং হচ্ছে যে, "ঢাকায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। আপনারা স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড় ন। ঢাকায় পাক হানাদারেরা বাঙালি ইপিআর, পুলিশ ও ছাত্রদের হত্যা করেছে। ঢাকায় যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বাঙালি রুখে দাঁড়াও।" মাইকের এই ঘোষণা শুনে আমাদের মতো ঘর ছেড়ে বহু লোক দলে দলে আন্দরকিল্লার রাস্তায় নেমে আসে এবং গগণবিদারী "জয় বাংলা" "জয় বঙ্গবন্ধু" শ্লোগান দিয়ে উল্লাস করতে থাকে। সকাল ন'টার দিকে আন্দরকিল্লা এবং লালদীঘি মানুষে ভরে যায়। তাদের অনেকের হাতে বন্দুক, থ্রি নট থ্রি রাইফেল, দেশি বল্লম ও লাঠিসোঠা। ছাত্র-জনতার মধ্যে অনেক পুলিশ ও বাঙালি ইপিআর-কেও দেখলাম। লালদীঘি থেকে আন্দরকিল্লায় সকাল সাড়ে ন'টার দিকে ফিরে দেখলাম অধ্যাপক ডঃ অনুপম সেনের শ্বশুর বাড়ির সামনের হোটেল ডি, সিটিতে এক প্রচন্ড ভিড়। ভিড়ের মধ্যে দেখলাম

সাইক্লোস্টাইল করা বাংলায় লেখা একটি কাগজ বিলি করা হচ্ছে। খুব কষ্ট করে একটা কাগজ নিলাম, দেখলাম কাল রাতে দৈনিক আজাদী অফিসে দেখা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার ইংরেজি টেক্সট-এর বঙ্গানুবাদ। আমিও আমার সাথী জনাব হাফিজ সেটা পড়লাম। সেখানে একজন অনুরোধ করে বললেন : "আঁয়ার বাড়ির রাউজান। আঁই কাগজ খান ন'পাই। আঁয়ারে ইয়ান দেওন। আঁই ইয়ান রাউজানত লই যাঁইউম।" যেহেতু এটা আমি কাল রাতে দৈনিক আজাদীর সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ এমপির সাহেবের হাতে দেখেছি এবং এটার ইংরেজি ভার্সান আমার কাছে আছে সেজন্য আমার লিফলেটটি তাকে দিয়ে দেই। ওখান থেকে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে জনসভা হচ্ছে শুনে সেখানে গেলাম। সেই শেষ রাতে সেখানে দেখলাম দুই তিন হাজার ছাত্র-জনতার সমাবেশে তদানীন্তন ছাত্রলীগের শীর্ষ জঙ্গী নেতা এস এম ইউসুফ আন্দরকিল্লায় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার যে লিফলেট বিলি করা হচ্ছিল, তা হাতে নিয়ে সমবেত জনতাকে পড়ে শুনচ্ছেন এবং বক্তৃতা করছেন। সেখানে দি পিপল এর এক সাংবাদিক বললেন যে, কাল রাতে পাহাড়তলী অয়ারলেস অফিসের ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার মোঃ নুরুল আমিন ঢাকা মগবাজার ওয়ারলেস অফিস থেকে প্রেরিত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মেসেজ রিসিভ করেন। সেখান থেকে জনাব আমিনের ভাই নন্দনকানন অয়ারলেস অফিসের অয়ারলেস অপারেটর এবং "স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের" চট্টগ্রাম টিএন্ডটি'র মহাসচিব মাহতাব উদ্দিনকে ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মেসেজ তৎক্ষণাৎ দিয়ে দেন। মাহতাব উদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতাদের ও চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের বেঙ্গল রেজিমেন্টকে উক্ত মেসেজ দিয়ে দেন। আওয়ামী লীগ নেতারা উক্ত অযারলেস মেসেজের কপি নিয়ে সারা শহরে বিতরণ করেছেন। স্বাধীনতা ঘোষণার সেই কাগজ এখানে বিলি হচ্ছে। সাংবাদিকের মুখে একথা শুনে নুরুল আমিন ও মাহতাব উদ্দিনকে দেখতে অনেকেই গেল নন্দনকানন ও পাহাড়তলী অফিসের দিকে।

বঙ্গবন্ধুর উক্ত স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে চট্টগ্রামের জীবিত শীর্ষ আওয়ামী লীগ নেতা এম এ মান্নান ৫ ডিসেম্বর ১৯৯৬ তারিখে আমাকে দেয়া সাক্ষাতকারে ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বললেন। তিনি বললেন, ২৫ মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় আওয়ামী লীগ নেতা এম আর সিদ্দিকীর বাটালি হিলের বাসায় চট্টগ্রাম জেলা সংগ্রাম পরিষদের পাঁচ-সদস্যবিশিষ্ট কো-অর্ডিনেটিং কমিটির মিটিং হচ্ছিল। মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন জহুর আহমদ চৌধুরী, এম এ হান্নান, এম আর সিদ্দিকী, অধ্যাপক মোঃ খালেদ এমপি এবং আমি। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর বাসায় যোগাযোগ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে বলা হয় তিনি পরে যোগাযোগ করবেন। রাত সাড়ে আটায় বঙ্গবন্ধুর ফোন আসে। তাঁর সাথে কথাব লেন জহুর আহমদ চৌধুরী। বঙ্গবন্ধু তাঁকে বলেন, "আমার বাড়ির টেলিফোন গোয়েন্দারা গোপনে রেকর্ড করছে। সেজন্য পাশের বাড়ি মোশারফ হোসেনের

টেলিফোন থেকে কথা বলছি। জরুরি মেসেজ লিখে নিন : "আপনারা ২৫ মার্চ রাত দশটার মধ্যে সমগ্র চট্টগ্রামকে স্বাধীন করে সকল ফোর্স নিয়ে কুমিল্লায় অগ্রসর হোন। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও আশপাশের এলাকার সকল ফোর্সকে আজ রাতের মধ্যে সংগঠিত করুন। কুমিল্লায় আপনাদের শক্তি সংহত করুন এবং অবস্থা অনুকূলে আসলে চট্টগ্রাম বিভাগের সকল ফোর্স নিয়ে ঢাকায় অগ্রসর হোন। আমার কাছ থেকে পরবর্তী নির্দেশ না পেলে আমার এই নির্দেশসমূহ পুরোপুরি পালন করবেন।

তিনি বললেন : মেসেজটি বঙ্গবন্ধু টেলিফোনে বলছিলেন। সেটা শুনে জহুর আহমদ চৌধুরী জোরে জোরে বলছিলেন এবং আওয়ামী লীগ নেতা এম এ মান্নান সেটা লিখে নিচ্ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই মেসেজ পাওয়া মাত্র কো-অর্ডিনেশন কমিটি হালি শহরের তদানীন্তন ইপিআরকে যোগাযোগ করলো এবং আর্মির বাঙালি অফিসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আতাউর রহমান খান কায়সার এবং ডঃ জাফরকে দায়িত্ব দেয়া হলো। ইপিআর-এর মেজর রফিক তার বাহিনী নিয়ে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন। চট্টগ্রামের এসপি শামসুল হক এবং ডিসি রমিজ উদ্দিনকে বলা মাত্র তারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং রাত ৯টার মধ্যে তার অস্ত্রগারের যত আর্মস ছিল সব আমাদের ছাত্রলীগ ও অন্যান্য কর্মীদের দিয়ে পুলিশের সঙ্গে সমন্বিত বাহিনী গড়ে তুললো।

জনাব মান্নান বললেন : "বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক রাত ১০টার মধ্যে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান এলাকার সকল এম এন এ এমপি'র নেতৃত্বে প্রশাসনের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে নেয়া হলো এবং সমস্ত চট্টগ্রামকে মুক্ত করে ফেলা হলো। সূর্যসেনের বীর চট্টলা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১০টার মধ্যে স্বাধীন ভূখন্ড হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ালো। চট্টগ্রামের ইপিআর কমান্ডার মেজর রফিক বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ আমাদের থেকে পাওয়া মাত্র টাইগারপাসের মুখে দেওয়ানহাট ওভার ব্রীজের ওখানে পাক সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দেয়।"

২৫ মার্চের রাতের সেই স্মৃতিকথা স্মরণ করে বললেন জনাব মান্নান : "পাথরঘাটায় জুপিটার হাউজে জনাব আখতারুজ্জামানের বাসায় রাতে অস্থায়ী ক্যাম্প গড়ে তোলা হয়, সেখানে বসে আমরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী কুমিল্লার দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করছিলাম। সেখানে ছিলেন জহুর আহমদ চৌধুরী, এম আর সিদ্দিকী, মোঃ হান্নান, অধ্যাপক খারেদ এমপি, ডঃ জাফর আখতারুজ্জামান চৌধুরী, আতাউর রহমান খান, কায়সার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মিটিং চলাকালীন এম আর সিদ্দিকী বলেছিলেন, আগরতলায় চিঠি দিয়ে আর্মগ সংগ্রহ করার জন্য এক্ষুনি লোক পাঠাতে হবে। এ বিষয়ে আলোচনা চলছিল, এমন সময় সলিমপুর অয়ারলেস স্টেশন থেকে একজন মেসেঞ্জোর আসলেন। তার হাতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার অয়ারলেস মেসেজ। তখন রাত সাড়ে বারোটা হবে। মেসেজটি ইংরেজিতে ছিল। মেসেজটি আমাদের চারজন নেতার নামে অর্থাৎ জহুর

আহমদ চৌধুরী, এম এ হান্না , এম আর সিদ্দিকী এবং আমার নামে ছিল। তৎক্ষণাৎ জুপিটার হাউজ থেকে চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের আশাপাশের জেলা সমূহের সকল এমপি এবং এম এন এ'দের কাছে মেসেজটি টেলিফোনে জানানো শুরু হলো।"

তিনি বললেন : "আমি ও হান্নান সাহেব তৎক্ষণাৎ মেসেজটি নিয়ে আমাদের আন্দরকিল্লা অফিসে গেলাম। তখন রাত গেড়টা। সেখানে গিয়ে দেখি লোকে-লোকারণ্য। "জয় বাংলা", "জয় বঙ্গবন্ধু" ধ্বনিতে তখন আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠছে। আমরা বঙ্গবন্ধুর সেই স্বাধীনতার মেসেজ তাদের দেখালাম এবং পড়ে শুনালাম। আনন্দে উদ্বেলিত হাজার হাজার জনতা সেই স্বাধীনতার মেসেজ-এর কপি চাইল। তৎক্ষণাৎ আমি আন্দরকিল্লা অফিসে রাখাল বণিককে পেলাম, তিনি ইংরেজিতে খুবই দক্ষ। তাকে অয়ারলেস মেসেজটি দিয়ে বললাম, "জলদি অনুবাদ করে দেন।" তিনি ১০ মিনিটের মধ্যে অনুবাদ করে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শত শত ছেলে বসে গেল কার্বন কপি করতে। সারারাত ধরে সেসব বিলি হতে লাগালো এবং চট্টগ্রাম ও আশপাশের জেলাসমূহের লোকজন নিয়ে যেতে লাগালো যে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের ইপিআর পুলিশ এবং আনসারের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ মুক্ত করে ফেলা হয়েছে।"

তিনি সেদিনের ঘটনা উল্লেখ করে আরও বললেন : "২৬ মার্চ ভোরে আমি, হান্নান সাহেব এবং আতাউর রহমান খান কায়সার পাঁচলাইশে ৮ম বেঙ্গলের অবস্থানস্থলে যাই। কারণ, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আওয়ামী লীগে নেতাদের নেতৃত্বে মেজর রফিকের ইপিআর এবং এসপি শামসুল হকের সমগ্র পুলিশ বাহিনী আওয়ামী লীগের নির্দেশ মত সমগ্র চট্টগ্রাম দখল করে ফেলে। কিন্তু ৮ম বেঙ্গলের একটিভিটি আমরা কেউ জানতে পারিনি। পাঁচলাইশে গেলে পাঁচলাইশ থানার ওসি গোলাম নূর আমাদের জানালেন, মেজর জিয়া এখান থেকে কালুরঘাট চলে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর পূর্ব দিনের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম, কুমিল্লা মুক্ত করে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট আমাদের দখলে সহজে নিতে পারতাম এবং ঢাকা পাক সেনাদের কবলে চলে গেলেও চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত রাজধানী করা হতো। কিন্তু ইপিআর-এর মেজর রফিক এবং চট্টগ্রাম পুলিশের এসপি শামসুল হকের ফোর্সের থেকে বিছিন্ন হয়ে গিয়ে মেজর জিয়ার ৮ম বেঙ্গল চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রামকে স্বাধীন করে রাখা যায়নি। এটা মেজর রফিক, বীর উত্তম লিখিতভাবেও বলেছেন।"

জনাব মান্নান বললেন : "যাহোক ওসি সাহেবের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী বোয়ালখালি থানার করলডাঙ্গা পাহাড়ের পাদদেশে একটি গ্রামের পুকুর পাড়ে মেজর জিয়ার ফোর্সের দেখা পেলাম। সেখানে মেজর জিয়া, ক্যাপ্টেন শওকত, ক্যাপ্টেন হারুন, লেঃ শমসের মোবিন, ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান প্রমুখদের দেখা পেলাম। আমি ও হান্নান সাহেব তাদেরকে ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত স্বাধীনতার মেসেজের কপি দিলাম। তাদেরকে আমরা চট্টগ্রাম শহরে আসতে বললাম।

তাদেরকে আমরা জানালাম যে, মেজর রফিকের ইপিআর সহ পুলিশ, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ কর্মীরা ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম দখল করে ফেলেছে। আপনার ৮ম রেজিমেন্ট নিয়ে আপনি চট্টগ্রাম শহরে আসেন এবং মেজর রফিকের সঙ্গে মিলে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট দখল করে ফেলুন। তাকে আরো বললাম যে, চট্টগ্রামের নেতাদের কাছে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ছাড়াও আলাদা নির্দেশ এসেছে যে, চট্টগ্রাম মুক্ত করে সকল ফোর্সসহ চট্টগ্রাম নেতাদের নেতৃত্বে কুমিল্লা দখল করতে হবে এবং আশপাশের জেলাসমূহের প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণও গ্রহণ করতে হবে। মেজর জিয়া বললেন, স্যার বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার কপি আমরা পেয়েছি, সেই মতো আমি ও আমার ফোর্স বিদ্রোহ করেছি। এই কথা বলে তিনি বললেন যে, তার ফোর্স টায়ার্ড, তারা কিছু পরে আসবে।"

পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে তিনি বললেন : "সেখান থেকে হান্নান সাহেব কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতারের দিকে রওয়ানা দিলেন। সেখানে আওয়ামী লীগের নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করার জন্য এবং তিনি সেখান থেকে ২৬ মার্চ শুক্রবার দুপুর আনুমানিক দু'টায় একবার এবং ২/৩ ঘণ্টা পরে আর একবার বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করেন। তাঁর উক্ত ঘোষণার পর স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে থেমে থেমে বঙ্গবন্ধুর উক্ত ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণা সারাদিন প্রচার হতে থাকে। পরের দিন ২৭ মার্চ শনিবার আমার ও স্বাধীন বাংলা বেতারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বেলাল মোহাম্মদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে মেজর জিয়া সন্ধ্যা ৭:৪০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে উক্ত স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন।" (মেজর রফিকুল ইসলামের ইপিআর বাহিনীর সাথে মেজর জিয়াউর রহমানের ৮ম বেঙ্গল বাহিনীর কেন সমন্বয় হয়নি এবং কেন তিনি চট্টগ্রাম শহরের ইপিআর, পুলিশ, আনসার ও অন্যান্য ফোর্সের সাথে সংযুক্ত থেকে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট দখলের পরিকল্পনায় এগিয়ে নিলেন না এবং চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত সুযোগ গ্রহণ করেননি সে রহস্যের কুল- কিনারা আজও হয়নি।)

ঢাকার ইপিআর সিগনাল কোরের সুবেদার মেজর বীর শহীদ শওকত আলী দুঃসাহসিকভাবে ২৫ মার্চ রাতে সাড়ে এগারোটায় পিলখানা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের Proclamation of Independence প্রেরণ করেন। সেই ঐতিহাসিক বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনার বিবরণ জানতে মুখোমুখি হলাম এই বঙ্গবীরের একমাত্র সন্তান রাজশাহী প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপিকা সেলিনা পারভীন (ওরফে রীতা) এবং এই বঙ্গবীরের সহধর্মিনী মিসেস ফিরোজা বেগম-এর সাথে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগে বর্তমান অধ্যাপক পদে কর্মরত তাঁর একমাত্র সন্তান সেলিনা পারভীন বললেন : "স্বাধীন বাঙালি জাতির কাছে আমাদের কোন চাওয়া-পাওয়া নেই। আমার বাবার জন্ম দিয়েছে যে জন্মভূমি সেই জন্মভূমি বাংলাদেশকে পাকিস্তানিদের জিঞ্জির মুক্ত করতে আমার বাবা ২৫ মার্চ রাত

সাড়ে এগারটায় পিলখানা থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা সারা দেশে প্রচার করে দিয়ে শহীদ হয়ে গেছেন। এই বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে যতদিন থাকবে, বাঙালি জাতি যতদিন স্বাধীনতা ভোগ করবে, ততদিন কেউ আমার বাবার নাম বিস্মৃত হতে পারবে না। বঙ্গ জননীর সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে আমার বাবার নাম লেখা রবে কেয়ামত পর্যন্ত।

অধ্যাপিকা ফিরোজা পারভীন ২৫ মার্চে তার স্বামীর বীরত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাসের পাতা তুলে ধরলেন: "২৫ মার্চ রাত ১১টার কাছাকাছি সময়ে ইপিআর-এর পরিচালক বিগ্রেডিয়ার নেসার আহমদের বাড়ির দিক থেকে একটা ট্রেসার শেল আকাশে গিয়ে ফাটার সঙ্গে সঙ্গেই পাকবাহিনী আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে গোটা ইপিআর ব্যারাক, কোয়ার্টার গার্ড দখলে নিয়ে নেয়। বহু সংখ্যক বাঙালি সৈনিক হতাহত হয়। তবে প্রাথমিক হতাহতের মধ্যে সিগন্যাল কোরের লোক ছিল কম। কারণ, তারা তাদের সুবেদার শওকতের পরামর্শ মতো সবাই গিয়ে ঘুমিয়েছিলেন ছাড়ে। এদিকে পাক বাহিনীর আক্রমণের সাথে সাথে সুবেদার মেজর শওকত আলী প্রচণ্ড গতিতে তার কোয়ার্টারে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সচল করে তোলেন তাঁর ট্রান্সমিটার। ইপিআর-এর দেশপ্রেমিক সৈনিকদের কাছে গোপনে পূর্বে প্রেরিত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা proclamation of Independence সারা দেশে ইংরেজিতে ট্রান্সমিট করতে শুরু করেন। যে স্বাধীনতার ঘোষণা ইংরেজিতে ট্রান্সমিট করেন তার একটি কপি তাঁর জীবিত সহকর্মীরা ১৯৭২ সালে পিলখানায় আমাকে দেন। সেটা ছিল "This may by my last message; from today Bangladesh is Independent...". বঙ্গবন্ধুর এই Proclamation of Independence ট্রান্সমিট করার কাজে তাঁর সাথে ২৫ মার্চ রাতে আরো দু'একজন জড়িত ছিলেন। সেকথা পরে আমি জানতে পারি ইপিআর-এর কর্ণেল আওয়ানের কাছ থেকেই। অন্যরা বোধ হয় বাকি সব ট্রান্সমিটার নিয়ে পিলখানার বাইরে কোথাও থেকে সেই একই মেসেজ ট্রান্সমিটর করার কাজ একইভাবে করেছিলেন। বীর শহীদ সুবেদার মেজর শওকতের গর্বিতা স্ত্রী মিসেস ফিরোজা বেগম এবং বঙ্গ বীরের ধন্য কন্যা অধ্যাপিকা সেলিনা পারভীন রীতা যতটুকু খবর পেয়েছিলেন তাতে জানা যায়, রাত সোয়া বারোটা বা তার কাছাকাছি কিছু সময় পরেই বঙ্গবন্ধুর Proclamation of Independence বেতারে ট্রান্সমিটরত অবস্থায়ই তিনি পিলখানায় পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন ও শহীদ হন।

বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্য কারণ

আব্দুর রাজ্জাক

বছর ঘুরে আবার ফিরে এলো আগস্ট মাস। বাঙালি জাতির অনন্য সম্পদ হারানোর শোকের মাস। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলার মানচিত্রে কৃষ্ণ গহ্বরের ক্ষত সৃষ্টি করেছিল দুর্বৃত্তরা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রস্ট-রূপকার এবং আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে। ১৯৭৫-২০০৫, এর মধ্যে ৩০ বছর পার হলেও বাঙালি জাতি স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ কতটুকু লাভ করতে পেরেছে? যে লক্ষ্য এবং স্বপ্নকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্যে দিয়ে সেই সব স্বপ্ন নস্যাৎ হয়ে যায়। যখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তি ক্ষমতাসীন আর ক্ষমতাসীনরা ১৯৭১-এর পরাজিত শক্তির ক্রীড়নক, তখন এই বাংলায় ২১ আগস্ট কিংবা ১৭ আগস্টের মতো নজিরবিহীন ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনারবাংলা আজ শ্বাপদদের ধারালো দন্ত আর নখরের আচড়ে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। বঙ্গবন্ধু তো আজকের এমন বাংলাদেশের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম করেননি।

বাংলার ইতিহাস হলো আজন্ম পরাধীনতার। হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালি জাতির কোনদিন স্বাধীন জাতির পরিচয় নিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান ছিলো না। রাজা শশাঙ্ক, পাল বংশও সেন যুগে বাংলা ভাষা সংস্কৃতির কিছুটা চর্চ্চা ও উন্নয়ন হয়েছিল। এরপর মোগল যুগ, শায়েস্তা খানের শাসনামল এবং সর্বশেষ ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ইংরেজদের কাছে সিরাজউদ্দৌলার পতন, ১৯৪৭ সারে দেশভাগ, অতঃপর ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের আগ পর্যন্ত এই পুরো ইতিহাস হলো পরাধীনতার। যদিও বৃটিশ রাজত্বের শেষের দিকে এবং পাকিস্তান আমরে বাঙালি জাতীয় নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন বটে, কিন্তু তারা নানা কারণে এই আন্দোলনে চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করতে পারেননি। এদের মধ্যে কোন নেতাই ভাষা-ভিত্তিক জাতীয় স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেননি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবই একমাত্র নেতা যিনি ভাষাভিত্তিক জাতীয় স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেছেন। তাঁর চিন্তা-চেতনাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে ভাষা আন্দোলন-স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন-স্বাধীকার আন্দোলনকে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত করেন। বঙ্গবন্ধুই ভাষাভিত্তিক স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপকার।

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট ধর্মীয় বিভাজনের মাধ্যমে এ উপমহাদেশ বিভক্ত হয় দুটি দেশে; পাকিস্তান ও ভারত। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে যাবতীয় আচরণে অভ্যস্ত হলেও সুচতুর জিন্নাহর তাঁর ক্ষমতা লাভের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্যে তথাকথিত মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধূয়া তোলেন। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশ-ভাগ বঙ্গবন্ধু মেনে নিতে পারেননি। উচ্চ শিক্ষার্থে কলকাতা থাকলেও তিনি ঢাকা চলে আসেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রদের নিয়ে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ যা আজকের বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। এই ছাত্রলীগ পরবর্তীকালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৪৮ এর ১১ মার্চ ভাষা-দিবস পালনের মাধ্যমে সূচিত আন্দোলন পরবর্তীকালে ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারির বিয়োগান্তক লড়াইয়ের মাধ্যমে চূড়ান্তরূপ লাভ করে। ভাষা শহীদের রক্তের প্রতিশোধ স্পৃহায় গড়া যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপক সফলতা লাভ করে। অবশেষে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসকদের দ্বারাই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা স্বীকৃতি লাভ করে। মূলতঃ ভাষা-সংগ্রামের এই সফল অর্জন পরবর্তীকালে মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল সমগ্র জাতিকে, যার নেতৃত্বের পুরোধা ছিলেন বঙ্গবন্ধুই।

১৯৬২ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠে। পাশাপাশি ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছাত্রস্বার্থ-পরিপন্থি কুখ্যাত হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন-এর প্রদত্ত রিপোর্টের বিরুদ্ধে ছাত্ররা তুমুল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সময় ওয়াজিউল্লাহ এবং বাবুল শহীদ হয়। শহীদের তাজা রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তানিরা অবশেষে চাপিয়ে দেয়া শিক্ষা কমিশন বাতিল করতে বাধ্য হয়।

১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানকে অরক্ষিত রেখে পাকিস্তান ভারতের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অভিভাবকহীন ও অসহায় হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু তখন স্বাধীন জাতিসত্ত্বার প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি করে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে বাঙালি জাতির ধমণিতে প্রবাহিত করেন। ঘুমন্ত বাঙালিকে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বপ্ন দেখাতে জাগ্রত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ সালে স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার ৬-দফা এবং ছাত্র সমাজের ১১-দফা বাস্তবায়ন আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে এবং সারাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। এ সময় আন্দোলনের শীর্ষপুরুষ বঙ্গবন্ধুকে দাবিয়ে রাখার জন্য ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় জড়িয়ে তাকে কারান্তরীণ করে। যে কারণে এই জনপদের স্বাধীনতা-পিপাসু জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রিয় নেতার মুক্তির দাবিতে রাজপথে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমান্বয়ে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে অবশেষে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে সেই উত্তাল গণআন্দোলনকে রুখতে দুঃশাসকরা সেদিন ছাত্রদের মিছিলে নির্বিচারে গুলি করে।

শহীদ হয় ছাত্রনেতা আসাদ, মতিউরসহ আরো অনেক। ১৯৬৯ এর সেই উত্তাল গণঅভ্যুত্থানের সময় "আমি কে? তুমি কে?–বাঙালি, বাঙালি"; " পিন্ডি না ঢাকা-ঢাকা, ঢাকা", "তোমার আমার ঠিকানা–পদ্মা, মেঘনা, যমুনা"; " বীর বাঙালি অস্ত্র ধর–বাংলাদেশ স্বাধীন করো" ইত্যাদি শ্লোগানে মুখরিত বাঙালির অদমিত আন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, মুক্তি আন্দোলনের রূপকার, পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড দ্রোহ শেখ মুজিবুর রহমানকে বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ পল্টনের জনসমুদ্রে ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে বরণ করে নেয়।

এরপর ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এতদসত্ত্বেও পাকিস্তানিরা ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের রায়ের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়। আবারও বঞ্চিত বাঙালিরা পাকিস্তানিদের এই ঘৃণ্য চক্রান্ত রুখতে দেশব্যাপী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ২০ লক্ষ মানুষের উত্তাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" সেদিনের সেই জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু জনগণের উদ্দেশ্যে "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে" এই উদাত্ত আহ্বানে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত বাঙালি স্বাধীনতার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বস্তুতপক্ষে ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানেই বঙ্গবন্ধু অনানুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেছিলেন। ২৫ মার্চ রাতের কালো অন্ধকারে হানাদার পাকিস্তানিরা ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় নিরীহ ঘুমন্ত বাঙালিদের উপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। এ রাতেই ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলার আপামর জনগণ। নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর দেশীয় স্বাধীনতা বিরোধী চক্র এবং বিদেশি ষড়যন্ত্রকে রুখে দিয়ে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত আর ২ লক্ষ ৬৯ হাজার মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাঙালির আজন্ম লালিত স্বপ্ন স্বাধীনতার সোনালী সূর্য উদয় হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। বিশ্ব- মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে নতুন একটি দেশের অভ্যুদয় হয়। বঙ্গবন্ধুর প্রথম বিপ্লব স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি প্রদানে পাকিস্তান গড়িমসি শুরু করে। অবশেষে আন্তর্জাতিক চাপে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তান থেকে লন্ডন ও দিল্লী হয়ে ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলায় পদার্পণ করেন।

স্বদেশে ফিরেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সুসংহত করার জণ্য বিভিন্ন

কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে জাতিসংঘের সদস্যপদ গ্রহণ, বিভিন্ন দেশের তরফ থেকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়, ওআইসি এবং জোট-নিরপেক্ষ দেশসমূহের সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ ছিল তাঁর কূটনৈতিক সফলতার অনন্য নিদর্শন। এর পরেই সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু তার অর্থনৈতিক মুক্তির দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা করেন। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, অবকাঠামো, শিল্প-কারখানা স্থাপনসহ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি পুনর্গঠনের বিস্তৃত কর্মসূচি গ্রহণ করেন। দেশের জনগণ বঙ্গবন্ধুর চোখে সুখী-সমৃদ্ধ আগামীর স্বপ্ন দেখেন। বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক মুক্তির দ্বিতীয় বিপ্লব যাতে সফল না হয়, জাতি হিসেবে বাঙালি জাতি পৃথিবীতে উন্নত জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে, সেই জন্য ১৯৭১-এর পরাজিত শক্তি দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং দেশের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে লুটতরাজ, সন্ত্রাসসহ নানাবিধ অরাজকতা ও নাশকতামূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। কারণ ওরা জানে, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব সফল হলেই বাঙালি জাতি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে।

বাংঙালি জাতির এ প্রগতির চাকা পেছনের দিকে ঠেলে দিতে এবং ১৯৭১ এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীদের মদদে কিছু বিভ্রান্ত ও লোভী সেনা-কর্মকর্তারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালো রাতে বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করে। স্তব্ধ করে দেয়া হয় বাঙালি জাতির সুখী-সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের অগ্রযাত্রাকে। এরপর শুরু হয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লুটেরাদের সামরিক শাসন। এভাবে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২১ বছর গণতন্ত্রকে হত্যা করে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ লাভ হতে বঞ্চিত করা হয়। অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যায়।

দীর্ঘ ২১ বছর পরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে ১৯৯৬ সালের গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের অর্থনৈতিক মুক্তির অসমাপ্ত কর্মসূচি পুনরায় গ্রহণ করেন। গ্রমীণ অর্থনীতির চাকা সচল করতে কৃষিখাতে ব্যাপক ভর্তুকিসহ কৃষি-উপকরণ সহজলভ্য করেন। ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য-ঘাটতির কবল থেকে মাত্র তিন বছরের মধ্যেই দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে উপরন্তু ২৬ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য উদ্বৃত্ত রাখার সাফল্য অর্জন করেন। দেশে প্রথমবারের মত একটি সময়োপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন। ভূমিহীনদের জন্য আশ্রায়ন প্রকল্প তৈরি করেন। এছাড়া বিধবা-ভাতা, বয়স্ক- ভাতা, ভি. জি. এফ. কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য-বণ্টন কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ করে দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গণে প্রশংসিত হন। সুদীর্ঘ কালের পার্বত্য অঞ্চলের অশান্তি নিরসনে পাহাড়ী-বাঙালি একীভূতকরণে ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি-চুক্তি, ভারতের সাথে ঐতিহাসিক পানি-চুক্তি সম্পাদন এবং

বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবেস হিসেবে পালনের উদ্যোগ সফলতার সাথে সম্পন্ন করে তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গণে নিজেকে সফল এবং যোগ্যতম নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মূলত শেখ হাসিনার ৫ বছরের শাসন আমল ছিল বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্বর্ণযুগ। এভাবে জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ সরকারের নেতৃত্বে দেশ যখন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে যাচ্ছিল এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গণে একটি আত্মনির্ভরশীল ও উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্বদরবারে মাথা উচু করে দাঁড়াতে শিখলো, ঠিক তখন ২০০১ সালে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীদের নীল নক্শার নির্বাচনে জনগণের প্রকৃত রায়কে বানচাল করে দিয়ে বিএনপি চার-দলীয় জোটের মোড়কে একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গী গোষ্ঠী এবং স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তি ক্ষমতায় আসীন হয়। শুরু হয় দেশব্যাপী অত্যাচার-নির্যাতন এবং সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর চরম আস্ফালন। বিচার বিভাগ ও প্রশাসনে নির্লজ্জ দলীয়করণ, আইনের প্রতি চরম অবজ্ঞা, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অবাধঢ় লুটতরাজ, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, ইতিহাসক বিকৃতি, সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে উগ্র জঙ্গীবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর চরম বিস্তৃতি এবং দুঃশাসন আজকের বাংলাদেশকে শুধু দেশেই নয় বরং আন্তর্জাতিকভাবেও অকার্যকর ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই দুঃশাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক মুক্তির অসমাপ্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমাদের ১৯৭১-এর মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় আরো একবার নিজেদের বলীয়ান করে ঐক্যবদ্ধভাবে অপশক্তিকে রুখতে হবে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জনগণের সরকার গঠন করে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেই আন্দোলনে বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে তার অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা অক্ষুন্ন রাখার জন্য এই ব্যর্থ সরকারের পতন ঘটাতে হবে।

জয় বাংলা।

জয় বঙ্গবন্ধু।

মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে বঙ্গবন্ধুর অবদান

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

বাংলাদেশ-ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কের প্রথম পর্যায়ে দুটো প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, এবং তা হলো : (ক) ইসলামী বিশ্ব কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি দান-সংক্রান্ত বিতর্ক; ও (খ) স্বীকৃতি পাবার পর বাংলাদেশের দিকে থেকে প্রতিদানমূলক ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ইসলামী বিশ্বের বাংলাদেশ-বিরোধী ভূমিকা, স্বাধীনতার পর ইসলামী বিশ্বে পাকিস্তানের বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচারণা এবং সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় নীতি–ইত্যাদির কারণে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশ ও ইসলামী বিশ্বের মধ্যে এক বিরাট মানসিক ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রভাবে ক্রমান্বয়ে এ ব্যবধানের অবসান হয়।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর ইসলামী বিশ্বের যে ভূমিকা ছিল তা যেমন একাধারে বাংলাদেশ-বিরোধী, তেমনি পাকিস্তানের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনমূলক। ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর দৃষ্টিতে এ মুক্তিযুদ্ধ ইসলাম-বিরোধী অপ্রয়াস হিসেবে এবং ইসলামী সংহতির প্রতি হুমকি হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছিল। ১৯৭১-এ ২২-সদস্যবিশিষ্ট ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) জেদ্দা অধিবেশন 'জাতীয় সংহতি ও আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষায়' পাকিস্তানের 'ন্যায়সঙ্গত' প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানায়।

অধিবেশন শেষে প্রকাশিত ইশতেহারে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্যে বিদেশি শক্তিকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়। চরম সংকটকালে পাকিস্তানের পাশাপাশি যুদ্ধ করার জন্যেও ইরান ইচ্ছা প্রকাশ করে; কারণ ইসলামী সংহতি রক্ষার জন্যে তা ছিল জেহাদের মতো নৈতিক কর্তব্য। তবে এ সময়ে মিশরের ভূমিকা ছিল বেশ কৌতূহলদ্দীপক এবং কূটনৈতিক বিবেচনা-প্রসূত: তার দৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যা সঠিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হয়নি। কাজেই দু অংশের মধ্যে ঐক্য অটুট রাখতে হলে সুনিশ্চিত সমাধান খুঁজে বের করা দরকার। তবে অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রই শুধুমাত্র নৈতিক ও কূটনেতিক সমর্থন জানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি সহযোগিতার নীতি অনুসরণ

করছিল। মার্কিন কংগ্রসের বিধিনিষেধ আরোপিত হবার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাকিস্তানের পক্ষে সরাসরি অস্ত্র পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে কতিপয় আরব রাষ্ট্রের সহযোগিতা পাকিস্তানি সামরিক চক্রকে বাংলাদেশে গণহত্যায় উৎসাহিত করে।

১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ইসরায়েলের ভূমিকা ছিল বেশ বিস্ময়কর। ২ জুলাই ইসরায়েলী সংসদ (Knesset) বাঙালিদের ওপর পাকিস্তান সামরিক চক্রের "পাশবিকতা ও বেপরোয়া ধ্বংসলীলাকে" নিন্দা করে একটি প্রস্তাব পাশ করে। এমনকি তাদের রেড ক্রস (Magen David Adom) বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের জন্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ওষুধ, কাপড় ও খাবার পাঠায়। শুধু এই নয়, ১৯৭২-এর এপ্রিল মাসে ইসরায়েল বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি জানায়। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ সরকার ইসরায়েলের এ সহানুভূতি গ্রহণ করেননি। ইসরায়েলের এ ভূমিকায় নাটকীয় বিস্ময় থাকলেও একেবারেও দুর্বোধ্য নয়। ইসরায়েলের নীতি বাংলাদেশের প্রতি যথার্থ মমত্ববোধ দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়নি; উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামী বিশ্বের দুঃখজনক বৈরিতায় ক্ষুব্ধ বাংলাদেশের ওপর একটি মানসিক প্রভাব গড়ে তোলা। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ইসরায়েলের অর্থ, অস্ত্র ও কূটনৈতিক স্বীকৃতি গ্রহণ করলে তা হতো আরব বিশ্বের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের এক বিরাট কূটনৈতিক বিজয়। অবশ্য তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে কূটনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। যখন আরব-বিশ্ব সক্রিয়ভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করছে তখন ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল ইসরায়েলের সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা। কিন্তু তা না করে বাংলাদেশ আরব-বিশ্বকে একটি দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষাই দিয়েছিল।

অবশ্য আরব বিশ্বের বাংলাদেশ-বিরোধী ভূমিকা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। প্রথমত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাদের কাছে পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে ইসলামী সংহতি বিনষ্টের একটি অপপ্রয়াস মনে হয়েছিল। ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনও এ ধারণা সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছিল। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের অপপ্রচার তাদের জনমতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। দ্বিতীয় ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্নিহিত সমস্যা সম্পর্কে আরব বিশ্ব সম্যকভাবে অবহিত ছিল না। বলা যেতে পারে, কিছুটা "ইনফরমেশন গ্যাপ"-এর মতো পরিস্থিতি ছিল। ১৯৭৩-এর জানুয়ারি মাসে ঢাকা সফরকারী মিশরীয় সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের নেতা মোহাম্মদ হায়কল এ কথা স্বীকার করেছিলেন: "সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই আমাদের কাছে পরিষ্কার ছিল না। এখন মনে হয় আমরা যা ভেবেছিলাম ঘটনাটা আদৌ তা ছিল না।" কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিশ শতকের পৃথিবীতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দানে ধন্য সহজতর সংবাদ প্রবাহের যুগে এ ধরনের "ইনফরমেশন গ্যাপ" কি ইচ্ছাকৃতভাবে চোখ ও কান ঢেকে রাখার মত ব্যাপার

নয়? অবশ্য আমরা দেখেছি, মিশর প্রথম থেকেই একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সার্বিকভাবে আরব বিশ্ব তথাকথিত ধর্মীয় বিবেচনার দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। তাদের কাছে মনে হয়েছিল ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্ররোচনায় ও সক্রিয় সহযোগিতায় কিছু বিপথগামী বাঙালি ইসলামী সংহতি বিপন্ন করছে। তারা এটা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিল যে, এ মুক্তিযুদ্ধ ছিল বঞ্চনা, স্বৈরাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে; যা যুক্তির বিচারে ইসলামী আদর্শের সমর্থন পেতে পারতো।

আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে: কেন স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো ইসলামী রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি? তিনটি ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। প্রথমত, আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশের প্রতি ইসরায়েলের সমর্থন ও স্বীকৃতি তাদেরকে ক্ষুব্ধ করেছিল। এ সমর্থন ও স্বীকৃতি বাংলাদেশ প্রত্যাখ্যান করলেও তাদের মনে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ইসলাম-বিরোধী রাষ্ট্র হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করবে। দ্বিতীয়ত, ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের প্রতি স্বীকৃতি জানিয়ে তারা ইসলামী সংহতি "একনিষ্ঠ সেবক" পাকিস্তানের বিরাগভাজন হতে চায়নি। তৃতীয়ত, তারা ভেবেছিল, ভারতের তাবেদার একটি দুর্বল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়ে কোন কূটনেতিক স্বার্থ উদ্ধার হবে না।

অবশ্য সময়ের বিবর্তন ও পরিস্থিতির পরিবর্তন-এর ফলে ক্রমান্বয়ে উভয় পক্ষেই মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছিল। এবং বঙ্গবন্ধুর আমলে ও ধর্মনিরপেক্ষতার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি চালু থাকার সময়েই ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন সূচনা হয়। এ পরিবর্তনের পটভূমি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হলে ১৯৭২-এর ঘোষিত সংবিধানের ভিত্তি ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি আলোচনা করা প্রয়োজন।

সাংবিধানিকভাবে মুজিব সরকার ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতা জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ১৯৭২- এর ৪ নভেম্বর ঘোষিত প্রথম সংবিধানে (ক) যাবতীয় সাম্প্রদায়িকতা, (খ) কোন একটি বিশেষ ধর্মের জন্যে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার, এবং (ঘ) ধর্মের ভিত্তিতে পার্থক্য করার ঐতিহ্যকে বিলোপ করা হয়। এ ছাড়া সংবিধানের ভূমিকাতেও অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৭১-এ ইসলাম ও ইসলামী সংহতির নামে যে নৃশংস বাঙালি (পাকিস্তানি ইসলাম-সেবক ও তাদের বাঙালি সহযোগীদের পরিভাষায় 'কাফের') নিধন যজ্ঞ চলেছিল, তার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যত বাংলাদেশ রাষ্ট্রে এমনি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী দিনগুলোতে হত্যাযজ্ঞের সহযোগী ধর্মান্ধদের ও তথাকথিত ইসলামের বিরুদ্ধে আপামর জনগণের যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা পরিলক্ষিত হয়েছিল তা থেকে বোঝা গিয়েছিল যে, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে ইসলাম অনুপস্থিত থাকবে। এ ধারণা বাস্তবে পরিণত হলো যখন ১৯৭২-এ সরকার বাংলাদেশ-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণকারী দক্ষিণপন্থী ও ধর্মভিত্তিক

রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তবে মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়; বঙ্গবন্ধু নিজেই তা মনে করেন নি কখনই।

১৯৭৪-৭৫-এর অর্থনৈতিক সংকট ও ইসলামী বিশ্বের নিকট থেকে স্বীকৃতি আদায়ের প্রয়োজনে বাংলাদেশের পরাষ্ট্রনীতি নতুন মোড় নিতে থাকে। ১৯৭৫-এর মাঝামাঝি এ পরিবর্তনের বিভিন্ন লক্ষণ প্রকট হয়েছিল। ১৯৭৫-এর ২২ মার্চ তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশ-বলে ইসলামিক একাডেমী ও বায়তুল মুকাররম সোসাইটিকে একীভূত করে বৃহত্তর পরিসরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২৮ মার্চ "ইসলামিক ফাউণ্ডেশন এ্যাক্ট" প্রবর্তিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রম, সমাজ কল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী মন্তব্য করেন, "ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি বাংলাদেশ আস্থাশীল; এবং ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি শান্তি ও বিশ্বজনীন সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সে প্রয়াস চালিয়ে যাবে।" এ বক্তব্য ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ। মনে রাখতে হবে, এ সময়ে বাংলাদেশ ছিল জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার আবর্তে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ পেট্রো-ডলারের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করেছিল। তবে এটা বলা যৌক্তিক হবে যে, শুধুমাত্র ১৯৭৪-৭৫-এ বাংলাদেশ এ ব্যাপারে সচেতন ছিল; তবে ১৯৭৫-এ তা ছিল তীব্র। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে নিজের ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে সচেষ্ট ছিল। বিভিন্ন সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ভ্রাম্যমান বিশেষ দূত পাঠানো হয়েছিল। ১৯৭৩-এ আলজিয়ার্স জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ বৈঠক উপলক্ষে সমবেত ইসলামী নেতৃবৃন্দের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য বঙ্গবন্ধুর আকর্ষণীয় বাগ্মিতা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য এবং এর থেকেই দেখা যায়, বাংলাদেশের জন্যে ইসলামী বিশ্বের স্বীকৃতি আদায় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে মিশর, আলজিরিয়া ও মালয়েশিয়া তৎপরতা শুরু করেছে। ফলে দেখা যায়, ১৯৭৫-এর আগস্ট মাসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নিচের সারণীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতিদানের সময়কাল দেয়া হলো ঃ

ইরাক– ২৪ জুন ১৯৭২; আলজিরিয়া/মরিতানিয়া/তিউনিসিয়া– ১৭ জুলাই ১৯৭৩; মরক্কো–২০ জুলাই ১৯৭৩; মিশল– ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩; সিরিয়া/জায়ারে/গ্যাবোন–১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩; সুদান–১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩; লিবিয়া–১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩; কুয়েত–৩ নভেম্বর ১৯৭৩; পাকিস্তান/তুরস্ক–২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪; সংযুক্ত আরব/আমিরাত–৬ মার্চ ১৯৭৪ সৌদি আরব/সুদান–১৬ আগস্ট ১৯৭৫; জর্দান/ইরান/ ইয়েমেন–১৯, ২০, ২১ আগস্ট ১৯৭৫।

বাংলাদেশের প্রতি ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম সূচনা ১৯৭২-এর আফ্রো-এশীয় সংহতি সংস্থা-র (AAPS) সম্মেলনে। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণহত্যার তীব্র নিন্দা করা হয়। সম্মেলনে সমবেত আরব

রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন নিয়ে বাংলাদেশ এই সংস্থার সদস্য হয়। এরপর থেকেই বাংলাদেশকে ইসলামী বিশ্বের সক্রিয় সদস্য করে নেয়ার জন্যে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। একই বছর জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে (২৯ ফেব্রুয়ারি–২ মার্চ ১৯৭২) সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, বঙ্গবন্ধু ও ভুট্টোর মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া হবে। লক্ষণীয় যে, এ পর্যায়েও পাকিস্তানের বিরাগভাজন হতে কেউ চায়নি। অবশ্য উক্ত সম্মেলনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময়ে পরিস্থিতি বদলে যায়: বেশিরভাগ সদস্যই পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতার সমর্থনমূলক নীতিতে অবিচল থাকার ইচ্ছা জ্ঞাপন করে।

বৈঠকের মাধ্যমে পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যাবার চেষ্টা করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ভেবেছিল হয়তো পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে আপোষ করা সম্ভব হবে; এবং উদ্যোগের পেছনে পাকিস্তানের প্ররোচনা কাজ করেছিল, তা বলা বাহুল্য। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এ বৈঠকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু তবুও বলা চলে যে, বাংলাদেশ- ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কে ১৯৭২ ছিল একটি ক্রান্তিকাল। কারণ, এ বছর মিশর, ইরাক ও দক্ষিণ ইয়েমেনের সমর্থনের ফলে বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সদস্য হতে পারে। এ দেশগুলোর সরকার-প্রধানদের প্রতি পাঠানো এক বাণীতে বঙ্গবন্ধু ইসলামী বিশ্বের প্রতি তাঁর সরকারের নীতির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন, "এ দেশগুলোর বিষয়টি অজানা নয় যে, পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনীর ধ্বংস করে যাওয়া অর্থনীতিকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজে বাংলাদেশ নিয়োজিত এবং এতে তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন।" ঢাকার একটি ইংরেজি দৈনিক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে— "আমরা এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে পারি না যে, এ সংকটময় মুহূর্তে সারা বিশ্বের, বিশেষ করে আরবদের সহানভূতি, সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব আমরা চাই এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবি করতে পারি।"

আফ্রো-এশীয় সম্মেলন বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার ভাবমূর্তি তুলে ধরতে সাহায্য করেছিল। ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাস আলজিয়ার্স জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন এমনি আর একটি সুযোগ করে দিয়েছিল। বিশেষ করে আরব বিশ্বের কাছে যথার্থ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে উপস্থাপন করার জন্যে এ সম্মেলনেও বঙ্গবন্ধু তৎপর ছিলেন। বিভিন্ন বৈঠকে আরব নেতৃবৃন্দকে এটা বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের ধারণা শুধু ভ্রান্তই নয়, বরং অপর্যাপ্ত। এ ভূমিকায় বঙ্গবন্ধুর সফলতায় সেদিন সৌদি আরবের একজন সরকারি মুখপাত্র মন্তব্য করেছিলেন, "মধ্যপ্রাচ্যে এখন বাংলাদেশ সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেক পরিষ্কার হয়েছে।" বাংলাদেশ সম্পর্কে লিবিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান গাদ্দাফীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব ছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ! মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই গাদ্দাফীর বাংলাদেশের প্রতি বৈরি মনোভাব পোষণ করে আসছিলেন। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার যে, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এক নাতিদীর্ঘ আলোচনার পর তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত

হয়ে বাংলাদেশের মঙ্গল কামনা করে মোনাজাত করতে শুরু করেন। অথচ আলোচনার সূচনায় গাদ্দাফী চরমভাবে বাংলাদেশ-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। আলজিয়ার্স সম্মেলন থেকে দেশে ফেরার পথে বঙ্গবন্ধু বাহরাইনে যাত্রা বিরতি করেন। বাহরাইনে তাঁর এটাই ছিল প্রথম সফর। ইসরায়েলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আরবদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে বাংলাদেশের দ্বিধাহীন সমর্থনের কথা জানিয়ে তিনি সেখানকার সরকারি মহলে শ্রদ্ধা ও সহানভূতি অর্জন করেন।

ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক গড়ে ওঠার ইতিহাসে লাহোর ইসলামী সম্মেলনে সংস্থার (OIC) শীর্ষ বৈঠক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বৈঠক শুরু হবার বেশ আগে থেকেই যে-বিতর্ক জমে উঠেছিল তা হলো : বাংলাদেশকে এই সংস্থার সদস্য করে নেয়া সমীচীন হবে কিনা। অথচ ১৯৭৪-এর মধ্যে কয়েকটি ইসলামী রাষ্ট্রসহ বিশ্বের ১১৬টি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল। কাজেই বাংলাদেশকে সদস্য না করার ব্যাপারটা বেশ অযৌক্তিক ছিল। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর একটি বক্তব্য সংস্থার কর্মকর্তাদের বেশ বিব্রত করেছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল : "যদিও আমাদের শতকরা আশি ভাগ জনগণ মুসলমান এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অধিবাসী তবুও আমরা ইসলামী শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতে আগ্রহী।" তবে তিনি একটি শর্ত আরোপ করেছিলেন : পাকিস্তান স্বীকৃতি দিলেই বাংলাদেশ বৈঠকে যোগ দেবে, নইলে নয়। বাংলাদেশের এ শর্ত সম্মেলন-কর্মকর্তাদের মধ্যে বিতর্ক ও কূটনেতিক তৎপরতার সূচনা করে। সে মুহূর্তে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না; এ সময়ে পাকিস্তানের বিশেষ অনুরোধে মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সা'দাত মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে রাজী হন। কায়রোতে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজিজ আহমেদ ও বাংলাদেশের বিশেষ দূত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ১২ ফেব্রুয়ারি পৃথক পৃথকভাবে আনোয়ার সা'দাতের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। কিন্তু আনোয়ার সা'দাতের এ-উদ্যোগ ব্যর্থ হয়, কারণ পাকিস্তানের স্বীকৃতি ছাড়া বাংলাদেশ লাহোর যেতে অসম্মতি জানায়। সুতরাং পাকিস্তানকেই একটু নমনীয় হতে দেখা যায়। ১৬ ফেব্রুয়ারি সে স্বীকৃতি দিতে রাজী হয়। তবে একটি শর্তে। শর্তটি হলো, ভারতে আটক ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীর কোন বিচার করা হবে না, এ মর্মে নিশ্চয়তা দিতে হবে। বাংলাদেশ এ নিশ্চয়তা দিতে রাজী ছিল না; কাজেই নতুন সংকটের সৃষ্টি হলো। ২০ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ চেষ্টা হিসেবে সোমালিয়ার প্রস্তাব অনুসারে ঢাকায় একটি বিশেষ প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়। এ প্রতিনিধিদল ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে আলোচনায় সন্তোষজনক অগ্রগতি হওয়ার প্রেক্ষিতে ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। একই দিনে মুজিব ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের স্বীকৃতির অর্থ এই নয় যে, যুদ্ধবন্দীর বিচার না করার শর্ত মেনে নেয়া হয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ২২- সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে লাহোর যান।

লাহোর সম্মেলনে যোগ দেয়ার পর থেকে বাংলাদেশ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার

ও ইসলামী বিশ্বের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়। সার্বিক বিচারে বলা যেতে পারে, ১৯৭৪ ছিল বাংলাদেশের জন্য কূটনৈতিক সাফল্যের বছর। কারণ, একই বছর বাংলাদেশ জাতিসংঘেরও সদস্য হয়। ইসলামী বিশ্বে নিজের স্থান করে নিতে যেমন পাকিস্তানের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় তেমনি জাতিসংঘে মোকাবেলা করতে হয়েছিল চীনের বিরোধিতা।

নিহত হবার (১৫ আগস্ট ১৯৭৫) পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু চেষ্টা করেছিলেন ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে ঘনিষ্ট ও দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে। এ সময়ে প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ তার সীমিত সামর্থ্য সত্ত্বেও আরব বিশ্বের জন্যে যাবতীয় সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। তবে উল্লেখ্য যে, ইসরায়েলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আরবদের সংগ্রামের প্রতি বাংলাদেশের সহানভূতির বাস্তব প্রমাণ দেবার প্রথম সুযোগ এসেছিল ১৯৭৩-এর আরব-ইসরায়েলী যুদ্ধের সময়। এ যুদ্ধের শুরু থেকেই বাংলাদেশের জনগণ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। সারাদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রতিবাদ সভা আর বিক্ষোভ মিছিল। আরবদের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে পাঠানো হয়েছিল ২৮-সদস্যের একটি ডাক্তার দল; এটি ছিল বিদেশ থেকে পাঠানো সংগ্রামরত আরবদের জন্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম ডাক্তার দল। সবচেয়ে বড় দল পাঠিয়েছিল কিউবা। একই সময়ে এ যুদ্ধের গুরুদায়িত্ব বহনকারী মিশরের জন্যে পাঠানো হয়েছিল এক লক্ষ পাউণ্ড চা। উপরন্ত আরবদের পাশাপাশি যুদ্ধ করার জন্য পাঠানো হয় ৫,০০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্বেচ্ছাযোদ্ধা বাহিনী, যাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন ভূতপূর্ব মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশের এ ভূমিকা আরবদের জন্যে ছিল বিমুগ্ধ বিস্ময়। মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশ তখনও প্রধান ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর স্বীকৃতি পায়নি। অপরদিকে আরবদের এ মরণপণ সংগ্রামের প্রতি পাকিস্তানের নিস্পৃহতা ও ঔদাসীন্য ছিল বিপন্ন বিস্ময়। কাজেই আরবদের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগতে সময় লাগেনি। এ যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের একজন সাংবাদিককে মিশরের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছিলেন: "আমরা এতদিন পাকিস্তানের প্রচারণা বিশ্বাস করে এসেছি; এবং আপনাদের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলাম। এখন আমরা উপলব্ধি করছি যে, ইয়াহিয়া চক্রের দ্বারা সংঘটিত অপরাধে প্রধানমন্ত্রী জনাব ভুট্টোরও যোগসাজশ ছিল।" একই সময়ে আরেকজন মিশরীয় কূটনৈতিবিদ এ সাংবাদিককে কিছুটা অভিভূত করে মন্তব্য করেছিলেন : "আপনাদের প্রধানমন্ত্রী (শেখ মুজিব) একটি ব্যাপক যুদ্ধে একটিও গোলা বা অস্ত্র ব্যবহার না করে আরব বিশ্বসহ প্রায় অর্ধেক আফ্রিকা জয় করে নিয়েছেন।" এ মন্তব্যে অতিরঞ্জন থাকলেও বাস্তবতার অভাব ছিল না। কারণ আরব বিশ্বে সে সময়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এমন ব্যাপকভাবে স্থান করে নিয়েছিল যে, একজন সাধারণ মানুষও শেখ মুজিবের নাম জানতো। তবে মনে রাখা দরকার, জানমত ও সরকারি মতের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ব্যবধান ছিল। জনমত যখন পুরোপুরিভাবে বাংলাদেশের জন্যে

সহানভূতিশীল হয়ে উঠেছে তখনও দেখা যায় বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার দ্বিধা-দ্বন্দে ভুগছে। অবশ্য পেছনে সার্বিক কূটনেতিক প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত চিন্তা-চেতনা কাজ করছিল।

ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কের সূচনা থেকেই বাংলাদেশ প্যালেস্টাইন সমস্যার ব্যাপারে তার নীতি-অবস্থান ও মূলনীতি নির্ধারণে সচেষ্ট ছিল। ১৯৭৩-এর নভেম্বর মাসে এ-সমস্যার প্রতি শেখ মুজিব সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে তৎকালীন সংসদ স্পীকার আবদুল মালেক উকিল মন্তব্য করেছিলেন: "নিজেদের জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন প্যালেস্টাইনবাসী ও সংশ্লিষ্ট আরব রাষ্ট্রসমূহের ইচ্ছার উপর ভিত্তি করেই মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধান করতে হবে। আর তা ছাড়া এটাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, পি. এল. ও. একটি বাস্তব সত্য এবং ইয়াসির আরাফাত প্যালেস্টইনীদের নেতা হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।" জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের প্রথম ভূমিকাই ছিল প্যালেষ্টাইন সমস্যাকে কেন্দ্র করে। জাতিসংঘের প্যালেস্টাইন আলোচনায় পি. এল. ও-কে প্যালেস্টাইনের মুখপাত্র হিসেবে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়ে মিশর যে প্রস্তাব এনেছিল বাংলাদেশ তা সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। বাংলাদেশের ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৫-এর জানুয়ারি মাসে পি. এল. ও. ঢাকায় একটি রেসিডেন্ট অফিস খোলে। এর কিছুদিন পরেই আরাফাতের অনুরোধে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার জন্যে প্যালেস্টাইনী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করে।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে উন্নয়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক রাষ্ট্রীয় সফর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণেই বঙ্গবন্ধু সুযোগ পেলেই ইসলামী রাষ্ট্র সফর করতেন। ১৯৭৪-এর নভেম্বর মাসে তাঁর কায়রো ও কুয়েত সফর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সফরের সময়ে তিনি প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানে আরবদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও ইসরায়েলকে অধিকৃত আরব এলাকা ছেড়ে দেবার স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। এ সফরের পর আরব বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। অপরদিকে নিষ্ক্রিয়তা ও নিস্পৃহতার কারণে পাকিস্তানের ভাবমূর্তির বেশ অবনতি হয়েছিল। মনে হয় পাকিস্তানের এহেন ভূমিকার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভূমিকার গুরুত্ব মানসিক কারণে অতিরঞ্জিত হয়। অবশ্যই এটাই স্বাভাবিক।

বঙ্গবন্ধুর আমলে বাংলাদেশের দুটো চিত্র ছিল। প্রথমত, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সমস্যা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিত্য নতুন শক্তি সঞ্চয় করছিল। জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তি, পাকিস্তানসহ অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি, চীনের সঙ্গে স্বাভাবিক পদক্ষেপ গ্রহণ–এ সবই বাংলাদেশকে রুশ-ভারত প্রভাব এড়িয়ে একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে সাহায্য করেছিল। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভূমিকার এ নতুন প্রেক্ষিতের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু তাঁর রাষ্ট্রীয় আদর্শেও কিছু সুপরিকল্পিত পরিবর্তন

আনতে শুরু করেছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৭৫-এর মার্চ মাসে রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিবর্তনের এটিই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। অধ্যাদেশের ভূমিকায় বলা হয়েছিল, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হবে সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইসলামের অবদান সম্পর্কে গবেষণা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলামের মূলনীতির প্রসার করা। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হবে বাংলাদেশ ১৯৭২-এর স্বাধীনতা-পরবর্তী চেতনা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছিল। বাস্তবে কিন্তু তা ছিল না। মনে রাখতে হবে, এ পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ তথাকথিত ধর্মান্ধতার অর্থে ইসলামী আদর্শের কথা বলেনি; একটা গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অতি সহজেই লক্ষণীয়। বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে এ ধারণা দেয়া যে, বাংলাদেশ ইসলাম-বিরোধী কোন কাজ করছে না। উপরন্ত মনে রাখতে হবে, অন্তত শেখ মুজিবের জীবদ্দশায় রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতায় কোন পরিবর্তন করা হয়নি। তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, বঙ্গবন্ধু ইসলামকে কূটনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য এ মন্তব্যের উদ্দেশ্য এমন একটা ধারণা দেয়া নয় যে, তিনি দেশে ইসলাম-বিরোধী ভূমিকা পালন করছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বঙ্গবন্ধু ধর্মহীনতা বোঝাননি। এ ভূমিকার মাধ্যমে তিনি নিঃসন্দেহে কূটনেতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অবশ্য জীবদ্দশায় তিনি এ নীতির সুফল দেখে যেতে পারেন নি, রাষ্ট্র ক্ষমতায় তাঁর উত্তরসূরীদের জন্যে তার বরাদ্দ ছিল।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা

ড. মোহাম্মদ হাননান

পয়লা মার্চ (১৯৭১) পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন তখন প্রায় সাথে সাথেই বঙ্গবন্ধুর এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন।

"আমি ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচি ঘোষণা করব।" (দৈনিক ইত্তেফাক, আজাদ, ২ মার্চ ১৯৭১)।

সে অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চেই সরাসরি জনতার সম্মুখীন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অব্যাহত গুজব ও আশঙ্কার মাঝে বঙ্গবন্ধু ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের যৌথভাবে আয়োজিত সমাবেশে এসে হাজির হন। গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে বঙ্গবন্ধুকে যে কোনো সময় গ্রেফতার করা হবে।

ফলে তেসরা মার্চ পল্টন ময়দানে জনতার উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বলেন, "হয়তো এটাই আমার শেষ ভাষণ" (দৈনিক ইত্তেফাক, আজাদ, ৪ মার্চ ১৯৭১)। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে এদিন "স্বাধীন বাংলাদেশ" রাষ্ট্র ঘোষণা করে জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, রাষ্ট্রের সীমানা, জাতির পিতা, মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক সবকিছুই উপস্থিত জনগণের কাছে তুলে ধরা হয়। পরদিন তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হয়।

এভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ায় ৩ মার্চ থেকে ৭ মার্চ সারা বাংলায় সংগ্রামের সর্বাত্মক প্রস্তুতির মুখে রেসকোর্সের বিশাল মহাসমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উপচে পড়া জনতার সামনে বঙ্গবন্ধু আরেকবার আসার সুযোগ পান। তিনি মঞ্চে উঠেই সরাসরি মাইক্রোফোনের কাছে যান এবং আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলে ওঠেন, "আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সমানে হাজির হয়েছি।"

এরপর বঙ্গবন্ধু ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজনীতিতে একের পর এক বাঙালিদের ওপর পাঞ্জাবিদের নির্যাতনের ইতিহাস বলে যান। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠেন, "আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না।" আর এই প্রত্যাখ্যানের ঘোষণার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকুও বঙ্গবন্ধু নাকচ করে দেন।

তেসরা মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রয়োজন ছিল পাকিস্তানের

তৎকালীন পূর্বাঞ্চলের এই প্রদেশের সকল প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করা। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ সেই কাজটি করলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন,

"এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে। কিন্তু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রমীকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তর ওয়াপদা কোনোকিছু চলবে না।"

তিনি প্রতিদিন মাত্র দুইঘণ্টার জন্যে ব্যাংক খোলা রাখার এবং রেডিও-টেলিভিশন চালু থাকার কথা বলেন। কিন্তু বাঙালিদের খবর যদি না দেয় তাহলে বাঙালিরা যেন সেখান থেকে চলে আসে। সে মর্মে নির্দেশ দেন।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সামরিক প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ করে স্বাধীন ঘোষিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনের শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মকান্ডের প্রভাব ও কার্যকারিতা কতটুকু পড়েছিল, তার তাৎক্ষণিক ফলাফল প্রথমে আসে রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা কেন্দ্র থেকে। ৭ মার্চের ভাষণ রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা কেন্দ্র থেকে সরাসরি প্রচারিত হওয়ার কথা ছিল। রেডিও-তে এই সংক্রান্ত ঘোষণাও বারবার প্রচার করা হয়। বেলা ২-১০ মিনিট থেকে ৩-২০ মিনিট পর্যন্ত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এই পর্যায়ে শেষ গানটি ছিল "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।" তারপরই হঠাৎ করে রেডিও-র ঢাকা কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এই সময় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ যাতে সরাসরি রেসকোর্স ময়দান থেকে প্রচারিত হতে না পারে সেইজন্যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এসে রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে। সন্ধ্যার পর একই ঘটনা ঘটে পাকিস্তান টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্রে। এর ফলে দু'জায়গাতেই বিদ্রোহ দেখা দেয় রেডিও এবং টেলিভিশনের কর্মীরা কেন্দ্র ছেড়ে চলে আসে। ফলে রেডিও এবং টেলিভিশনের ঢাকা কেন্দ্রের দুটোই স্টেশনই বন্ধ হয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ পাঞ্জাবি সামরিক শাসকদের মধ্যে কতটা গভীর মানসিক চাপ ও ভীতি সৃষ্টি করেছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা রাতেই রেডিও এবং টেলিভিশনের বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে আপসে আসতে বাধ্য হয় এবং পরদিন ৮ মার্চ সকালে রেডিও-তে এবং রাতে টেলিভিশনে পূর্বদিন ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ জনগণকে বাজিয়ে শোনানোর ব্যবস্থা করে।৭ মার্চের এই ঐতিহাসিক তেজস্বী এবং বজ্রের নির্ঘোষের ন্যায় কণ্ঠের নিঃসৃত বাণী ৮ মার্চে রেডিও-র মারপত সারা দেশের তৎকালীন সাত কোটি বাঙালির কাছেই পৌছে যায়। হাজার বছর ধরে অপেক্ষিত সেই বার্তা "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম"– যা ছিল তেসরা মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠেরই একটি অতিরিক্ত "ফলো আপ।" যদিও তেসরা মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছিল, তথাপি তেসরা মার্চের এই ঘোষণা শুনেছিল পল্টনে আগত কয়েক লক্ষ মানুষ এবং পরদিনের সংবাদপত্র

পাঠকের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সেই সময় সংবাদপত্র ছিল গুটিকয়েক এবং এর পাঠক সংখ্যাও সমগ্র জনগোষ্ঠীর তুলনায় এক নগণ্য সংখ্যা মাত্র। ফলে ৭ কোটি জনগণের কাছে ৭ মার্চের ভাষণই হয়ে উঠল "মাইলস্টোন।"

সেদিনের সাতকোটি বাঙালি, যে যেখানে ছিল সকলেই শুনল পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নিজ কণ্ঠে যুদ্ধ ঘোষণার কথা। বঙ্গবন্ধু দ্বিধাহীনভাবে বলে উঠলেন, "আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে এ ভাবে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর-কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা কর।"

পাকিস্তানের তখনকার চব্বিশ বছরের ইতিহাসের দুনিয়ার অন্যতম দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এই ছিল ডাক– "যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।" এটা ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করার সুস্পষ্ট নির্দেশনা।

বঙ্গবন্ধু যুদ্ধের ডাকের এই নির্দেশনা যে কতখানি সুস্পষ্ট ছিল তা বোঝা যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থাকা বাঙালি অফিসারদের প্রতিক্রিয়ায়। সেদিনের একজন বাঙালি মেজর জিয়াউর রহমান (পরে মেজর জেনারেল এবং রাষ্ট্রপতি) ১৯৭১ সালে এই ভাষণের মর্মার্থ অন্যান্য সকল বাঙালির মতোই সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। দেশটি স্বাধীন হওয়ার মাত্র তিন মাস পরই এই সম্পর্কে তিনি লেখেন, "৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। (কর্নেল জিয়াউর রহমান: একটি জাতির জন্ম, দৈনিক বাংলা, ২৬ মার্চ ১৯৭২ সাপ্তাহিক বিচিত্রা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২)।

সেদিনের কোনো একটি বাঙালির কাছেও পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার বঙ্গবন্ধুর এই সুস্পষ্ট নির্দেশনা বুঝতে বাকি থাকেনি, এমনকি সেনানিবাসে পড়ে থাকা বাঙালি সামরিক অফিসারদের কাছেও না, জিয়াউর রহমানের লেখা তার প্রমাণ বহন করছে।

সেদিনটির অসাধারণতা স্মরণ করে তৎকালীন আত্মগোপনে থাকা এক রাজনৈতিক নেতা রাশেদ খান মেনন বর্তমান লেখকের কাছে বলেছেন, আন্ডারগ্রাউন্ড অবস্থায় থেকেও আমরা এদিন রেসকোর্সের জনসভায় মুজিবের ভাষণ শুনতে গিয়েছিলাম। সারা শহরে রটে গিয়েছিল যে, শেখ মুজিব আজ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন এবং বড় ধরনের একটা ঘটনা আজ ঘটবে। (এই সাক্ষাৎকারটির বিস্তারিত বিবরণ লেখকের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে সংযোজিত রয়েছে)।

১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের কাছে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৭ মার্চে তার দেয়া ভাষণটি সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেন।

"৭ মার্চ আমি ঢাকা রেসকোর্স মাঠে আমার শেষ মিটিং করি, ঐ মিটিং-এ উপস্থিত লাখ লাখ লোক দাঁড়িয়ে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানকে 'স্যালুট' জানায় এবং ঐ সময়ই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত চূড়ান্তরূপে গৃহীত হযে যায়। আমি জানতাম কী ঘটতে যাচ্ছে, তাই আমি ৭ মার্চ রেসকোর্স মাঠে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করেছিলাম এটাই স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্যে যুদ্ধ করার মোক্ষম সময়।" (বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, দ্বিতীয় খণ্ড থেকে অনুদিত)।

বঙ্গবন্ধুর এই বর্ণনা থেকেও প্রমাণ মেলে ৭ মার্চে তিনি বাঙালিদের যুদ্ধ করার নির্দেশনাই দান করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর যুদ্ধ-প্রস্তুতির নির্দেশনা আওয়ামী লীগের বাইরে স্বাধীনতাকামী অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে একই সাথে কী প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল তাও এই প্রসঙ্গে স্বর্তব্য। ৭ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে মতিয়াপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা প্রকাশ্য দিবালোকে ডামি-রাইফেল দিয়ে ট্রেনিং দেয়া শুরু করে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী সাথে পাল্লা দিয়ে এই প্রথম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-ছাত্রীরা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ শুরু করে যুদ্ধপ্রস্তুতিতে নেমে পড়ে। চীনের মাও সেতুং-এর আদর্শে বিশ্বাসী তৎকালীন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির একটি লিফলেটেও ৭ মার্চ থেকে এই যুদ্ধপ্রস্তুতির সত্যতা প্রমাণ করে। লিফলেটটিতে জনগণকে আহ্বান করে বলা হয়, "আঘাত হানো। সশস্ত্র-বিপ্লব শুরু করো। সেনাবাহিনীকে খতম কর।" (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১৬)।

বস্তুত এই সার্বিক প্রেক্ষাপটেই বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণকে স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা ৭ মার্চের ভাষণে ব্যক্ত করেন। ফলে ৭ মার্চ থেকেই পাকিস্তানি এবং বাঙালিদের মধ্যে যুদ্ধের জন্যে সমান-সমান প্রস্তুতি চলতে থাকে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সঙ্গে সঙ্গেই ৭ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সবচেয়ে উগ্র ও মেজাজি জেনারেল টিক্কা খানকে। টিক্কা খান ৭ মার্চেই ঢাকা এসে পৌছান। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক সাহেবজাদা ইয়াকুব খান টিক্কাকে বিমানবন্দর অভ্যর্থনা জানান।

কিন্তু ততক্ষণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র প্রশাসন বঙ্গবন্ধুর "কমান্ডে" চলে এসেছে। এমনকি পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকীও বঙ্গবন্ধুর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেন এবং নতুন গভর্নর হিসেবে আসা জেনারেল টিক্কা খানকে শপথ করাতে অস্বীকৃতি জানান।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন, বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তানি সৈন্যদের "ভাতে মারব, পানিতে মানব।" ফলে সেনানিবাসে সৈন্যদের জন্য খাদ্য সরবরাহ বন্ধু করে দেয়া হয়। ১০ মার্চ দেখা যায়, পাকিস্তান সরকার ১১৪ নম্বর সামরিক আদেশ জারি করে বলছে, সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করলে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে।

৭ মার্চের পর থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সকল সিনেমাহলে প্রমোদকর বন্ধ করে দেয়া হয় এবং চলচ্চিত্র শুরু ও শেষ হওয়ার পর "জয় বাংলা বাংলার জয়" গানটি পরিবেশন করা হয়।

এভাবে ৭ মার্চের পর পুরো সরকারি কাঠামোর নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধুর হাতে চলে যায়। ১১ মার্চ ঢাকা সফল শেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা এয়ার মার্শাল আসগর খান করাচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "ঢাকায় কুর্মিটোলা ক্যান্টনম্যান্ট ব্যতীত কোথাও তিনি পাকিস্তানি পতাকা দেখতে পাননি। কার্যত শেখ মুজিবই পূর্ব পাকিস্তানে এখন সরকার চালাচ্ছেন।" (দৈনিক ইত্তেফাক, আজাদ, ১২ মার্চ ১৯৭১)।

১০ মার্চের দৈনিক আজাদ ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডে অবিস্থত বঙ্গবন্ধুর বাসভবনকে আমেরিকার হোয়াইট হাউস, বৃটেনের ১০ নম্বর ডাইনিং স্ট্রিটের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে তুলনা করে মন্তব্য করে: বঙ্গবন্ধুর বাসভবন এখন একটি অঘোষিত সরকারি দফতর।

১৪ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক সরকার ১৫ নম্বর সামরিক আদেশ জারি করে সকল বেসামরিক লোককে চাকরিতে ফিরে আসতে নির্দেশ প্রদান করলে বঙ্গবন্ধু পাল্টা ৩৫ দফা নির্দেশনামা জারি করে অফিস-আদালত পূর্বের মতো অব্যাহতভাবে বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা করেন। উপরন্ত ৩৫ দফার ৪ ধারায় পুলিশ বিভাগকেও তার নির্দেশ-মতো কাজ করার ফরমান জারি করে এবং ৭ ধারায় বলা হয়, "কোনো কর আদায়যোগ্য অথবা আদায়কৃত থাকলে তা বাংলাদেশ সরকার একাউন্টে জমা হবে।" (দৈনিক ইত্তেফাক, আজাদ, ১৫ মার্চ ১৯৭১)।

১৭ মার্চ ছিল বঙ্গবন্ধুর ৫২ তম জন্মদিন। এদিন বায়তুল মোকাররম মসজিদে বাদ-আসর মাওলানা শেখ মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ বিন সায়িদ জালালবাদী বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘায়ু কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন। একই দিন চট্টগ্রামে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী চট্টগ্রামের এক জনসভায় বলেন, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তার নিজের ৮৯ বছরের জীবনে জনগণের এমন সুদৃঢ় ঐক্য ও উৎসাহ তিনি আর দেখেননি। (দৈনিক পূর্বদেশ, ১৮ মার্চ ১৯৭১)।

এভাবে মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের অঘোষিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত মোট ১৯ দিন ঢাকাকে রাজধানী করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হয়। এর পেছনে ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, ধৈর্য এবং স্থৈর্যের এক অসাধারণ সফলতা।

Northern University Bangladesh
NUB Library